সূর্যের সাত রঙ

রেণুকা চক্রবর্তী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূর্যের সাত রঙ :
প্রথম প্রকাশ :
কার্ত্তিক ১৩৭২

প্রকাশন :
বাংলা ভাষা

প্রকাশক :
শ্রীনন্দন রায়
স্বাতী প্রকাশন
১০, ডি. এল. রায় ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র :
গুরুদাস ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

মুদ্রক :
শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
গ্রন্থপরিক্রমা প্রেস
৩০/১ বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

সূর্যের সাত রঙ

সূচীপত্র

সূর্যের সাত রঙ

'সুনাম'

সুমিত্রার বড় হাসি পায়। প্রশংসা? কি দাম তার? ছোট বেলা হ'তে প্রশংসা পেয়েছে প্রচুর। কিন্তু কি লাভ তাতে? তার মত ভাল মেয়ে নাকি হয় না, কিন্তু তার অন্তরের ব্যাথার খোঁজ রাখে না কেউ—সে যে ভাল মেয়ে।...

ছবির মতই ভেসে উঠে চোখের সামনে গত জীবনটা; এগারো বছর বয়সে ঘটা করেই তার বিয়ে হ'য়েছিল। বারো বছর না পেরুতেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীর বসবাস চিরস্থায়ী হ'ল। সংসারে আজও মা বেঁচে আছেন। তাই এক মাত্র ভাজ তা'কে সুনজরে না দেখলেও দুর্ব্যবহারও তেমন কিছু করে না। তবে চিরকাল তাকে খাওয়াতে-পরাতে হবে বলে গজ গজ করতেও ছাড়ে না। এমনি অবস্থার ভিতর দিয়ে, সংসারের কাজ, মার তত্ত্বাবধান, পুজো-অর্চনার ভিতর দিয়ে জীবনের অনেকগুলি বছর অতি সুনামের সাথেই সুমিত্রা কাটিয়েছে। কিন্তু আজ-কাল যেন তার কি হ'য়েছে। কোন কাজেই তার মন বসতে চায় না; কিসের যেন একটা হাহাকার কেবলি গুমরে উঠে। চেহারা তার ভালই, সাজার সখও হয়, কিন্তু কোন দিনই সে একটু সাজতে পেল না। এগারো বছর বয়সেই ত তার সব কিছু শেষ হ'য়ে গিয়েছে। স্বামীর মুখও তার মনে নেই। সবাই বলে, একটা ছেলে থাকলে ভাল হ'ত; তাই কি? হয়ত বা ভালই হ'ত। বাসাশুদ্ধ একটা ছেলে নেই। একমাত্র ভাইপো, সে এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। তাকে নিয়ে তো আর সময় কাটানোর উপায় নেই। একটা কিছু অবলম্বন পাওয়া তার বড়ই প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইচ্ছের বেগ যতই বাড়ে—তার অতৃপ্তিও বেড়ে যায়,—বেড়ে যায় তার বিড়ম্বনা। সে তো খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, কাজ কর্ম করছে, তবু এই অতৃপ্তির হাত থেকে রেহাই নেই কেন?"

সন্ধ্যা পুজো নিয়ে সে আরও মেতে যায়। যখনই সময় পায় ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে, বলে "ঠাকুর আমার মনকে শান্ত করে দাও। ভোগের আকাঙ্ক্ষা আমার নিয়ে নাও দেব, আমার সুনাম রক্ষা কর।" অবাধ্য মন কিন্তু ঠাকুরের চিন্তা ছেড়ে কোথায় উধাও হ'য়ে যায়। দুঃখ আরও যায় বেড়ে। চারিদিকে প্রচুর ভোগের ব্যবস্থা, তার ভোগ করার উপায় নেই; পরিপূর্ণ ভোগের মাঝে তিল তিল করে তাকে শুকিয়ে মরতে হ'বে, সমাজের বিধান হ'ল এই। তার

ভিতরে কি চলছে খবর কেউ নেয় না, শুধু বাইরের চাল চলন দেখেই চলছে তার বিচার। কেবল মা তার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, সমাজে বাস করে তা ছাড়া আর কি-ই-বা করবে। সুমিত্রা নিজের সাথে নিজেই যেন আর পেরে উঠে না। নিজের এই এলোমেলো চিন্তার ধারাতে নিজেই সে বড় শঙ্কিত হয়ে উঠে। প্রাণপণে চায় মনটাকে শান্ত করতে।

সে দিন বিনয় এসে বলল, সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে ছোট খুকিকে নিয়ে। কেউ ওকে শান্ত করতে পারছে না। ভাই-বোনেরা তো নিজেদের শোকেই অস্থির। কাকীমার এতগুলি ছেলে পুলের ভার, তার উপর সংসার, এ নিয়ে একা কাকীমা আর পেরে উঠছেন না।

বিনয় সুমিত্রার ভগ্নীপতি,—দূর সম্পর্কীয়া এক বোনের স্বামী, কিছু দিন হ'ল সে বোনটি মারা গিয়েছে।

সুমিত্রা অতি আগ্রহের সহিত বলল, বিনয় তোমার খুকিকে আমায় দাও না, ওকে আমি খুব যত্ন করব।

বিনয় তো হাতে আকাশ পেল। তখনি রাজি হ'য়ে বল্ল, বাঁচালেন দিদি, আমি এখনি ওর জিনিষ পত্র গুছিয়ে পাঠাব।

কিন্তু মা? তিনি এ'তে খুসী হ'তে পারলেন না। এ ঝঞ্ঝাট আবার কেন? সুমিত্রার নাছোরবান্দা ব্যাকুলতা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি রাজী হ'লেন। খুকিকে সে পেয়েছে, সুমিত্রার দিন গেল বদলে। খুকি যা কিছু-করে ও অবাক হ'য়ে তাই দেখে, বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই। কি-সুন্দর নরম তুলতুলে দেহটি। এরই মধ্যে মা ডাক শিখে ফেলেছে। আধ আধ স্বরে যখন মা বলে সুমিত্রাকে ডাকে তখন ভুলে যায় সুমিত্রা সমস্ত দুনিয়া। কি শান্তি!

বিনয়ের অবস্থা ভাল, সে যখন যা দরকার তাতো দেয়ই, খুকির জন্য যা হাত খরচ দেয়, তা'তে সুমিত্রার হাত খরচ চলে যায়, ফলে মা তো খুসী হয়েছেনই, আজকাল ভাজও যেন একটু ভাব করতে চায়। অকারণেই অনেক সময় দিদি বলে ডাকে, খাওয়ার তত্ত্বাবধান করে, বলে এক বেলার খাওয়া, দুখানা তরকারী বেশী না রান্না করলে পেট ভরবে কেন? সুমিত্রা বোঝে সবই, তবু বিনয়ের নিকট এত টাকা নিতে ওর খুব খারাপ লাগে। বিনয়কে বলে, একটা শিশুর জন্য এত টাকার কি দরকার ভাই?

বিনয় একটু হেসে জবাব দেয়, আমারও কিছু অভাব নেই দিদি, মা-মরা

বাচ্চাটাকে একটু ভাল ভাবে মানুষ করুন। মায়ের অভাব ছাড়া ওর যেন আর কোন অভাব না ভুগতে হয়। তা ছাড়া বলতে ভরসা পাচ্ছিনা তবু বলছি। এ টাকা যদি কিছুমাত্র আপনার কাজে লাগে তবে আমার টাকা সার্থক বলে মনে করব।

কিন্তু সুমিত্রার কেমন জানি লাগে। বিধবা মানুষ সে, কি দরকার তার টাকায়? বিনয়ের কাছে সে এমনি কৃতজ্ঞ, বিনয় তাকে বাঁচিয়েছে, তার শূন্য বুক ভরে দিয়েছে। কিন্তু মা ও বৌদির আগ্রহাতিশয্যে না নিয়েও পারছে কৈ? ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও'র বেড়ে যায়। ঠাকুর আমায় বাঁচিয়েছে, আমার সুনাম রক্ষা করেছ বলে যখন-তখন ঠাকুরকে প্রণাম করে।

বিনয় প্রায়ই গাড়ী নিয়ে খুকির খোঁজ খবর নিতে আসে। খুকিকে বাড়ী নিয়ে যায় ও'র ভাই বোনদের দেখাতে। মাঝে মাঝে সুমিত্রারও সঙ্গে যেতে হয়। খুকির কথা নিয়ে অনেক কথা হয়, অবান্তর কথাও মাঝে মাঝে এসে পড়ে। একদিন কথা প্রসঙ্গে সুমিত্রাকে বিনয় বল্ল, দিদি! আজকাল আপনার দুঃখ যেন নূতন করে অনুভব কচ্ছি। কথাটা নিতান্ত সাদা, কিন্তু বিব্রত করল সুমিত্রাকে। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তারপর মনে লাগল তোলপাড়, —নানারকম ব্যাখ্যা চলল তার। সুমিত্রা ভাবল এ যেন কিসের একটা ইঙ্গিত। আজকাল বিনয়কে দেখলে ও কেমন যেন হয়ে যায়। সাধারণ কথা জড়িয়ে যায়, ঘামিয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ে। আলাপ আর আগের মত জমে না। বিনয় এলে বিরক্ত হয়। না এলে অস্থির হ'য়ে উঠে, কেন এল না ভাবে। খুকির খাবার সময় সুমিত্রা ভুলে যায়। নিজেকে 'ও' আর বিশ্বাস করতে পারছে না। বিনয়ের সাথে কথা বলা বা দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিলে। কিন্তু ভাবনা চল্ল বেড়ে। ইচ্ছাকে ফাঁকি দেওয়ার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি তার আর জুটল না। সারাদিন বিনয়ের কথাই ভাবে। বিনয় এলে দূর থেকে কান পেতে তার কথা শোনে। লুকিয়ে দেখার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

একদিন সুযোগ পেয়ে বিনয় বল্ল, "দিদি, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? আপনি আমার সাথে কথা বলেন না কেন?"

সুমিত্রা ঘামিয়ে উঠে। বলে, আমি বিধবা মানুষ, আমার কারো সাথে কথা না বলাই ভাল, বলেই সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিনয় পথ আগলে বল্লে, চিরদিন কি এক ভাবেই থাকতে হবে? বিধবা বিয়েও তো হয়।"

সুমিত্রা বল্ল, 'দূর, তা কি-হয়?'—

'কেন নয় ? তোমার মত ছোট বয়সের মেয়েকে আবার বিয়ে না দেওয়াই পাপ।'

সুমিত্রার মুখে আর কোন কথা জোটে না।

আজকাল বিনয় এলে সুমিত্রা আর পালায় না। ঘন ঘন খুকিকে নিয়ে বিনয়দের বাড়ী যায়। হঠাৎ ও যেন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। সংসারটা যেন রঙ্গিন হ'য়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বিয়ের জন্য বিনয়কে তাড়া দেয়। বিনয় বলে, দাঁড়াও এত অস্থির কেন ? সুযোগ মত মাকে একদিন বলব'। এমনি আরও কিছু দিন কাটার পরে সুমিত্রা বড় অধৈর্য হ'য়ে পড়ল। বিয়ের কথা নিয়ে একদিন বিনয়ের সাথে ঝগড়াও হ'য়ে গেল। সুমিত্রার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে রইল। ভাবে আর ভাবে, চিন্তার যেন আর কুল কিনারা নেই। একবার ভাবল দোষ তার নিজেরই। সব ভেঙ্গে বললে বিনয় কি কখনও অমত করতে পারত। কিন্তু বিনয় আর আসে না। অপেক্ষাও আর চলে না; এমন সময় একদিন বিনয় এল। আসতেই সুমিত্রা সব বলল। বিনয়ের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বল্ল, আচ্ছা দেখি আমি কোন ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। ভীষণ চমকে উঠল সুমিত্রা, ওষুধ। তা দিয়ে কি হ'বে ? 'ওষুধই তো ভাল। না হ'লে যে বদনাম হবে। আর আমারও তো ছেলে-পুলের ঘর, তোমাকে কি করে বিয়ে করি ?' বিনয় বলে।

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পডলেও বুঝি সুমিত্রা এত অবাক হ'তনা, এ বলে কি ! এখন বিয়ে করা সম্ভব নয় ! বিয়ের চেয়ে সন্তান হত্যা সহজ ! এক মুহূর্তে বিনয়কে নূতন করে সে চিনল। অসহ্য যাতনায় বুক যায় তার ভেঙ্গে, আগামী দুর্ভোগের চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠল এ মুহূর্তের নূতন পরিস্থিতি। কাটা পাঁঠার মতই ছটফট করতে লাগল সুমিত্রা। অসহ্য আক্রোশে তার ক্ষিপ্ত মন অবিশ্বাসী দুনিয়াকে ছারখার করে দিতে চায়। সুমিত্রা কেবলই ভাবে, কোন মতেই কি-রক্ষা করা যায় না ? এত আকাঙ্ক্ষার সন্তান তাকে নষ্ট করে দিতে হ'বে ! উঃ কি নির্দয় মানুষ। সত্যি কি বিনয় আর আসবে না ? না না এ অসম্ভব। বিনয়ও ভাববে; অনুতপ্ত বিনয় এবার এসে রাজী হয়ে যাবে। নইলে সব দিক রক্ষা হ'বে কিসে ? আবার একদিন বিনয় এল, বলল, আমাদের দু'জনের ভালর জন্যই বলছি, ওষুধ খাও লক্ষীটি, এখনত কেউ জানে না। কোন গোলমাল হবে না। কেন মিছা মিছি মন খারাপ করছ ? সুমিত্রা বল্ল, তুমি সন্তান পালনে অক্ষম বাপ হ'লেও,

আমি অযোগ্যা মা নই। আমার কাছ থেকে তুমি যাও। ভালর জন্য! হাঁ, বিনয় সুমিত্রার ভাল করতে আর কিছু বাকি রাখে নি। সন্তান নষ্ট করে মায়ের ভাল?—কি—সর্বনাশ।—তার দোষ কি? দোষ থাকে-ত সুমিত্রার আর বিনয়ের। নির্দোষ সন্তানকে নষ্ট করার পরামর্শ দেয় তার পিতা। সুমিত্রা বলল—যাও ভীরু কাপুরুষ! স্বীকারের গ্লানি ও সন্তান পালনের দায়িত্ব তার মা নিতে পারবে। যে সমাজের সদাচার-বিধানে সন্তান হত্যাই বাপ মায়ের ভাল হ'তে পারে সেই নরকে তুমি রাজা হ'য়ে থাক।

স্তম্ভিত বিনয় নির্বাক হ'য়ে গেল। একটু তাল সামলে বলল, আচ্ছা আজ তুমি উত্তেজিত; যুক্তি এখন বুঝবে না। আমি আবার আসব, সে দিনও যদি এমনি পাগলামি কর তবে খুকিকেও আর এখানে রাখা সম্ভব হবে না বলে যাচ্ছি। ঝোকের মাথায় কেবল বড় বড় কথা বল্লেই হয় না। কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা হ'চ্ছে তা তোমার মাথায় এখন ধরছে বলে মনে হয় না। স্বীকার করা যত সহজ বলে ভাবছ, বাস্তবে দেখবে ঠিক তার বিপরীত। যা হবার নয় তার জন্যে মাথা কুটলে কি লাভ হবে। তোমার সংস্পর্শে এলে আমাকেও দেখছি কালি না মাখিয়ে ছাড়বে না।

বিনয় চলে যেতে সুমিত্রা অনেকক্ষণ মাটিতে লুটিয়ে কাঁদল। কান্না আর থামতেই চায় না। উঃ কি ভুলই করেছে। সমস্ত জীবনভরে অনুশোচনা করলেও তো আর এ ভুল সে সংশোধন করতে পারবে না। জীবনের এতগুলি দিন সুন্দর ভাবে কাটিয়ে সে আজ একি মহা ভুল করে বসল? শুধু তার নিজের সমস্ত জীবনভরে অনুশোচনাই যথেষ্ট নয়। তাদের পরিবারেরও মুখ নীচু হ'বে, তারপর শিশু হত্যা। কি দুর্বিসহ জীবন! খুকিকেও নিয়ে যাবে? যাক্; সব যাক্, তার মত পাপীর এই উচিত শাস্তি। সে চোখ মুছে উঠে বসল। কি করা যায়। মাকে সব বলে মা'র পা জরিয়ে ধরলে তিনি আমার অবস্থা বুঝবেন না! শিশুকে মারলে পাপ হবে না, পাপ হবে সবাই জানলে! মাকে বলবে বলবে ভাবছে, এমন সময় শুনতে পেল মা কাকে বলছেন, এগুলি আসেই কুল মজাতে। হতভাগীদের কি গলায় দেবার দড়িও জোটে না? সুমিত্রার মা'র কাছে বলার সাধ ঘুচে গেল। বহু দুর্ভাবনার পর ঠিক করল সে নিজে মরেই এ'র সমাধান করবে;—তাই হবে তার যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত;—কাকেও কিছু জানিয়ে কাজ নেই। আত্মহত্যার চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে, কি ভাবে, কোথায় আত্মহত্যা করবে দিন রাত তাই ভাবে।

• একবার একটা প্ল্যান প্রায় ঠিক হয়ে যায়, তখন কি এক সূত্র ধরে নূতন প্ল্যান সুরু হয়। একদিন একটা প্ল্যান শেষ করে সুমিত্রা ভাবছে তারপর ;—তারপর মৃত্যু ; মৃত্যুর পর হৈ চৈ, পোষ্ট মর্টেম ! সর্বনাশ ! সব কথা বেরিয়ে পড়বে যে। তাহ'লে কিসের সমাধান ? ভগবান কি করলে ?............

.........ছেলে হ'য়েছে, সুস্থ, সবল, সুন্দর—সুমিত্রার তাই মনে হ'ল। কিন্তু ঐ-শুধু ক্ষণকালের জন্যে চোখে দেখা। বাচ্চাটাকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অনাথ আশ্রমে দেওয়া হ'ল। সকল ব্যবস্থা সমাধান করতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনাই সুমিত্রাকে সইতে হ'য়েছে। তবু মা হ'য়েও তার মাতৃত্বের দাবী টিকল না ! আর যে দুর্নামের ভয়, তাও ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সন্তান নেই, আত্মীয়-স্বজন বিরূপ, সমাজে মুখ দেখানো বন্ধ, বুদ্ধিমান বিনয় অনেক দিন আগেই সরে পড়েছে। আর সঙ্গে নিয়ে গেছে খুকিকে। কি পিশাচ ! সুমিত্রা ভাবে সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে এ'রা আবার গর্ব করে ? সহমরণে তো সামান্য সময় কষ্ট পাওয়া, কিন্তু একি তাজ্জব বাঁচার নিয়ম ! এত দুর্নামের বোঝা ঘাড়ে নিয়েও সে আপন শিশুটিকে বুকে নিতে পারছে না ! উঃ !

শারদীয়া-বিক্রমপুর বার্ত্তা। মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা
বুধবার ২৩শে আশ্বিন ১৩৫২ ১০ই অক্টোবর ১৯৪৫

'মনের রামধনু'

"ওগো দেখে যাও, কাকে নিয়ে এসেছি ?"

স্বামীর হাঁক-ডাকে তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হতে বেরুই। সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক দেখে থমকে দাঁড়াই। কাপড়টার দিকে নজর পড়ে। রান্নাঘরের তেলকালীতে ঠিক ভদ্রলোকের সামনে বেরনোর উপযুক্ত নয়। উনি আবার হাঁক ছাড়েন, কি হ'ল ?

এরপর আর দেরী করা চলে না। বসার ঘরে যেতে যেতে শুনি ভদ্রলোক বলছেন,—মশাই এত ব্যস্ত কেন, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না, তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত আছেন। আমি ঢুকতে নমস্কার বিনিময়ের পর উনি পরিচয় করিয়ে দেন, এ হ'ল ডাক্তার মৈত্র। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইনি প্রফেসর ছিলেন।

"ভাল, একঘর বাঙ্গালী পেলাম। আপনারা কতদিন এসেছেন ?"

"এইত মাস দুই হবে।"

আমরাও প্রায় তাই। আপনারা কে-কে এসেছেন, কোথায় বাসা ? কেমন বাসা ? প্রশ্নের ঝড় তুলি।

উনি বলেন "একদিনেই সব কথা শেষ করে ফেল না। আগে চা দাও তো।"

লজ্জিত হয়ে চা খাবার নিয়ে আসি।

মৈত্র বলেন, আরেকদিন আসা যাবে। আজ যাই।

জবাব দি, আর একদিন কি, অবসর সময়ে রোজই মিসেস মৈত্রকে নিয়ে আসবেন। আমরাও যাব।

মৈত্র চলে যেতে ওঁকে জিজ্ঞেস করি, "মৈত্র তোমার সহকর্মী ?"

"হ্যাঁ ভদ্রলোক বেশ আলাপী। তাই ধরে নিয়ে এলাম। তুমি তো হাঁপিয়ে উঠেছ।"

"সত্যি কথা, কলকাতা হতে এখানে এসে সময় যেন আর কাটতে চায় না। এখানে বাঙ্গালী যারা আছেন, তাদের সঙ্গে তো আলাপ হয় নি। সমস্ত দিন করি কি ?

"এখন তো কিছু ওড়িয়া ভাষা বোঝ ?"

"একটু আধটু বুঝি, ওড়িয়া ভাষা তো কঠিন নয়। তবে ঠিক প্রাণ খুলে

আলাপ চলে না। কাল মিসেস দাসের সঙ্গে আলাপ হল।"

"ওরাও নূতন এসেছেন তাই না?" উনি জিজ্ঞেস করেন?

"নতুন, তবে পাঁচ ছ'মাস হয়েছে।"

বিকেলে বেড়াতে বেরুই, রাস্তা-ঘাট লাল ধুলাতে আচ্ছন্ন। যাবার জায়গাও বিশেষ নেই।

ছেলেমেয়েরা বলে, "কলকাতাই ভাল, তাই না মা?"

বলি, "এখানেও ভাল। তোমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। এখানে মহানদীর কি চমৎকার মাছ পাও, কলকাতায় এমন টাট্‌কা মাছ পেতে?" উনিও সায় দেন, "সত্যি, মাছটা এখানে খুবই চমৎকার।

আমি টিপ্পনি কাটি, "আর মাইনেটা বুঝি খারাপ?"

উনি হেসে ওঠেন "খারাপ হলে কি আর কলকাতা ছেড়ে উড়িষ্যার হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে আসি?"

"উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট কিন্তু হাসপাতালের জন্য সত্যি বেশ খরচ করছে।"

উনি জবাব দেন "শুধু হাসপাতাল কেন? আজকাল ওড়িয়া ছেলে মেয়েরা লেখা পড়াতেও অনেক এগিয়েছে।" রাত্রি হয়ে যায়। বাসায় ফিরে আসি।

ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হই। ডাক্তার মৈত্র আসেন। খুব মজার মজার গল্প বলেন। ভদ্রলোক এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। গল্প করার ভঙ্গিটিও চমৎকার। নিজের পাণ্ডিত্যের অহংকার এতটুকু নেই।

আমার অসুস্থতা উপলক্ষে প্রায়ই আসেন। খুব ভাল লাগে ভদ্রলোককে। বিশেষ এই নিঃসঙ্গ জায়গায়। ওঁর কাছেও শুনি, ভদ্রলোকের পড়াশুনা যথেষ্ট, গভীর জ্ঞান।

ওঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠি—স্ত্রীটি ও'র কেমন?

সে দিন কথায় কথায় ভদ্রলোক বলেন, "পুরুষ মানুষ আসল প্রেরণা পায় স্ত্রীর কাছে। এদিকে আমি বড় ভাগ্যবান। আমার স্ত্রী একটি অমূল্য রত্ন। আপনারা ভাবতে পারেন এ আমার অতিশয়োক্তি। কিন্তু সত্যি তা নয়।"

মৈত্র প্রায়ই আসেন, খানিক গল্পগুজব করে চলে যান। কখনো মিসেস মৈত্রকে নিয়ে আসেন না বলে আমার একটা ক্ষোভ হয়। আমি কি এমনই অপাঙ্‌ক্তেয় যে, তিনি এখানে একবারও এলেন না! যাক্ ভদ্রলোক ত প্রায়ই আসেন। ওঁর স্ত্রী হয়ত সময় পান না, বা শরীর হয় তো ভাল নয়। এমনি ভেবে সান্ত্বনা খুঁজি।

কথায় কথায় ডাক্তার মৈত্র বলেন, "আমার স্ত্রী একাধারে যে আমার সংসারের কতটা করেন, দেখি আর অবাক হই! এতটুকু জিনিষ তাঁর নজর এড়ায় না। আমি তো বুঝতেই পারি না কখন আমার খাওয়ার সময় আর কখন আমার ঘুমের সময়। তাই বলি ডাক্তার চৌধুরী, গৃহিণীকে যত্ন করুন, এ রত্ন বড় রত্ন।"

আমি জবাব দেই,—"সব ডুবুরীর ভাগ্যেই কি রত্ন জোটে?"

ডাঃ মৈত্র বলেন, "না তা অবশ্যি নয়। তাহলে আর মানুষের দুঃখ ছিল কি? কিন্তু ডাক্তার চৌধুরী ভাগ্যবান নিশ্চয়ই।"

মৈত্র চলে যেতে উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, "ভদ্রলোক বড় সুখী। সে জন্যই এত বড় হতে পেরেছেন। মন সুস্থ থাকলে, পরিপূর্ণ থাকলে, সব কিছুই করা সম্ভব।"

একটু অবাক হই। মৈত্র যেন ওর মনে কি এক অসন্তোষের বীজ বুনে দিয়েছেন। গলার স্বরে কেমন যেন একটা ক্ষোভ।

মিসেস মৈত্রকে দেখবার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। মৈত্র বলেন, "জানেন আমার স্ত্রী কি করেছেন? একটি ঝি ঠিক করে ফেলেছেন। আমি কিছুই জানতুম না। ও বল্লে, আমার ঝি ঠিক হয়ে গিয়েছে। কি করে যে জোগার কল্লে?"

ভাত-পথ্য খেয়েছি। শরীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। মৈত্র আসতেই বলি, "আমি এখন সেরে গেছি, কাল আপনাদের বাড়ী যাব।"

মৈত্র বলেন, "এর ভিতর নড়াচড়া করবেন না। শরীরটা ভাল করে সুস্থ হতে দিন। ইনফ্লুয়েঞ্জাতে শরীর বড় কাতর করে।"

ডাক্তারের নিষেধ মানতেই হয়।

আমার আর সবুর সয় না। ওঁকে বলি, "চল না মৈত্রের বাড়ী?"

উনি বলেন, "ডাক্তার মৈত্র তোমাকে এখন দীর্ঘ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, তা জানো?"

আমি হাঁপিয়ে উঠি। কিছু দিন পরে বলি, "আজ চল।"

"আজ তো আমাদের বিশেষ কাজ আছে। তুমি যদি একান্তই যেতে চাও তো নমিতাকে নিয়ে যাও।"

আমি তাতেই রাজি হই। সমস্ত দুপুর ভাবতে থাকি কি শাড়ী পরব, কোন শাড়ীর সঙ্গে কোন্ ব্লাউজ মানাবে; কোন জুতো ভাল হবে। ননদ নমিতার পোষাক কি রকম হবে। দেখা হলে কি সব চমকপ্রদ কথা বলব। এ সব ভাবতে ভাবতেই বেলা গড়িয়ে আসে, নমিতাকে তাড়া দিয়ে বাথরুমে ঢুকি।

ডাক্তার মৈত্রের কাছ থেকে পথের সন্ধান নেওয়াই ছিল। বাসা খুঁজে পেতে দেরী হয় না। কড়া নাড়তে থাকি। কোনই সাড়া-শব্দ নেই। নমিতা বলে, "তাড়াতাড়ি এসে গেছি।" ওরা হয়তো এখনো নীচে নামে নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা বাজে। আবার কড়া নাড়ি।

এবার একজন স্থূলকায়া মহিলা দরজা খুলে দিয়েই কাপড় সামলাতে সামলাতে চলে যান।

আমরা বলি, "মিসেস মৈত্র আছেন?"

জবাব দেবে কে। কেউ কোথাও নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার কড়া নাড়ি। এবার একটি চাকর এসে বলে, আসুন। নীচের একখানা ঘরে নিয়ে আমাদের বসায়।

আমরা বলি, মিসেস মৈত্রকে বল চৌধুরীদের বাড়ী থেকে লোক এসেছে। যে আজ্ঞে বলে চাকর চলে যায়।

আমরা ঘরখানা দেখতে থাকি। একখানা টেবিল, চার পাশে ক'খানা চেয়ার। এক কোনে কিছু পুরানো বইপত্র একটা সেল্‌ফে অগোছান ভাবে পড়ে আছে। আর এক পাশে একটা চৌকি, তার উপর একটা মোটা পাটি ও আধময়লা বালিশ। সবই যেন শ্রীহীন। একটু বিস্মিত হই। যে ঘরে মিসেস মৈত্র ঢোকেন না, সে ঘরে এনে আমাদের বসানো কেন?

বসে আছি তো বসেই আছি। দেখি, সেই মহিলাটি রান্নাঘর হতে বেরিয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে দোতালায় উঠছেন। খালি গা, কাপড়টার পাড় উঠে গিয়েছে। মাথা পর্যন্ত কোন মতে এসে কাপড় শেষ হয়ে গিয়েছে।

নমিতা হেসে ওঠে। বলে, একখানা চেহারা দেখেছ? ঐ বিরাট ভুঁড়ি কখনো দশ হাত কাপড়ে ঢাকা পড়ে? তাইতো বেচারী কাপড় নিয়েই হিমসিম খায়! এই দেহে কি করে যে কাজ করে ওই জানে।

কিছুক্ষণ পরে, সেই স্থূলকায়া মহিলা সুন্দর শাড়ী ব্লাউজ পরে আমাদের পাশের চেয়ারে এসে বসেন।

আমাদের মুখে আর রা নেই।

মহিলাটি জড়সড় হয়ে বসে হাঁপাতে থাকেন।

আমরা ততক্ষণেএকটু সামলে নেই। নমস্কার করার আর দরকার দেখিনে। বলি, "ক'দিন যাবৎই আপনার সঙ্গে দেখা করব ভাবছি, অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারিনি।"

"হ্যাঁ, আপনাদের কথা ওঁর কাছে সবই শুনি। আমায় বলেছিলেন আপনাকে দেখে আসতে। কিন্তু আমি যাই কি করে বলুন? আমি একটু সময় বাড়ী না থাকলে, আমার ঠাকুর-চাকর কি আর কিছু রাখবে? ছেলে-মেয়েরা বলে, মা আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চল। উনিও বলেন, গাড়ীতে গেলে তোমার কিছু কষ্ট হবে না, চল ঘুরে আসি। পুরুষ মানুষ কি বোঝে বলুন। দুপুরে আমি কোন দিন উপরে বিশ্রাম করতে যেতে পারিনে। তা হলেই তো ওরা সব লুটে নেবে। এই দেখুন না, এজন্য এ ঘরেই তক্তপোষ আনিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি।"

এদিকে নমিতার অবস্থা করুণ। হাসি চাপতে গিয়ে বেচারির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

বলি,—"ডাক্তারবাবু পরম ভাগ্যবান। না হলে আপনার মত স্ত্রী পান।"

মিসেস মৈত্র একগাল হেসে বলেন, "ওঁর কথা ছেড়ে দিন। ওই নামেই এতবড় কাজ করেন। আসলে যা, তা আমিই জানি। হয়ত শনি-মঙ্গলবার চুল কাটতে বসে গেলেন। সে দিন তো আরেকটু হলে কেলেঙ্কারিই করেছিলেন। পরামানিক কাঁচি তুলেছে এমন সময় আমার নজর পড়ে। একটু দেরী হ'লে কি কাণ্ড হত বলুন তো? লক্ষ্মীবার, হয়তো ঠাকুর চাকরকে মাইনে দিয়ে দিলেন। তাই চব্বিশ ঘণ্টাই আমার ওঁর দিকে নজর রাখতে হয়।"

নমিতার চিমটিতে বিব্রত হয়ে বলি, "আপনার মত গৃহলক্ষ্মী যাঁর ঘরে, কোন অমঙ্গলই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আজ উঠি।"

"এখনি উঠবেন? একটু চা খাবেন না? ওঁর ফিরতে আজ দেরী হবে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে কত খুশি হতেন।"

"সে তো নিশ্চয়ই। আপনি একদিন যাবেন"।

গৃহিণী হেসে ওঠেন—"তবে এতক্ষণ আপনাদের বল্লুম কি? আমার কি বেরুবার জো আছে? এই দেখুন না, সেদিন কাপড় কিনতে যেতে পারিনি, সব এগারো হাত কাপড় নিয়ে এসেছেন। আচ্ছা বলুন দেখি, ঘরে এত দাম দিয়ে শাড়ী পরার কি দরকার? আপনাদের ডাক্তারবাবুর এতটুকু জ্ঞান নেই। এমন লোক নিয়ে চলা যে কি মুস্কিল। এই তো বুধবার দিন খুব ভাল কতকগুলি বেগুন এনে বল্লেন, আজ পুড়িয়ে দাও। বুঝুন আপনাদের বিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাণ্ড। বুধবার বেগুনপোড়া খেতে নেই তা পর্যন্ত ওঁর মনে থাকে না।"

জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাইনে, একটু হাসি।

আপনি হাসছেন ? আমি বলেই এ লোক নিয়ে ঘর করছি, অন্যে হলে যে কি দশা ওঁর হত। জানেন, একবার সাত দিনের ছুটি নিয়ে বল্লেন, চল, আমরা পুরী যাব। আমি বল্লুম, জগন্নাথদেব আমার মাথায় থাকুন, তোমরা ঘুরে এস। কে শোনে কার কথা। কটক এসে পুরী দেখবে না। তা-ও কখন হয় ? চল, সেখানে এক বন্ধুর বাড়ী আছে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। অনিচ্ছায় যেতে হয়। ওমা! গিয়ে দেখি ওদের বাড়ীতে সব ব্যবহার করা উনুন। তাতে তো আর আমি রাঁধতে পারি না। ও দিকে পুরীতে আবার উনুন কিনতে পাওয়া যায় না। কি করি! মন্দির থেকে ভোগ আনা যায় ; কিন্তু জুতো পায়ে দিয়ে তা আনা চলে না। মন্দির ও ছিল অনেকটা দূরে। একদিন এনেই এমন হাঁপিয়ে পড়েন যে, বাধ্য হয়ে পরের দিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে কটক ফিরে আসি।

নমিতা অধীর হয়ে বলে ওঠে, "বৌদি! ছেলে-পুলেরা কাঁদবে যে! কখন উঠবে ?"

উঠে দাঁড়াই। বলি, "আপানার অনেক সময় নষ্ট করলুম। আজ যাই।"

"না—না, সময় নষ্ট আর কি ? এতো বাড়ীতেই রয়েছি, ঠাকুর, চাকর কিছু সরাতে ভরসা পাবে না। চা তা হলে খাবেন না ? চা করতে আমার দেরী হত না।"

বলি, "ব্যস্ত হবেন না। আর একদিন এসে চা খাব।"

মৈত্রজায়া বলেন, "এ মেয়েটি কে, ছেলে-পুলেদের আনেন নি কেন ? কার কাছে তাদের রেখে এলেন ? ওঁর কথা বলতে বলতে ওনার কিছু শোনাই হ'ল না।"

জবাব সেরে "আচ্ছা নমস্কার" বলে বেরিয়ে পড়ি।

নমিতা হাসিতে ফেটে পড়ে, বলে, হ্যাঁ ডাক্তার মৈত্র স্ত্রী নিয়ে গর্ব করতে পারেন বটে!

যুগান্তর সাময়িকী
রবিবার ২৮শে আশ্বিন ১৩৬৩

'অর্ধাঙ্গিনী'

যাকে বলে সর্বচূর্ণ সদার বাড়ি, না হলে এমন কাণ্ড কেউ ভাবতে পারে! এই কলিযুগে! অভাবনীয় কাণ্ড চোখের উপর ঘটতে দেখলে দিশেহারা না হয়ে মানুষ যায় কোথা?

আর বিপদ এমন যে এটাকে কোন মতেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই—বা অমুকের আজগুবি গল্প বলাও চলবে না। একেবারে নিজের চোখে দেখা জলজ্যান্ত সত্য। কোন মতেই পাশ কাটানো চলে না!

ছোট-বেলা হতে কতই না শুনেছি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ যুগ-যুগান্তরের। স্বামীর কর্মফলের অর্ধেক ভোগ করেন স্ত্রী, আর স্ত্রীর কর্মফলের অর্ধেক স্বামী। ভুষণ্ডির মাঠ গল্পে একথার সুন্দর জবাব আছে। যত সব কুসংস্কার।

না-এখন আর খুলে না বল্লে চলছে না। বুঝেছি আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকা ধৈর্য-চ্যুতি হবার দাখিল হয়েছেন। স্পষ্ট-ই আপনাদের কথা শুনছি "আরে বাপু! স্বামীর সঙ্গে তোমার বনে না, এই-ত কথাটা। তা এত ভণিতা করার দরকার কি? আজকাল তো এ ব্যাপার জলভাত, তুমি বাপু বকর বকর না করে একটা ডাইভোর্স করে বস না। এখন আমরা স্বাধীন দেশের আদমী, কার তোয়াক্কা রাখি। আর যদি এত হাঙ্গামায় যেতে না চাও এমনি একদিন স্বামীকে বল না যে, রইল তোমার ঘর-দুয়ার, আমার আর পোষাচ্ছে না। তার পর তোমার খুসি মত একাধিক বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে যেমন খুসি ঘুরে বেড়াও না, কে তোমার বারণ করছে। কেউ চোখ-তুলে চেয়েও দেখবে না। আর দেখবে কে—সবারই-ত এক অবস্থা।

না—আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে মিল-অমিলের প্রশ্নই ওঠে না। আমি তার সঙ্গে একটা রফা করে নিয়েছি, আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, আমরা কেউ কারো অধীন নই। তিনি স্নান করতে গেলে আমি তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নেই, ছেলেকে দুধ খাওয়ানো একবার আমি করলে পরের-বার ওকে দিয়ে খাওয়াই। ঠাকুর একদিন কামাই করলে একটা তরকারী উনি রাঁধতে চেষ্টা করেন, একটা আমি। উনি এক ঘণ্টা বাইরে ঘুরলে আমি একদিন বাইরে কাটিয়ে আসি। ডাইনে যেতে বল্লে আমি বাঁয়ে যাই। এমনি

করেই সদা সতর্ক থেকে আমার অধিকার আমি বজায় রাখছি। তাই সুখে-দুঃখে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে। নিজের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা যখন আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যখন ঠিক বুঝতে পারছি আমি একটি বিদুষী মহিলা। আমাকে ছাড়া পাড়া অন্ধকার, তখনই হল এ কাণ্ডটা। আর গোলক-ধাঁধাঁয় রাখব না, না আপনাদের খুলেই বলি ব্যাপারটা।

ব্যাপার-টা হল আমাদের চিন্ময়ীকে নিয়ে। দেখতে মেয়েটা মন্দ নয়—তাই চিন্ময়ী নামটা সে দিন বেসুরো মনে হয়নি। একটু বড় হতে দেখা গেল চিন্ময়ী চিন্ময়ীই বটে, বোধ নামক জিনিষটির তার নেহাৎই ঘাটতি। আমার পিসীমার ননদের জায়ের মেয়ে, তাই তাকে নিয়ে আমাদের আর কি মাথাব্যথা বলুন? তবু প্রায়ই শুনতাম পিসীমার কাছে, এ মেয়েকে নিয়ে যে কি হবে! আজকালের মেয়ে, কোন একটা কাজে ঝোঁক নেই। এমনিতর সাত-সতেরো কথা। পিসীমার বাড়ী ওকে দু'-একবার দেখেছি। ওর বোকামির পরিমাণ দেখে ওকে মানুষ বলেই মনে করিনি।

একদিন খবর পেলাম চিনুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে এক মস্ত বড় সরকারী কলেজের প্রফেসরের সঙ্গে। আমরা তাজ্জব বনে যাই। এ-যুগে এও কি সম্ভব? তবে কথায় আছে নিয়তির চোখ কানা, কিন্তু এ মেয়েকে কি দেখে এমন ছেলে নিলে? তবে কি মেয়ের বাপ মস্ত-বড় চাকুরে বলেই এ সম্ভব হল? ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে হলে কি তার আর কিছুই দেখতে হয় না। ভদ্রলোকের কথা ভেবে খুবই দুঃখ হ'ল, আ-হা-হা! এমন একজন শিক্ষিত মানুষের অদৃষ্টে এই ছিল, ওরা কি মেয়ে সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবরই নেয়নি? এ মেয়ে নিয়ে তো আর সত্যি ঘর করতে পারবে না—কি করবেন ভদ্রলোক?

যাক্, পরের কথা নিয়ে আর কদিন মানুষ থাকতে পারে? যার যার নিজের ধান্ধায় অস্থির।

বছর পাঁচেক পরের কথা। উনি বালেশ্বর বদলী হয়েছেন। বালেশ্বর ছোট্ট জায়গা, তাই প্রায় সবাইকে সবাই চেনে। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আমাকে সবাই ভালবাসে, খাতির করে। আমি মহিলা সমিতি খুলেছি দুঃস্থা মেয়েরা যাতে করে নিজে কিছু করে নিতে পারে। সভা-সমিতি করি। বক্তৃতা দিয়ে মেয়েদের পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করি এবং স্বামী নামক জীবটিকে যে কোন মতেই আসকারা দিতে নেই তাই একাধিকবার বুঝাই।

একদিন শুনি এখানে যে নূতন কলেজ হচ্ছে তার গুপ্ত বলে একজন প্রফেসার

এসেছেন। চমৎকার ভদ্রলোক। এসেই সবার সঙ্গে কেমন মিশে গিয়েছেন।

নূতন আগন্তুক। একবার যাওয়া দরকার। সে দিনই গুপ্তের বাসার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।

বাংলা প্যাটার্নের বাড়ী, তিন খানা বেড-রুম, কিচেন, ষ্টোর সবই অল্লের উপর আছে।

ভদ্রলোক স্মিত মুখে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন। বল্লেন, মিসেসকে এখনও আনিনি, কারণ নূতন জায়গায় সব কিছু ঠিক করে না নিয়ে আসা অসুবিধে।

ভদ্রলোকের বয়স নেহাৎই কম, কথাবার্তায় খুবই ভদ্র। চা খাওয়ালেন, বল্লেন কলকাতা হতেই একটী লোক নিয়ে এসেছি—এটি আমার পুরোনো লোক; ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সবটাতেই চলে।

ঘুরে ঘুরে আমায় ঘর-দোর সব দেখালেন। অসবাব পত্র বিশেষ কিছু নেই, তবে ঘরে দু-চারটি জিনিষ যা আছে তা অত্যন্ত রুচিসম্মত, সুশৃঙ্খলায় রক্ষিত। টিপয়ের উপর একটি মাস আটেকের শিশুর ফটো, শিশুটি অতি মাত্রায় বলিষ্ঠ, গ্লাক্সোর বিজ্ঞাপনের মতই স্বাস্থ্যবান, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, একটা ইজি-চেয়ারে বসে পুতুল নিয়ে খেলছে।

গুপ্তকে আমাদের বাসায় আসার নিমন্ত্রণ করে বেরিয়ে পড়ি। গুপ্ত মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসেন, আমার সমিতি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে একটু মুচ্‌কে হাসেন।

জয়া একদিন কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে, "দিদি, আমি আর বাড়ী যাব না। আপনাদের সমিতিতে যা হ'ক আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন"। ও'র স্বামী মোটেই সুবিধার নয়, অত্যন্ত মতলবী—খিটিমিটি প্রায় লেগেই আছে, তবে আজ কিছু বিষম কাণ্ড করেছে, নয়তো কাঁদবে কেন?

জয়াকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা জেনে নেই। জয়ার স্বামী সাধারণতঃ কোথাও বেড়ানো পছন্দ করেন না। কাল সব কাজ সেরে রেখে জয়া বাপের বাড়ী গিয়েছিল বেড়াতে, আসতে একটু দেরী হয়, তাই বাবু যা নয় তাই বলে গালি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি এখনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

শুনে রাগে আমার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে। এতবড় স্পর্দ্ধা। তুমি আমার বাড়ী এখন চল, তারপর দেখি তোমার স্বামীকে শায়েস্তা করতে পারি কি না।

"ঘর ভাঙ্গছেন"।

চমকে পেছনে চেয়ে দেখি কখন গুপ্ত এসে দাঁড়িয়েছেন। বলি, একে আপনি ঘরভাঙ্গা বলেন? কত বড় অত্যাচার জানেন?

'এত উত্তেজিত হবেন না মিসেস সেন, চিরকাল স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলে আজ একটু আধটু বেয়াদপিতে এতটা উত্তেজিত হলে চলবে কেন?

'ছিঃ ছিঃ! আপনি বলেন কি মিষ্টার গুপ্ত, চিরকাল আমাদের উপর অত্যাচার চলে আসছে বলে চিরকালই আমরা মার খাব? আপনার মত একজন শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে এ কখনই আশা করিনি।'

"মার খেতে আমি বলিনি মিসেস সেন। আমি বলছি প্রতিটি লোককেই সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা দরকার। আপনারা যদি এমন বিরুদ্ধ মন নিয়ে আমাদের বিচার করেন তবে আমরা যাই কোথা? হয়তো কোন কারণে আজ ভদ্রলোকের মন খুব খারাপ ছিল, তাই যে রাগ অন্যের কাছে চেপে রাখতে হয়েছে, স্ত্রীর উপর তাই নিশ্চিন্তে প্রকাশ করেছেন। আপনি জয়া দেবীকে আপনার কাছে রেখে কাজ দেবেন, তাতে সমস্যার সমাধান কোথায় বলুন?"

"কেন? জয়া একটা কিছু করে পেটটা চালাতে পারবে না, আপনারা এতই অক্ষম মনে করেন আমাদের?"

"আপনাদের আমি এতটুকু অক্ষম মনে করি না মিসেস সেন। বরং আপনারা শক্তির আধার বলেই বিশ্বাস করি। শুধু দুটি খাওয়া পরাই কি জীবনের একমাত্র কাম্য? জয়া দেবীর কি আর কিছুই দরকার হ'বে না? বুঝলাম সুরেশবাবু লোক খুবই খারাপ, কিন্তু দুনিয়ায় শুধু ভাল লোক থাকবে এ আপনি কি করে আশা করেন?

রাগে আমি অন্ধ হয়ে উঠি, বলি "ও! আপনিও যে একজন পুরুষ! তাই যত শিক্ষিতই আপনি হোন, নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ কথা আপনি বুঝবেন কেন? অমন স্বামীর ঘর করার চেয়ে দাসীগিরি করে খাওয়ায় অনেক সম্মানজনক।"

মিষ্টার গুপ্ত হাত জোড় করে বলেন, "দোহাই মিসেস সেন! আমার প্রতি অবিচার করবেন না। পুরুষ যত নিষ্ঠুর, যত অত্যাচারীই হোক তাদের যখন বাদ দেবার উপায় নেই তখন একটা রফা করে চলা ছাড়া উপায় কি? অধীনতার গ্লানির কথা বলছেন, দুনিয়ায় স্বাধীন কে? জয়া দেবী নার্সিং করুন, চাকুরী করুন, যাই কেন না করুন—সেখানেও কা'র না কারো মতানুসারেই চলতে হ'বে

এবং এতটুকু নিজের ইচ্ছা খাটবে না। তাই বলছি মানিয়ে চলা ছাড়া উপায় কী? তা বলে ভাববেন না, সুরেশবাবুকে আমি সমর্থন করছি। সুরেশবাবু খুবই অন্যায় করেছেন। জয়া দেবী তার সে অন্যায়—স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে, তাকে বুঝিয়ে দিন। ত্যাগ করে এলে সে তো আরো বেড়েই যাবে। অবশ্যি কোন কোন লোক থাকে সীমাহীন বেয়াড়া। তেমন লোক যার ভাগ্যে জোটে দুর্ভোগ ভোগা ছাড়া আর তার গত্যন্তর কি?"

"মিষ্টার গুপ্ত! আপনি আসুন। সুখী লোক আপনি, দুঃখীর ব্যথা আপনি কী বুঝবেন?"

এতক্ষণ পরে আবার গুপ্তের মুখে সেই পরিচিত স্মিতহাসি দেখা যায়। বলে, "অযথা আপনাকে অনেকগুলি অপ্রিয় কথা বললাম, মাপ করবেন। আজ আপনার মন বড় বিক্ষিপ্ত। স্থির হয়ে কিছু ভাবা আজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি উঠি—"

ইচ্ছা না থাকলেও ভদ্রতায় বাধে। বলি "এক কাপ চা খেয়ে যান।"

"দিন"—বলে বসে থাকেন গুপ্ত।

অগত্যা চা দিতেই হয়।

জয়াকে নিয়ে কয়েক দিন খুব ব্যস্ত থাকি। ও'র থাকা-খাবার ব্যবস্থা করা, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা, এসব তো আছেই, তদুপরি জয়াকে বুঝানো আরও মুস্কিল। পরের দিনই সুরেশ বাবু ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন, আমি কিছুতেই যেতে দিইনি, জয়াকে দিয়েও বেশ কড়া কিছু শুনিয়ে দিয়েছি। জয়ার কোলে খুব ছোট বাচ্চা নেই। ওর মেয়ে দু'টি বড়ই হয়েছে। কিন্তু ওর মত এখন পাল্টে গেছে। ক'দিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারেনি। তারপর এখন ক্রমাগতই বলছে, "থাকগে দিদি, ও আপনি মিটিয়ে ফেলুন। মেয়ে দুটো না জানি কী করছে, ওঁ'রও তো কখনো রান্না করা অভ্যেস নেই। কি করে চালাচ্ছে কে জানে"—বলতেই চোখে জল এসে যাচ্ছে।

যত সব ছিঁচকাঁদুনে হতচ্ছাড়ী! এদের দুবেলা ঝাঁটা-ই খাওয়া উচিত, ওদের ভাল মানুষে করে? কাল গিয়েছি উকিলের বাড়ী, এসে শুনি পাখি পালিয়েছে। মনটা বড়ই খিঁচিয়ে আছে, একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি।

হাঁটতে হাঁটতে দেখি গুপ্তের বাড়ীর কাছে এসে গেছি। যদিও গুপ্তের মতামত আমার মোটেই ভাল লাগেনা, তবু কি ভেবে ঢুকে পড়ি।

স্মিত হেসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গুপ্ত বসান। বলেন, "আমি আর যেতে পারিনি, তার কারণ আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল।"

বলি "বেশ লোক, একটা খবর পাঠালেও তো পারতেন। বিদেশে একা আছেন, অসুখ বিসুখেও কি একটা খবর দিতে নেই ?"

"তেমন কিছু হ'লে নিশ্চয়ই জানাতাম, শুধু আপনাদের ওখানে যাবার মত অবস্থা ছিল না তাই বলছি। তারপর আপনার সমিতির খবর কী ? জয়া দেবীর ?"

"মিষ্টার গুপ্ত ! এরা করুণারও অযোগ্য, আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে, যে স্বামীর বিরুদ্ধে রোজ এসে নালিস করত, দু'দিন পরেই আবার তার কাছেই যাবার জন্য কি করে অস্থির হয়।"

"খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার মিসেস সেন। স্বামীর সাময়িক ব্যবহারে রাগ হত আর আপনার মত একজন সমঝদার পেয়ে দুঃখটা উথ্‌লে উঠত। তারপর দু'দিন যখন সত্যি সব ছেড়ে থাকতে হ'ল তখন প্রকৃত জিনিষটি বুঝল। কত দেখেছি—স্বামী-স্ত্রী দিন রাত্রি ঝগড়া করছে, সেই স্বামীর একটু ফিরতে দেরী হ'লে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন স্ত্রী, স্ত্রীর অসুখ হ'লে স্বামী অফিস কামাই করে গেছেন ডাক্তারের কাছে। গায়ের কালো চামড়াটা আপনার পছন্দ নয়, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে আপনি চল্‌তে পারেন না। ঐ অপছন্দের চামড়ার অসুস্থতায় ভুগতে হয় আপনাকে। মসৃণ উজ্জ্বল হ'লে তৃপ্তি স্বস্তি আপনারই।"

"নাঃ, আপনি আমায় বড় নিরাশ করে দিলেন। আমার ভরসা ছিল আপনার মিসেসটিকে আমি সাহায্যকারী পাব। এখন আর ভরসা হয় না।"

"সর্বনাশ ! আবার আমার ঘরেও হাত বাড়াবেন ?"

"কেন ? ছেড়ে দিতে আপনার ভয় আছে নাকি ?"

"তা একটু আছে বৈকি ?"

"ছিঃ ছিঃ কি মনোবৃত্তি আপনাদের ! যত শিক্ষিত আর কালচার্ডই হোন, বউকে ঘরের বা'র করতে আপনারা শিউরে ওঠেন। আপনাদের তুলনায় আমার স্বামী অনেক ভদ্র।"

"গাল দিচ্ছেন কেন মিসেস সেন ! রৌদ্র, বৃষ্টি, ভুত, প্রেত, দৈত্য, বাঘ, ভালুকের থেকে বাঁচতে হ'লে মানুষের চাই গৃহ। গৃহই হ'ল শান্তির আলয়। তাই আমাদের সকলের আগে দরকার ঘরের শান্তি। ঘরে আগুন জললে সে ঘরে আপনি থাকতে পারেন না। ঘর পুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লে হাজার রকম

বিপদের সম্মুখীন তো আপনাকে হ'তেই হবে। তদুপরি আপনার জীবনে কথনই প্রতিষ্ঠা পাবেন না।"

"বুঝেছি, আপনি একে পুরুষ তায় সুখী। মানুষের অশান্তি আপনি কী বুঝবেন? কাউকে না পাই আপনাদের বিরুদ্ধে আমি একাই লড়ব"—বলে উঠে দাঁড়াই।

"লড়কে লেঙ্গে! তা নেবেন। সে তো ভবিষ্যতে। বর্তমানে আপনার চা আসছে, একটু বসুন।"

চুপ করে চা খেয়ে চলে আসি। নিজের সম্বন্ধে আরও সতর্ক হই, যেন উনি কোন রকমেই আস্কারা না পান, বা আমার নিজের কোনও দুর্বলতা না প্রকাশ পায়।

দিন পনেরো কেটে গিয়েছে, এ'র মধ্যে শুনেছি প্রফেসার গুপ্তের স্ত্রী এসেছেন। এ'র তার কাছে এও শুনেছি যে স্ত্রীটিও নাকি চমৎকার। অত্যন্ত সরল মানুষ, দাস-দাসীর প্রতি এমন সুন্দর ব্যবহার বড়লোকেরা করে না। এতটুকু মান অভিমান বা গর্ব নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আর গুপ্তের বাসায় যাই নি, তাই হয়তো আমার কাছে নিয়ে আসেন নি। একবার যেতে হয়।

গুপ্ত সস্ত্রীক এসে হাজির। বৌ হাত তুলে নমস্কার করে। আমি প্রতি-নমস্কার করে বলি, "আমার যাওয়া খুবই উচিত ছিল। যাব যাব করে হয়ে ওঠেনি।"

গুপ্ত বলে, "আমরা আরো আগেই আসতুম, রাস্তার ধকলে বাচ্চাটার শরীর ভাল ছিল না।"

চমৎকার সুন্দর শিশুটি। তাড়াতাড়ি হাত পেতে কোলে নিয়ে ভাবি গুপ্তের স্ত্রীকে কোথায় যেন দেখেছি।

চিনু চিৎকার করে ওঠে, "ওমা আপনি সবিদি?"

তাইতো এ যে আমাদের সেই চিনু! স্বামী প্রফেসর গুপ্ত! বিস্ময়ের ধাক্কা আমি কোন মতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। তখনো তো জানি না এর চেয়ে বড় বিস্ময় আমার জন্য জমা হয়ে আছে।

সে দিন আর কি বলেছি, কি করেছি কিছুই আমার মনে নেই। মাঝে মাঝে গুপ্তের বাসায় যাই। চিনুর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি, সেই চিনু! পিসীমা বলতেন এ বলদটাকে নিয়ে কত যে দুর্ভোগ আছে! বিয়ে দিলেও আজ বিয়ে হ'লে কাল তাড়িয়ে দেবে! কী করে গুপ্ত এর পরিবর্তন করল?

গুপ্তের মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করে, হ্যাঁ ঘর বাঁধার কথা বলার এর হক আছে।

গুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছে, পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, পাখিকে বুলি শিখিয়েছে।

আবার ভাবি, পাখির মুখের বুলি শুনে মানুষ মুগ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু মানুষের মুখের দু'চারটা বাঁধা বুলিতে মানুষ খুসি হয় কি? প্রতিমার সৌন্দর্যে দর্শক যত মুগ্ধই হোন কুমোরের কি মনে জাগেনা এর ভেতরে খড় মাটি?

নাঃ, গুপ্তের মুখে কোন অসন্তোষের আভাস নেই, বরং একটা আত্মতৃপ্তির ভাবই প্রকট হয়ে ওঠে। আর সেটা নীরবে আমাকে বিদ্রূপ করতে থাকে।

কিসের এক দুর্বার আকর্ষণে গুপ্তের বাসায় না গিয়েও পারি না। গুপ্ত সতত চিনুর পাশে পাশে থাকেন, চিনু একটা বেফাঁস কিছু বলে ফেল্লে এমন ভাবে হেসে ওঠেন যেন চিনু একটা মস্ত রসিকতা করেছে। আমার পিত্ত জ্বলে যায়।

সে দিন গিয়ে দেখি, চিনু বসার ঘরে ছেলে নিয়ে খেলছে।

আমি বলি, "গুপ্ত বাসায় নেই?"

হ্যাঁ আছে। কি জানি হয়েছে, শুয়ে আছে।

"কি হয়েছে তুমি জান না?

"আমি কি করে জানব। মাঝে মাঝে শুয়ে গড়াগড়ি করে।"

"ডাক্তার দেখাও নি?"

"দেখিয়েছি, ওষুধও খায়।"

শোবার ঘরে গিয়ে দেখি গুপ্ত বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করছে, একটা হট্‌ ব্যাগ নিয়ে শুয়ে আছে।

আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে।

"কি হয়েছে?"

"একটা কলিক পেইন"—একটু সামলে নিয়ে গুপ্ত বলে।

"ডাক্তার দেখান নি?"

"দেখিয়েছি, চিকিৎসা অনেক হ'ল, অপারেশন না করলে আর পথ নেই।"

"যা হয় করুন, এ ভাবে কত দিন ভুগবেন?"

"ভোগা না ভোগা কি আমাদের ইচ্ছাধীন?

"হ্যাঁ, অনেকটা আমাদের ইচ্ছাধীনই, আপনি গা এলিয়ে না দিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন তো!"

গুপ্ত হাসেন।

আজ যেন গুপ্তকে বড় অসহায় মনে হয়।

আরেক দিন গিয়ে দেখি মাটিতে মুড়ি বিছিয়ে দিয়ে চিনু ঘুমাচ্ছে, বাবলুতাই খুটে খুটে খাচ্ছে।

শিউরে উঠি, তাড়াতাড়ি চিনুকে তুলে দি; "এ কি কাণ্ড! বাবলুকে মাটিতে মুড়ি দিলে কে?"

"আমি দিয়েছি, এখন তো আর বাসায় নেই। বিরক্ত করে তাই মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।"

চিনু উঠে দাঁতে কিছু সাদার গুঁড়ো ঘসে। আমি 'থ' হয়ে চেয়ে থাকি। চুপ করে থাকতে পারি না, বলি, "তুমি সাদার গুঁড়ো দাও, গুপ্ত কিছু বলেন না?"

"বলে আবার না—আমি তো চুপি চুপি দি, তবু কেবল জিজ্ঞেস করে তোমার দাঁত কালো হচ্ছে কেন? আমি সোজা বলি আমি তার কি জানি? তার পর দুবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে দাঁতে যেন কি করেছে। তাতে দাঁত পরিষ্কার হয়। আন্দাজে বলে, ছোট লোকেরা দাঁতে সাদার গুঁড়ো দেয়।"

জয়োল্লাসে আমার অন্তর নৃত্য করে ওঠে। না গুপ্ত ভীষণভাবে হেরে গিয়েছে। কুশ্রীতা ঢাকতে যত আবরণই চিনুর উপর চাপাক তবু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখি গুপ্তের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও গৃহলক্ষীর আবির্ভাবে গৃহের সে জৌলস আর নেই।

অন্তর আমার ময়ূরের মত পেখম তুলে নৃত্য করে ওঠে। প্রায়ই যাই গুপ্তের বাসায়। ভদ্রলোকের জন্য দুঃখই হয়। কী নিঃসঙ্গ লোক! গল্প করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, মেয়েদের কথা—কোন কিছুই বাদ পড়ে না। যখনই ভদ্রলোককে জব্দ করার মানসে চিনুকে সাক্ষী মানব বলে ভাবি তখনই দেখি কোন না কোন ছুতায় গুপ্ত চিনুকে সরিয়ে দিয়েছেন; আমি মনে মনে হাসি। তবে ভদ্রলোকের বুদ্ধিকে তারিফ না করে উপায় নেই।

উড়িষ্যার বন্যার সাহায্যার্থে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় হবে। আমার আর বিশ্রাম নেই। এ সব ব্যাপারে বরাবরই আমি অগ্রণী। সব মেয়েরা প্রস্তাব করে মিসেস গুপ্তকে সভানেত্রী করার জন্য। শুনে চমকে উঠি। এতদিন অনেকেই চিনুর প্রশংসা করলেও তেমন কান দেইনি, বরং একটা অনুকম্পাই জেগেছে। এরা তো জানে না

চিনু কী ! বাইরে থেকে দেখে মস্তলোকের গৃহিণী, দুচারটে কথা যা শোনে ভাবে চমৎকার, তা বলে সভানেত্রী করতে চাইবে চিনুকে, এ কল্পনাতীত। দুর্ভাবনায় পড়ি। হঠাৎ একটু আলোর রশ্মি দেখতে পাই, গুপ্ত কখনই রাজী হবেনা। যা বাগড়া দেবার সেই দেবে, আমি কেন মিথ্যা ভেবে মরছি। এবার ভদ্রলোকের দর্প চূর্ণ হবে।

ওরা দল বেঁধে গুপ্তর কাছে যায়, আমি কাজের ছুতোয় কেটে পড়ি। ওদের কাছে খবর পাই চিনু রাজী হয় নি। গুপ্ত বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করেছেন, বলেছেন "এসব মহিলাদের সম্মানার্থে তোমাকে সভানেত্রী হতেই হবে।"

বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। গুপ্ত রাজি হয়েছে ! চিনু হবে সভানেত্রী ! কত মহিলা এল, কত মহিলা গেল, সভানেত্রীর পদ আমার একচেটিয়া অধিকার ! আজ চিনু হ'ল আমার প্রতিদ্বন্দী ! কি লজ্জা !

অসম্ভব ! এ হ'তে পারে না, এ আমি কোনমতেই সইতে পারব না। গুপ্তকে গিয়ে ধরব। আমার কথা গুপ্ত ফেলতে পারবে না। গুপ্তর কাছে একটু ছোট হতে হবে—তা হোক। আর তো কেউ জানবে না।

গুপ্তের বাসায় গিয়ে দেখি গুপ্ত সভানেত্রীর ভাষণ লিখে চিনুকে দিয়ে মুখস্থ করাচ্ছে।

আমি কোন ভূমিকা না করেই বলে উঠি, "চিনুকে সভানেত্রী করাটা কি ঠিক হল ?"

"ঠিক অঠিকের প্রশ্ন কোথায় ? সবাই ধরেছে, তাই হবে।"

আমি চিনুকে এক কাপ চা দিতে বলি।

চিনু বেরিয়ে যেতেই বলি, "আপনি এ প্রস্তাব বাতিল করুন।"

"কেন ?"

"আমি থাকতে সভানেত্রী আর কেউ হতে পারে না, বিশেষ চিনু তো নয়ই।"

গুপ্তের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, "বেশ সবাই যদি চায়, আপনি হবেন।"

তখন আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছে।

"সবাই না চাইলেও আপনাকে প্রস্তাব করতে হবে আমাকে করার জন্য। মিষ্টার গুপ্ত ! আমার এ উপকারটুকু আপনি করুন। আপনি আমার বন্ধু।"

"বন্ধু হ'তে পারি। চিনু এ সুযোগ হারালে আর পাবে না, আপনি বহু

পাবেন, তাছাড়া আপনি হলে মিষ্টার সেনের জয়, চিনু হ'লে জয় আমার। আপনি কেন আমার জয়ে সুখী হতে পারছেন না?"

উঃ ভগবান! গুপ্ত আসার পর থেকে মুখে কালি তো মাখছিই! শেষ পর্যন্ত এও বাকি ছিল!

কাপুরুষ! ভীরু কোথাকার!! আমিও দেখে নেব। যত সব স্ত্রৈণ। এরা আবার ভদ্রলোক! গুপ্তের বাসা থেকে বেরিয়ে আসি।

কী করে গুপ্তকে জব্দ করা যায় তারই প্ল্যান করতে করতে আসি। কিছু দূর আসতেই একটা কথা তীরের মত আমার কানে ঢুকল, 'গিন্নীতো সভা সমিতিতেই ব্যস্ত, ঘর সামলাবেন কখন?" দেখি মস্ত জনতার ভীড়, সবাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আমার বাসার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কী বলাবলি করছে। আমাকে দেখেই সবাই একেবারে চুপ। এত ক্লান্ত লাগছিল আর দাঁড়াতে ইচ্ছা হয় না, তা ছাড়া মানুষের উপর আজ আর আমার কোন দরদও নেই, আস্থাও নেই। মরুকগে! সোজা বাড়ী ঢুকি। দেখি লাল পাগড়ীতে বাড়ী ছেয়ে গিয়েছে। আমার স্বামীর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। অভিযোগ তহবিল তছরূপ।

মুহূর্তে পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠল। আমি দাঁড়াই কোথা? *

* যুগান্তর সাময়িকী—২৭ মাঘ ১৩৬৬

বান্ধবী

মাধবী যে দিন প্রথম টাইপিষ্ট হয়ে অফিসে আসে সেদিন নন্দন ওর চ্যাপ্টা নাকটি নিয়ে অলক্ষ্যে খুব রঙ্গ ব্যঙ্গ করেছিল, আর মজাও লাগছিল এই ভেবে যে মেয়েটি তার আণ্ডারে কাজ করবে অর্থাৎ সে মালিক। ঠিক তার মেজাজমত না চললে সে উপরে রিপোর্ট করলেই মাধবীর চাকুরীর দশা গয়া।

মাধবী সসংকোচে তাকে সব জিজ্ঞেস করছিল। নন্দন গম্ভীর মুখে সব বলে যাচ্ছিল। ক'দিন পরেই মজা ফুরিয়ে যায়। মেয়েটি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নীরবে কাজ করে যায়। নন্দন ভেবে রেখেছিল মাধবীর কাজে ভুল হলেই বলবে মেয়েরা যে কেন কাজ করতে আসে? তাদের কাজ হ'ল বাসন মাজা রান্না করা। কথায় বলে 'যার কাজ তারই সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' সে সব কিছুই হ'ল না।

মাধবীর নাকটি চ্যাপ্টা হলেও চোখ দুটি ভাল, হাসিটি আরও সুন্দর। হাসলে গালে টোল খায়, চোখ দুটি হাসতে থাকে। তখন মনে হয় ঠিক এমন নাক না হলে বুঝি মুখখানা এত সুন্দর হতনা। তাই ওকে রাগানোর চেয়ে হাসাতেই ইচ্ছা হয়। মেয়েও এমন সেয়ানা, হাসি বড একটা ওর মুখে দেখা যায় না। হাসি পেলে চাপতে চেষ্টা করে, চোখটা শুধু চিকমিকিয়ে ওঠে। রাগ হলেও প্রকাশ করেনা, শুধু নাকটা একটু ফুলে ওঠে—ঠোঁটটা জোরে কামড়ে ধরে।

যাকগে ও-নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ওই সাধারণ মেয়ের কথা নিয়ে কে সময় কাটায়? তাই অনেক দিন নন্দন আর ওদিকে নজর দেয় নি। এবার নন্দন নিজের ভাষায় বলতে থাকে আজ কিছুদিন ধরে ও-যেন আমাদের শান্তি ব্যাহত করছে। ব্যাহত করছে কিছু করে না, কিছু না করে। আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে সিনেমায় যাই, সার্কাস দেখতে যাই। কিন্তু এ মেয়ে সব সময়ই অনুপস্থিত। ও অনুপস্থিত থাকলে আমাদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়। আমাদের এত অবহেলা কিসের? কেন? আমরা কি এতই কেষ্টু না? অনেক বলে কয়ে দু-এক দিন সঙ্গে গেছে বটে, কিন্তু সে যেন এক প্রাণহীন পুতুল। আমাদের হৈ-চৈ-তে যোগ দেয়নি। গল্প করেনি, নিজের ভিতর নিজে সমাহিত। এ যাওয়ায় মেজাজ আরও চড়ে ওঠে। শুধু অনুরোধ রক্ষা করা, দয়া।

আমরা কয়েক জনে মিলে জয়েন্ট টিফিন করি। মাধবী তাতে যোগ দেয় না, বাড়ী থেকে টিফিন নিয়ে আসে। আমরা অফার করি—ও খায় না।

একদিন বলেই ফেলি,—আপনি কী ভাবেন ?

'ও' চমকে মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে—কিসের ?

কিসের আবার ? আমাদের সম্বন্ধে ?

আপনাদের সম্বন্ধে কী ভাবব ?

মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন। যেন ভিজে বেড়াল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ঠোঁট কামড়ে ধরি, পাছে বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। সংযত হয়ে বলি, এক সঙ্গে কাজ করি, এক সঙ্গে থাকি, বসি, তবু আপনি যেন সব সময় আলাদা। আমাদের যেন মানুষ বলেই মনে করেন না, কেন বলুন তো ? আমরা কি এতই অভদ্র যে আমাদের সঙ্গে মেশা যায় না ?

ছিঃ, ছিঃ কী বলেন ! আলাদা কোথায় ? আমি তো আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি—

কী জবাব দেব ? জেগে যে ঘুমায় তাকে জাগানো যায় না।

ক'দিন ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলি। তাতেও 'ও'র দিকে কোন তারতম্য লক্ষ্য করিনা। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ! মাধবী যদি সাধারণ ভাবে আমাদের সঙ্গে মিশত, আলাপ আলোচনা করত তো আমাদের বলার কিছু ছিল না। কিন্তু ওর এই গণ্ডি টেনে চলা আমরা বরদাস্ত করে উঠতে পারছিনে। ফলে ওর কথা ওর ভাবনা সর্বক্ষণ ওর কথাই ভাবি। কেমন জানি একটা জিদ চেপে যায় ওর এই মৃন্ময়ী মূর্তিতে। অথচ ও সত্যি মৃন্ময়ী নয় তা বোঝা যায় কখনো-সখনো বিদ্যুৎ কটাক্ষে।

বাড়ী গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে যেই গল্পের বইটি হাতে নিয়েছি বাবা ডাকেন—খোকা শুনে যাও।

বইখানা রেখে বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াই।

তিনি বলেন—আমি সম্বন্ধ দেখছি। তুমি বিয়ের জন্য প্রস্তুত হও।

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন, আর চোখ মটকে বলছেন কেমন জব্দ !

মা'র মুখের দিকে তাকাই।তিনি উল বুনতে ব্যস্ত। আমি বলি, এখন আমি বিয়ে করব না।

বাবা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—এখন বিয়ে করবে না কখন করবে শুনি ? বয়স কত

হল খেয়াল আছে ? আজকালের ছেলেদের এই এক রোগ। এখন বিয়ে করব না! তারপর বুড়ো বয়সে একটা বেজাত অজাত ধরে আনবে। এখন বিয়ে করতে তোমার বাধাটা কি শুনি? এ মাসেই তোমার বিয়ে দেব অযথা আপত্তি ক'রো না।

এখন আমি বিয়ে করব না—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

রাত্রিতে খাবার ডাক পড়লে, পরে খাব বলে পাশ কাটাই। বাবার খাওয়া হয়ে গেলে, খেতে বসে ফেটে পড়ি। মাকে বলি, তোমরা আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন ?

কেন মানে ? আমি একা আর সংসারে সব দেখে উঠতে পারছিনে।

না পার লোক রাখ।

মা রুখে ওঠেন, মূর্খের মত কথা বলিস না, বৌ-এ'র কাজ লোকে করবে নারে আহাম্মুক ?

বৌ-এর কাজটা কি শুনি ? তোমার বৌ এসে খুন্তি বেড়ী ধরবে না, বাসন কোসন মাজার মত তুচ্ছ কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঠাকুর দেবতার ভোগ আজ আর নেই, নেই অতিথি সজ্জন দেখা, বাড়ী রক্ষার প্রশ্ন ওঠে না,কারণ থাকবে আমার সঙ্গে কোয়াটারে নয় তো ভাড়া বাড়ীতে। বৌ করবে কী শুনি ?

থাম্, বেয়াড়া ছেলে,—মা ধমকে ওঠেন।

দিদি বলে, তোর লজ্জা করে না মাকে এসব বলতে ?

আমি হেসে উঠি হো-হো করে, চমৎকার কথা। মাকে আমার বিয়ের কথা বলতে লজ্জা হবে ? মার কাছে মনের কথা বলব না ? মার দিকে চেয়ে বলি আরও আছে বৌ-রূপী হাতীর খরচ যোগাতে যে আমার ঘাড়টি যাবে তা ভেবে দেখেছ ? তার উপর যখন ঘর আলো করা তোমার ২/৪টি নাতি-নাতনী জুটবে তাদের খাওয়াবে কী ? আজ কাল বোধ ফুডের ক্রাইসিস জান ?

এবার মা হেসে ফেলেন, বলেন, ডেপো ছেলে, অনেক হয়েছে, এবার খা।

খাচ্ছি, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো।

দিদি ভেংচে ওঠেন, আচ্ছারে বাক্যবাগীশ দেখব বিয়ে তুই করিস কিনা। করবি ঠিকই বাবা যা বলেছেন বুড়ো বয়সে।

সে দেখা যাবে।—বলে উঠে পড়ি।

অফিস ছুটি হতে বেরিয়ে দেখি, মাধবী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আজ যেন মাধবীর মুখে কাঠিন্য মিলিয়ে সেখানে আকুতি ফুটে উঠেছে, কি যেন বলতে চাইছে।

মাধবীর চোখ চিকমিকিয়ে ওঠে, গালে টোল পড়ে। মুখেও একটু সলজ্জ হাসি দেখা দেয়। আমতা আমতা করে বলে, আমাকে একটু সর্ষের তেল যোগাড় করে দিতে পারেন ? এমন মুস্কিল হয়েছে, আজ কদিন একদম পাচ্ছিনে।

বিব্রত মুখে আমি বলি, আচ্ছা আমি দেখব।

মাধবী বলে, তা হলে আমার খুবই উপকার হয়।

আচ্ছা তেল কোথায় পৌছে দেব বলুন তো ?

আজ ও নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর ঠিকানা দিলে।

দিন তিনেক পরে একদিন বিজয়গর্বে মাধবীদের বাড়ী গিয়ে বলি, নিন আপনার জিনিস।

আনন্দে মাধবীর চোখ নেচে ওঠে, গালে টোল পড়ে, সত্যি, আশ্চর্য ! আমি তো কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলুম না। এ ক'দিন অফিসে যাননি কেন ?

শরীরটা ভাল ছিল না—জবাব দেই। এ ছাড়া কী-ই বা বলতে পারি ! এ কথাতো আর বলা যায় না যে সর্ষের তেলের জন্য লাইন দিতুম, সমস্ত দিন লাইনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা বেলা শুনতুম তেল ফুরিয়ে গেছে। তিন দিন এমনি অস্নাত অভুক্ত থেকেও যোগাড় করতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যখন ফিরে আসছিলুম তখন রাস্তায় একজন চুপি চুপি বললে এক কেজি বন্ধ টিনে সর্ষের তেল নেবেন ?

হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়ার উপমাটা এতদিনে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করলুম। ইচ্ছে হল লোকটাকে কোলে তুলে নাচি। সে তাড়াতাড়ি বললে পনের টাকা দিলেই তেল দেবে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি। এ সব তো আর বলা যায় না।

খুব জোর সংবর্ধনা পেলুম। মাধবীর মাও এসে বললেন ,বাঁচিয়েছ বাবা, তেল ছাড়া যে কি বিপদে পড়েছিলুম, আমার তো যোগাড় করে দেবারও কেউ নেই, মাধবীর সময়ই হয় না।

মাধবীও এরই মধ্যে চা মিষ্টি নিয়ে এল। পরিতৃপ্ত মনে ধূমায়িত পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলি, আবার এসব কেন ?

মাধবী চোখ চিকমিকিয়ে বলে, আজ খেয়ে নিন। এ'র পর তো ছানার জিনিষ নিষিদ্ধ হচ্ছে।

মা বললেন—সত্যি বাবা দেশের একি অবস্থা হল বল ত ? চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, চিনি নেই, মাছ নেই। নেই, নেই, নেই শুনতে শুনতে কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল।

আমরা যে সভ্য হচ্ছি মাসীমা—বলে অনিচ্ছা সত্বেও উঠে পড়ি। কথায় বলে কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস। এই সর্ষের তেলই শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচালে। জীবন পণ রেখে সর্ষের তেল যোগাড় করতে লেগে যাই। তেল সিঞ্চনে অচল মেসিন যেমন চালু হয় তেমনি মাধবীও সচল হয়ে ওঠে। আজকাল মুখে হাসি লেগেই আছে। প্রায়ই তাদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ থাকে। ওর বাবা নেই। ওরা দুটি ভাই বোন। ভাই মধ্যপ্রদেশে প্রফেসারী করে। সেখানে পরিবার নিয়ে থাকে। মা মেয়েকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেয়ের কাছে থাকেন। বিয়ে দেবার মত সঙ্গতি নেই বলেই হয়ত আজও মাধবী অনূঢ়া। ভাবি, হায় জ্ঞানদার যুগ কি আজও শেষ হয়নি? এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও কি একটি সর্বরকমে কর্মক্ষম স্মার্ট সুলক্ষণা মেয়ের টাকার অভাবে বিয়ে হবে না? বাড়ী থেকে আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি দেখিয়ে দেব এদেশে এখনো উদার ছেলে আছে। শুধু-হাতে বিয়ে করতে তারা পিছপা নয়।

আজ মাধবীর ওখানে যাবার কথা নয়। তবু মনে হল একবার ঘুরে আসি।

আমায় দেখে মাধবী পরমোৎসাহে চেচিয়ে ওঠে, ওঃ খুব আয়ু আছে দেখছি; এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

এ অধমের এত সৌভাগ্য কেন বলত?

খুব যে অহঙ্কার দেখছি। কি হয়েছে জান? হঠাৎ খবর পেলাম আমার দিদিমা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়েই মা চলে গিয়েছেন। এখন ভাবছি তাড়াতাড়ি মা ফিরতে পারবেন না, খালি বাড়ী রেখে আমিও যেতে পারব না। রাত্রিতে একা একটা বাড়ীতে থাকি কি করে বল? এ সময় কিন্তু আমরা অবলাই, বলে হো. হো করে মাধবী হেসে ওঠে।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, বলি আমাকে ভয় হচ্ছে না?

মাধবীর চোখ চিকমিকিয়ে ওঠে, গালে টোল পড়ে, হাঁ, তোমাকে ভয় না হাতী? বলে ষ্টোভ ধরিয়ে চা বসায়।

আমি বলি, ও সব থাক। এস গল্প করি।

মাধবী হেসে বলে, জান, আমাদের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? আমি একটু চা করে গল্প করতে পারব না?

চা আর বিস্কুট নিয়ে এসে মাধবী বসে। একটা ডিসেই বিস্কুট থাকে।

আমার ভেতরে তখন প্রলয় স্থরু হয়েছে। মাধু বলে মাধবীর একখানা হাত টেনে নিই।

মাধবীর মুখে কালো ছায়া পড়ে, হাতখানা ঠাণ্ডা পাথর। আস্তে করে সরিয়ে নেয়, বলে, নন্দন! তোমাকে কিছুদিন যাবৎই একটা কথা বলব বলব করেও বলা হয়নি। আজ বুঝছি বলা আমার আগেই উচিত ছিল। অসিত রায়ের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সে বছর খানেকের জন্য আমেরিকা যায়, কথা ছিল সেখানে থেকে এলে আমাদের বিয়ে হবে। বছর খানেক সে নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখত, তার পর আর লেখেনি। এক বছরের জায়গায় চার বছর হতে চলল। আমি তার প্রতীক্ষায় আছি। সময় সময় নানা শঙ্কা জাগে তবু তা আমল দিই না, সে আসবেই এ প্রত্যয় নিয়েই আমি বেঁচে আছি। সে জন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে মিশতাম না। নিজেকে নিয়েই নিজে থাকতাম, অবসর সময়ে কবিতা লিখতাম। সে কবিতা কখনো ছাপাবার জন্য পাঠাই নি, কাউকে দেখাই নি ওটা আমার অবসর বিনোদনের হবি। তুমি নিজেই এগিয়ে এলে, আমি যে গণ্ডি টেনে চলতাম তেলের প্রয়োজনে তা মুছে ফেলি। তোমার সঙ্গে মিশে বুঝি এ আমার প্রয়োজন ছিল, একা একা আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। জীবন আমার বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল। তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।

এতক্ষণ যেন আমার মৃত্যুর পরোয়ানা শুনছিলাম। বিবর্ণ মুখে মাথা নীচু করে বলি, আজ চলি।

মাধবী সবিস্ময়ে বলে, সে কি? এখন যাবে মানে? মা না এলে আমাকে একা রেখে যাবে নন্দন? বলে আমার পিঠে হাত রাখে।

পাথর হয়ে যাই, ঘেমে উঠি, না, যাওয়া আমার চলবে না। শীতের রাত্রি সন্ধ্যা হতেই নিস্তব্ধ হয়ে আসে। জানলা বন্ধ। এ বাড়ীটাতে আমি আর মাধু—মাধুকে আমি পছন্দ করি, তবু, তবু তার বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে। হায়রে শিক্ষিত সমাজবদ্ধ ভদ্র মানুষ! বিশ্বামিত্র, পরাশর, মহা মহা তপস্বীরা যা পারেনি আজ তা আমাকে পারতেই হবে। এ মুহূর্তে মনে পড়ে রাবণ রাজার কথা, রাক্ষস হয়েও কত বড় সংযমী, ভদ্র ছিলেন। মাধুকে—আমি আসছি—বলে বাথরুমে ঢুকে মাথায় মুখে জল দিই, কান দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, সমস্ত শরীর গরম। আজ আমার চরম পরীক্ষা। মাধুর মা যদি না ফিরেন সমস্ত রাত্রি থাকতে হবে, চলে যাবার উপায় নেই।

মাধবী বলে, ওকি! এই ঠাণ্ডার ভেতর মাথায় এত জল ঢালছ কেন?

আমি একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলি, হাত মুখ ধুয়ে যুৎ করে বসব। আর এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

মাধবী হেসে বলে, বুঝেছি পেটে আগুন জলছে, আমি চা দিয়ে রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নাও।

মনে মনে বলি, আগুন জলছে ঠিকই, তবে পেটে নয়। মুখে বলি,তা মন্দ নয়, শীতের রাত্রি খিচুরী কর। ইলিশ মাছ ভাজা তো আর খাওয়াতে পারবে না, মধু অভাবে গুড়। নিদেন বেগুন ভাজা,—নাকি বলবে ডাল নেই?

ওঃ খুব সংসার শিখেছ দেখছি, বলে মাধু হাসতে হাসতে রান্না ঘরে চলে যায়।

যথা সময়ে মাধুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খিচুরী খাই। রেঁধেছে ভাল। খাওয়া দাওয়ার পর মাধু বলে, বিছানা পেতে দিই শুয়ে পড়।

আমি বলি, কি দরকার? তার চেয়ে গল্প করেই রাত্রিটা কাটিয়ে দিই।

মাধু আপত্তি করে। না, না, শরীর খারাপ হবে।

এমন সময় কে কড়া নাড়ে। ওর মা মামার সঙ্গে এসে যান। দিদিমা একটু ভাল।

আমাকে দেখে খুসী হন কি বিরক্ত হন ঠিক বুঝলাম না। মুখে বললেন, তুমি এসেছ! মাধুর চিন্তায়ই আমাকে ফিরতে হল।

আমি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করে উঠে দাঁড়াই।

মাধু বলে, হ্যাঁ তোমার আর রাত্রি করে কাজ নেই।

মাধু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে বললে—অনেক কষ্ট করলে।

আমি জবাব দিই, অত বেশী খাওয়ালে কষ্ট একটু হয়ই। দুজনেই হেসে উঠি।

তারপর রাস্তায় আসতে আসতে ভাবি, আজকাল ধর্ম নেই তাই সহধর্মিণী না হলেও চলে। কিন্তু সহমর্মিণী অপরিহার্য। আজ থেকে মাধু আমার বান্ধবী।*

* ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৭২

ভবিতব্য

শীতের সন্ধ্যা। চোখ জ্বালা করছে। সমস্ত কলকাতাটাতেই যেন ঘুঁটে পুড়ছে। ধোঁয়ায় আর কিছু দেখাব সাধ্য নেই, এখন বেলঘোরে লোকেলখানায় একবার চাপতে পারলে নিশ্চিন্ত। বেলঘোরে বাসা নেবার সময়ে অনেকেই বলেছিল, ডেলিপেসেঞ্জার হবার ঝকমারী আছে সত্যি। তা কলকাতা-বাস করার চেয়ে ভাল। একটু হাওয়া আলোর মুখ দেখে বাঁচা যায়। খরচও কলকাতার চেয়ে ঢের কম। কমলার পছন্দ নয়, বেরুতে পারে না। আরে বাপু, কলকাতায় থাকলেই বা তুমি কোন চুলোয় ঘুরতে? যেখানেই যাও পয়সা, আর পয়সা। কমলা বলে, তা হউক, তবু কলকাতার লাইফ আছে। আসল লাইফ যে কোথায় মেয়ে মানুষ ত তা বোঝে না। পয়সা থাকলে বেলঘোরের থেকে কলকাতা কতটুকু?

একখানা গাড়ী আসে, ঠেলেঠুলে ওরই মধ্যে ঢুকে পড়ে অশোক। বাড়ীতে ফিরতে দেরী হলে আজও আর নন্তু সন্তুকে নিয়ে বসা হবে না। পরের ছেলে মানুষ করি অথচ নিজেরটার দিকে নজর দেবার সময় হয় না। ভাবতে ভাবতে গাড়ীর ভিতর আর একটু সেঁদোয়। এলোমেলো চিন্তায় হাঁক-ডাকে ওঠা নামায় কখন সময়টুকু কেটে যায়। দেখা দেয় বেলঘরে ষ্টেশন। অশোক ট্রেন থেকে নেমে কলকাতা থেকে আনা কপি কড়াইশুঁটির থলেটা গুছিয়ে নেয়। থলেতে একটু পাটালী গুড় আছে। যতটা সম্ভব দেখে নিয়েছে, রসের গন্ধ আছে তবে ভেলী গুড় হয়ত কিছু মিশিয়ে থাকবে। আজকাল ত আর খাঁটি জিনিস পাবার উপায় নেই। ওই গুড়টুকু পেয়ে ছেলে-মেয়েরা কতই না খুসী হবে। অশোকের নিজের মুখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওর সামনেই একখানা গাড়ী কঁ্যাচ করে থেমে যায়। চমকে ওঠে অশোক, গাড়ীর দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এ যে স্যুট পরা এক ভ-লোক, তার দিকে চেয়ে হাসছে। কে এ? তাইত হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, অ...। অসিত ততক্ষণে গাড়ীর দরজা খুলে ধরেছে,—তবু যা হ'ক চিনতে পেরেছিস। উঠে আয়।

কোথায়?

যেখানে যাচ্ছিলি।

বাড়ী যাচ্ছিলাম, তুমি কোথায় চলেছ?

আমি এই দিকেই কাজে এসেছিলাম, তুই কি এখানে বাড়ী করেছিস?

আরে না—না, আমি করব বাড়ী? বাসা ভাড়া করে আছি।

তা বেশ করেছিস, শহর ছেড়ে এখানে কেন?

অশোক ভাবে কেন তা অসিত বুঝবে না। অসিতের দিকে চেয়ে দেখে দামী স্যুট পরা, দামী সু পায়ে। আঙ্গুলের আংটির হীরকের দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় কৌলীন্যের। অশোক যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আর একটু পরেই তার বাসা, সেখানে অসিতকে বসাবার মত একটা চেয়ারও নেই। আশ্চর্য, সেই অসিত, এরি মধ্যে কি করে এতটা উন্নতি করে ফেলেছে। ও কি আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে।

অসিত অনর্গল বকে চলেছে,—জানিস সেই যে কেরানীগিরি করছিলাম, যুদ্ধের সময় তা ছেড়ে দিয়ে কণ্ট্রাক্টরী করি। তার পর কণ্ট্রাক্টরী বন্ধ হতেই এই আমেরিকান কোম্পানীতে ঢুকে পড়ি। ওরা দেয় ভালই, এ গাড়ীখানাও আমিই পার্সনাল ব্যবহার করি। বলতে বলতে অশোকের বাড়ীর কাছে মোটর থামে, ওর ছেলে মেয়েরা অবাক। মোটরে করে তাদের বাবা এসেছে।

অশোক ছেলে মেয়ের জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করে, পরিচয় করিয়ে দেয়, এই যে তোদের অসিত কাকু। সামনের ঘরখানাতে একটি মাদুর পেতে অসিতকে বসতে দেয়। ঘরের একপাশে তক্তাপোষে অশোকের বাবা জগদীশ বাবু শুয়ে আছেন।

অসিত বলে, আমি ত একাই বকে চলেছি, এখন তোর কথা বল। তুই কি এখনও সেই স্কুল মাষ্টারী আর কোচিং করেই দিন গুজরাণ করছিস।

তা—কেন? সবাই তোমার কণ্ট্রাক্টরী করে বেড়াবে!

তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না; এ জন্যই কি এত লেখা পড়া শিখেছিলি?

ঘা খেয়ে অশোকও ফোঁস করে ওঠে, কেন, স্কুল মাষ্টারীটা কি এমন বেইজ্জতি কাজ? এর চেয়ে ভাল কাজ আছে নাকি? বলতে পারিস টাকা নেই। তা টাকাই কি দুনিয়ার সব?

হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ, টাকা ছাড়া আজকের দুনিয়া অচল।

তোমরা তাই করে তুলেছ বটে।

তা আমার উপর চটছিস কেন? টাকার প্রয়োজনীয়তা তুই অস্বীকার করতে পারিস?

জগদীশ বাবু বলে ওঠেন,—সবই ভাগ্য। যার যেটুকু ভাগ্য থাকে সে সেটুকুই পায়।

অসিত হেসে ওঠে—ও কথা বলবেন না জ্যাঠামশাই, আজকাল ও কথা একেবারে অচল। আমরা এ কথা মানি না, আমরা বলি, মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে।

বৃদ্ধ একটু স্মিত হাসলেন—তা পুরুষকার বল, আর চেষ্টাই বল, তবু যেন কোথায় একটু গলদ থেকে যায়।

অসিত চেঁচিয়ে ওঠে—না জ্যাঠামশাই, ওগুলি অক্ষমের উক্তি। ভাগ্য, ভগবান—এ সবের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে কুঁড়েরা। চেষ্টায় কিনা হয়?

চেষ্টায় অনেক কিছু হয় মানি। তবু অদৃষ্টে না থাকলে হওয়া কঠিন।

এর পর আর অসিতের বসার ধৈর্য থাকে না।

অশোক বাধা দেয়—সে কি, চা খেয়ে যাও।

'চা'? স্কুল মাষ্টারের বাড়ীতে চা?

—কেন নয়? স্কুল মাষ্টারকে তোরা মানুষ বলেই মনে করিস না?

—তা নয়, স্কুল মাষ্টারকে আমরা সুপারম্যান—যাকে বলে মহামানব—তাই বলে গণ্য করি। তাই এ সব অখাদ্য জিনিস তারা স্পর্শ করে না বলেই মনে করি।

এ সময় কমলা চা আর হালুয়া নিয়ে আসে।

অসিত বলে—বাঃ! বৌদি আমার নামেও কমলা, কাজেও তাই। কিন্তু ভাই আজ আর গল্প করার সময় নেই, আর একদিন আসব।—বলে চা জলখাবার খেয়ে অসিত বিদায় নেয়।

গতানুগতিক দিন চলতে থাকে। ঝড়ের মত অসিত এসে এক আবর্তের সৃষ্টি করে যায়। অশোকের দরিদ্রতা অশোককে সতত ভেংচাতে থাকে। তোষকের অর্দ্ধেক তুলো খুলে পড়ছে, খোকার এ শীতে একটা গরম জামা না করলে নয়। শ্যামলীর একখানা শাড়ী চাই। সন্তুর বড্ড কাশি হয়েছে; একটা সিরাপ চাই-ই। চাই-ই, কিন্তু আসার কোন পথ নেই। উদয় আর অস্ত—রাত্রিরও কিছু অংশ পরিশ্রম করেও পেটের ভাত-ই যোগাড় হয়ে ওঠেনা। উপরন্তু কাজ কি করে হবে? কত সখ ছিল তার লেখার, সময় কোথায়? রুটি জোগাতেই দিন খতম।

আবার একদিন দেখা দেয় অসিত নলেন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে।

অশোক বলে—তবু ভাল মনে পড়ল। আমি ভাবলাম ডুব মেরেছিস।

আমি-ই ত তবু এলাম, তুই তো এক দিনও গেলিনে।

সময় কোথায় ?

হ্যাঁ, কাজ ত শুধু তুই করিস। বৌদি একবার আসুন দেখি, অশোককে বেশ করে মিষ্টি খাইয়ে দেখুন ওর কথা একটু মিষ্টি করা যায় কিনা।

কমলা বলে—বেশ, আমরা মিষ্টি খেয়ে মিষ্টি কথা বলব আর আপনাকে কিছু ঝাল খাইয়ে দেব।

অসিত হেসে ওঠে—এই চাই, দেখেছিস বৌদি আমায় কেমন চিনে ফেলেছে।

হ্যাঁরে, এইত তোর বড় মেয়ে ?

হ্যাঁ।

কি পড়ছে ? মুখখানা কিন্তু ভারী—নাম কি মা তোমার ?

শ্যামলা মেয়ে—তাই ওর নাম শ্যামলী। ম্যাট্রিক পাশ করেছে, বিয়ের চেষ্টায় আছি।

বলিস কী ? ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে বিয়ে দিবি ? আমার নন্দা এবার বি-এ দেবে। তারপর তাকে লণ্ডন পাঠাব।

অশোক বলে—মানিয়ে চলতে শেখাটাই বড় শেখা মেয়েদের। পরের বাড়ী গিয়ে ঘর করতে হয়। সেখানে পরকে আপন করতে যে ত্যাগ ক্ষমা সহিষ্ণুতার দরকার সেটুকু তারা ঠিক মত পেয়েছে কিনা এটা লক্ষ্য রাখা দরকার। লণ্ডন যাবে নন্দা, খুবই ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষা কি শুধু লণ্ডনেই আছে ? বিদ্যাসাগরের জননী কোন লণ্ডন থেকে পাশ করে এসেছিলেন ?

আরে থাম বাপু, তুই যে আমাকেই ছাত্র ঠাউরেছিস। শিক্ষকের এই এক রোগ। কেবল উপদেশ দেওয়া !

জগদীশবাবু বলে ওঠেন—মেয়েদের আসল কাজ সুশ্রী ভাবে সংসার করতে পারা, তার উপর যা হয় সেটা উপরন্তু। শ্যামলী দিদি আমার শিক্ষা ভালই পেয়েছে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে—এতো ভবিতব্য। এর উপর মানুষের হাত কোথায় ?

জ্যাঠামশাই ! বিজ্ঞান আজ ভবিতব্যকে হারিয়েছে। জন্মকে ঠেকিয়েছে। মৃত্যুকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রোধ করেছে। আর বিয়ে ! বিয়ে তো আজ কোন সমস্যাই নয়। যে কোন বয়সে, যে কোন জাতে অবসর সময়ে করলেই হ'ল। না করলেও বিশেষ ক্ষোভ নেই, তা কি ছেলের বেলা, কি মেয়ের বেলা।

জগদীশবাবু বিড় বিড় করে বলতে থাকেন—বিজ্ঞান অনেক কিছু করেছে ঠিকই, তবুও নিয়তি আছেই। এরা ভাবে সবই বুঝি ইচ্ছা করলেই করা যায়,

ওয়ে তা যায় না। জাতই কি উঠেছে? এক জাত গিয়ে আরেক জাতের উত্থান হচ্ছে। চাটার্জি, চক্রবর্তী, বোস-এর ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। তেমন আবার ইঞ্জিনিয়ার মাষ্টারে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

অসিত সমর্থন করে—সে কথা সত্যি। টাকা না হলে মানুষের কোন মূল্যই নেই। আমি একটি ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, এবার নন্দাকেও পাঠাব। ওরা তৈরী হয়ে এলে ওদের বিয়ে দেব।

তোমার টাকা আছে তাই তুমি খুসীমত জামাই তৈরী করে নিতে পারছ। আমার তো তা হবার জো নেই।

আসল কথা কি জানিস, আকাঙ্খাটা বড় রাখতে হয়। তারপর সেই ভাবেই সব গড়ে ওঠে। আমি ইচ্ছা করেই কোন বড়লোকের তৈরি ছেলে মনোনীত করিনি। একে আমি পড়িয়ে আনছি, তাই আমার মেয়ের উপর এ কখনও খারাপ ব্যবহার করবে না, তা ছাড়া আমার প্রতিও যথেষ্ট টান থাকবে। তাই না?

অশোক কেমন জানি চুপসে যায়। শুষ্ক মুখে বলে—তোমার আজ অনেক কিছুই হাতের নাগালে।

অসিত উঠতে গেলে কমলা বাধা দেয়—না খেয়ে কোথায় যাবেন?

অশোক বলে—তোমার সাহস তো কম নয়, কমলা! অসিতকে কি তুমি শাক-শুক্ত দিয়ে ভাত খাওয়াবে?

অসিত ব্যস্ত হয়—কী বলছিস! দিন বৌদি, আমায় খেতে দিন।

কমলা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে জল ছিটিয়ে জায়গা মুছে নেয়, তারপর পরিপাটি করে ভাত, শাক, ভাজা, ডাল, মাছ, টক, তরকারী দিয়ে খেতে দেয়।

শ্যামলী একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া করে, কমলাও কাছে বসে। এটা খান সেটা খান বলে, শেষে একটু দুধ দেয়।

অসিত পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে নেয়, বলে—অনেক দিন পরে মনে হ'ল যেন মার হাতে খেলাম, মা আমায় এমনি যত্ন করে খাওয়াতেন।

তারপর আঁচিয়ে আসতেই মশলা সংযুক্ত পান, তোষকের উপর পাটি পেতে ভিজে গামছায় মুছে বিশ্রাম করতে দেয়। একটা কাপে একটু জলে কয়েকটা বেলফুল ভাসে। তার মিষ্টি সৌরভে সমস্ত ঘরখানা ভরে ওঠে।

অসিত বলে—তুই যে রাজাধিরাজ হয়ে আছিস।

তারও বেশী—

সত্যিই তাই, কি যত্নটাই পাচ্ছিস।

আর আমাদের আছে কী ? আগে ছিলাম আমরা মধ্যবিত্ত ; এখন হয়েছি শূন্যবিত্ত। এই শূন্যতাকে ঢাকতে গিয়ে আমরা প্রাণান্ত হচ্ছি। এদের এই স্নেহ যত্নটুকুই তো আমাদের একমাত্র সম্বল।

এ সামান্য জিনিস নয় ভাই। এ মহার্ঘ।—বলে অসিত বিদায় নেয়।

দু'একদিন অসিত গাড়ী পাঠিয়ে কমলাদের নিয়ে গেছে ; সে দিনও গাড়ী পাঠিয়েছে। কমলাকে নিয়ে অশোক যেতেই অসিত বলে—ওরে দিলীপ এসেছে. এখন আর নন্দাকে পাঠান হ'ল না। তা না হোক বিয়ের পর দু'জনে যাবে। নন্দাকে বললাম চল, বম্বে থেকে ওকে নিয়ে আসি। নন্দা কি জবাব দিলে জানিস ? দিলীপবাবু আসছে তা আমরা বোম্বে যাব কেন ? শোন কথা। আমরা যাব না তো কে যাবে ! আসল কথা কি জানিস, মেয়েদের সেই চিরন্তন লজ্জা।

দিলীপ এসেই একটা ভাল চান্স পেয়েছে—ষ্টার্ট পাঁচশ' তারপর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তাই ভাবছি আর দেরী করে লাভ কি ? শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

কমলা বলে—সে তো ভাল কথা।

কথা তো ভাল, কিন্তু নন্দাটাই গোলমাল করছে। বলে, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করব না। তুমি আমায় একটা কাজ দাও। শোন মেয়ের কথা! তুই চাকরি করতে যাবি কোন দুঃখে ? তোর বাবাকে কি এতই অক্ষম মনে করিস ! আমায় কী বলে জানিস, বলে ; দিলীপ বাবুকে পড়িয়ে এনেছ বেশ ভাল কথা। তাকে জামাই করলে আর পরের উপকার কি করলে ? মেয়েটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন পরে দিলীপ এল, ওর সঙ্গে গল্প করা, বেড়ানো এসব মোটেও করে না। এ সব লেখাপড়া-জানা মেয়েদেব এতটা লজ্জাও বেমানান লাগে। তাই তোদের আসতে বলেছি, তোরা যদি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাতে পারিস।

নন্দা কোথায় ?

এই ত কোথায় যেন গেল।

এ জন্য চিন্তা করো না। বিয়ের আগে বেশী মেলামেশার দরকার কি ? আমার এটা ভাল লাগে না। তুমি ব্যবস্থা করে ফেল।

ওরা জলযোগ করে বিদায় নেয়।

ক'দিন আর অসিতের পাত্তা নেই।

শনিবার স্কুল থেকে বেরিয়েই দেখে, অসিত গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অসিতের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে অশোক—একী চেহারা ! চুলগুলি অবিন্যস্ত রুক্ষ, চোখের কোনে কালি, বয়েস যেন কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে। অশোক বলে ওঠে—একি, তোর কি অসুখ করেছে ?

অসিত হাসির প্রহসন করে। —অসুখ ? হ্যাঁ, আমার ভীষণ অসুখ। এমন অসুখ যে হতে পারে তা কখনো কল্পনাও করিনি। বলে আউটরাম ঘাটের কাছে গাড়ী রেখে ওরা গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে জেটিতে গঙ্গার উপর বসে।

অশোক তাড়াতাড়ি অসিতের গায়ে হাত দেয়।

ওরে ! অসুখ শরীরে নয়, মনে। নন্দা চিরকালের জন্য আমার সুখ হরণ করে নিয়েছে।

নন্দা ! নন্দা কি এমন করতে পারে যার জন্য তুমি এত দুঃখিত হয়েছ, এমন মুষড়ে পড়ছ ? না হয় বিয়েটা কিছুদিন পরেই করবে।

ওরে থাম, থাম—নন্দা আমার শ্রাদ্ধ করে ফেলেছে ; আর কিছু বাকি রাখেনি। গোপনে এক নীচু বংশের একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করেছে। ভেবেছিল চাকুরী নিয়ে তারপর আমাদের জানাবে। দিলীপের সঙ্গে বিয়ে দেবার তাড়া দেখে আর গোপন রাখতে পারেনি। উঃ অশোক। কী করে নন্দা এমন কাজ করতে পারে ? ওর জন্য যে আমি হীরে যোগাড় করে রেখেছিলাম, কোন দুঃখে ও কাঁচ বেছে নিলে ?

ছেলেটি কি করে ?

সে কথা আর আমায় জিজ্ঞেস করিস না। তার পরিচয় কোন মতেই লোকের কাছে দেবার নয়। ম্যাট্রিক পাশ, সিনেমার ক্যামেরাম্যান। আমি যখন ওর কুৎসিত রুচির জন্য গালি দি তখন কী বলে জানিস ? ডিগ্রী আর চাকুরীই কি মানুষের সব পরিচয় ? বাইরে থেকে মানুষের কি বিচার হয় ?

আমি খুব ধমকে উঠেছি, বলেছি—বুঝলাম আমি ওর দেবত্ব দেখতে পারছিনে। তুই বল কী দেখেছিস ওর ভেতর, কিসের জন্য তুই দিলীপের মত ছেলে ফেলে বিয়ে করতে গেলি ওকে ?

সে তুমি বুঝবে না বাবা। আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ওই বিরাট সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তার বদলে কি পেয়েছেন সে কি তোমরা বুঝবে ?

আমি বলেছি, তোর তত্ত্ব কথা আর শুনতে চাইনে। এখন আমি দিলীপকে কী বলি ?

নন্দা তার কী জবাব দিলে জানিস? দিলীপবাবু খুসীই হবেন, কৃতজ্ঞতার ফাঁস গলায় পরে তাকে সারাজীবন ঘুরতে হবে না। তিনি তার পছন্দ মত মেয়ে বিয়ে করতে পারবেন।

অশোক! এ শোক যে আমি সইতে পারছি না।

সময়ে সবই সইবে ভাই। এখন কতগুলি দিন অসহনীয়ই মনে হবে। কী করবে? যেটার কিছু করণীয় নেই সেটা সহ্য না করে আর উপায় কী?

সে দিন বড় কষ্টে অসিতকে বাড়ী নিয়ে আসে অশোক। তারপর অনেক দিনই স্কুলে যাবার সময় শ্যামলীকে অসিতের বাসায় দিয়ে যায়। যদি এদের দুঃখ একটুও লাঘব হয়।

অশোক যখনই যায় সখেদে বলতে থাকে নন্দার কথা, নন্দার বিয়েতে কি যৌতুক দেবে বলে রেখেছিল। বরের জন্য কি কেনা হয়েছিল। আর আক্ষেপ দিলীপের জন্য, ওর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। দিলীপ অসিতের জন্য এটা সেটা নিয়ে আসে। কিন্তু বিয়ে আর কিছুতেই করতে রাজী হয় না।

অসিত বলে—আমি যে অপরাধী হয়ে রইলাম অশোক!

তবু সময় সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোয়। এখন অন্য কথাও আলোচনা করে। নন্দা সেই যে গিয়েছে আর ফেরেনি। অসিতও কোন খোঁজ খবর নেয় নি। অসিতের গৃহিণী চুপে চুপে খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছে। দু'বছর হয়ে গেল —কত দিন আর রাগ থাকে? তাছাড়া মেয়েকে তো আর সত্য ফেলে দেওয়া যায় না! কিন্তু সে কথা অসিতকে বলবে কে? মায়ের মন তাই হাহাকার করে কেঁদে মরে।

অশোক গিয়েছিল শ্যামলীর জন্য সম্বন্ধের খোঁজে। পাত্রপক্ষের বিরাট দাবী মেটাবার সাধ্য অশোকের নেই। শ্যামলী অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হাতে বাবাকে হাওয়া করছে, জগদীশ বাবু ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—ওরে যেখানে আমার দিদির বর ভগবান ঠিক করে রেখেছেন, সেখানে গেলে তো কথা বলবে। তোরা ব্যস্ত হোসনে, সময় হলেই হবে।

অশোক বলে ওঠে—তোমার দিদির বর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। যে ·· ····· ·· ······

অশোক আছিস!—ঝড়ের বেগে অসিত ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে—দিলীপ রাজী হয়েছে।

আমি বলেছিলাম, দিলীপ, বাবা তুমি আমায় আর অপরাধী করে রেখোনা, বিয়ে কর।

বিয়ে করলে আপনি সুখী হবেন!—বললে আমায়।

হব না? নিশ্চয় হব। আমার মাথার উপর থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে যাবে।

বেশ, তবে ঠিক করুন।

আমি আর কোথা থেকে করব বাবা? সে সৌভাগ্য আমার হ'ল কৈ?

আপনার জানা কোন মেয়ে দেখুন।

আমার তোমার উপযুক্ত কোন মেয়ে জানা নেই।

কী রকম?

শিক্ষিতা বলা চলে এমন মেয়ে ত দেখছিনে।

ডিগ্রির মোহ আমার নেই, একটি গৃহস্থালীর উপযোগী মেয়েই আমায় দেখে দিন। প্রয়োজন মত তাকে আমি তৈরী করে নিতে পারব।

তবু আমার মাথায় ধরেনা, আমি চার দিক হাতড়াতে থাকি, তোর বৌদিই আমায় বাঁচালে, বললে, শ্যামলীকে তুমি নাও বাবা, ও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, ও তোমায় নিশ্চয় সুখী করবে।

দিলীপ জবাব দেয়, আপনাদের আদেশ আমি অমান্য করব না।

বৌদিকে ডাক, শাঁখ বাজা। মিষ্টি আন। আঃ শ্যামলী মা আমার এত ভাগ্যবতী। বিয়ের যৌতুক কিন্তু সব আমি দেব, তা আগেই তোকে বলে রাখছি।

জগদীশ বাবু বলে ওঠেন—

হরি নারায়ণ!

'তুমি কর তোমার লীলা
আমার প্রাণে লাগে ডর।'

* প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

নরদেব

ব্রহ্মা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে নিমীলিত নেত্রে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলেন। ধপাস করে শব্দ হওয়ায় চার জোড়া চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন চিত্রগুপ্ত তার বিরাট খাতাখানা ঐ রকম শব্দ করে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ রাগে থমথম করছে।

ব্রহ্মা চারমুখে হাই তুলে জিজ্ঞেস করেন। কি হে! অসময়ে কেন?

আমি আর পারছিনে। এবার আপনি আর কাউকে এই হিসেবের বোঝা চাপান, উঃ বাপ!

কি হল?

হবে আর কী? মানুষের পাপ পুণ্যের হিসাব রাখতে হয় আমাকে। এখন নাকি কেউ পাপ করে না। ধর্ম বলে কিছু নেই। কালীবাড়ী যায় ডালি দিতে নয়—দেখতে। হিমালয়ে যায় তপস্যা করতে নয়—বেড়াতে!

চুরি অধর্ম নয়, অভাব মিটানো। হত্যা পাপ নয়—বাঁচতে হলে করতেই হবে। সে যাক! গণতন্ত্রের যুগ। কিছু বলতে গেলে জনতা মারতে আসবে। এমন অরাজকতা কী করে চলতে পারে আপনি বলুন! যার আয়ু বিশ বছর সে বাঁচে পঞ্চাশ বছর। ফলে আরও ত্রিশ বছর আমায় তার পেছনে লেগে থাকতে হচ্ছে। তাও কি এক জায়গায়? আজ কলকাতায় কাল দিল্লী, পরশু বোম্বে। আমাকে হয়রান করে মারে। মর্তে এখন কত আন্দোলন। আট ঘণ্টার ডিউটি ছ'ঘণ্টা, সপ্তাহে দুদিন ছুটি দাও—হেন, তেন। আর স্বর্গে আমরা কী সুখেই আছি। একটা শনি রবিবার পর্যন্ত ছাড়ান নেই! সিনেমা দেখি না কত যুগ!

প্রকৃতি এসে কেঁদে পড়ে। দেখুন পিতামহ আমার হাল দেখুন।

চিত্রগুপ্ত বিস্মিত সুরে বলে, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? গরবিণী রূপসী। নব নব ঋতুতে তোমার চিত্তহারিণী নব নব সাজ। আর আজ দেখছি

কনক বরণ কালো, কেশভার বিরল, শরীর শীর্ণা, প্রফুল্ল আনন বিষাদিত। কী করে এমন বিপর্যয় হল ?

লজ্জার কথা কি বলব ? ক্ষুদ্র মানুষ, তুচ্ছ মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাকে। মানুষের কাছে আজ আমি পরাজিতা। আমার সৃষ্টির উপর করছে অজস্র কারিগরি। মরুভূমিতে গড়ছে সহর। নদীর উদ্দাম গতি সংহত। মানুষের খেয়ালে তাকে চলতে হয়। নিজের খুসি মত বয়ে যাবার সাধ্য তার নেই। বন্ধ্যা জমিকে করছে রত্ন প্রসবিনী। বৈদ্যুতিক শক্তি আমায় হৃদ্‌কম্প ধরিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রদানব পাহাড় কেটে করছে রাস্তা ঘাট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক একটি বাড়ীতে আমার ক্ষমতা করছে ধূলিসাৎ। আজ আর আমি দেবী নই। মানুষের হাতের পুতুল মাত্র। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই নেই। অ্যাটম্‌বোমের এক্সপেরিমেণ্টে আমার শরীরের এই হাল হয়েছে। এখন শীত ঋতুতে শীত নেই, গ্রীষ্মে গ্রীষ্ম নেই ; ধুকতে ধুকতে বেঁচে আছি।

ব্রহ্মা চারটি সিগারেট ধরিয়ে বলেন—ব্যস্ত হয়ো না। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। ক্ষুদ্র মানুষকে শায়েস্তা করতে কত সময় লাগবে ?

ক্ষুদ্র মানুষ নয় পিতামহ—বলতে বলতে নিয়তি এসে ঘরে ঢোকে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন ছিল আমার হাতের মুঠোয়। কথায় বলে গরীবের ঘরে মা ষষ্ঠির কৃপা বেশী। বছরের এ মাথায় ও মাথায় বাচ্চা দিয়ে সৃষ্টির কেরামতি দেখিয়েছি—ওরা যত হায় হায় করেছে আমরা তত খেলার রঙ্গে মেতে উঠেছি। আজ একটি ছেলে হয়েছে কি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে বসে আছে কেমন খোদার উপর খোদকারী। বিয়ের তো কোন ঠিকানাই নেই। যার সঙ্গে গ্রন্থি বেঁধে দিলাম যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়ও, কালে আবার বিচ্ছেদ করে আরেকজনের গলায় মালা দেবে। রইল না আমার কোন নিয়ম ! কোন বন্ধন ! মৃত্যুর বেলায়ও তাই নিমোনিয়া দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তারিখ গুণছি। শেষের দিন গিয়ে দেখি ভাত পথ্য করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাজরোগ দিয়ে ভাবি এবার শিবের অসাধ্য ব্যাধি—এবার ওনার রেহাই নেই। কাশি না শুনে চেয়ে দেখি বিয়ে থা করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করছে। যার আয়ু লেখা পঁচিশ বছর, সে বাঁচছে পঞ্চাশ বছর ; যার আয়ু ষাট বছর, সে অ্যাক্‌সিডেণ্টে বিশ বছরে মরছে। কী অরাজকতা বলুন তো ? এই দেবীত্বের কোন মানে হয় ?

ব্রহ্মা নড়ে চড়ে বলেন—তাইত হে। আচ্ছা চিত্রগুপ্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে একবার ডাক তো দেখি। তিনি কী বলেন। এতো বেশ গোলমেলে ব্যাপার দেখছি।

চিত্রগুপ্ত অপ্রসন্ন মুখে জবাব দেয়, বিপদে ফেললেন। তাঁকে আবার কোথায় পাবো? হয়তো ভাং খেয়ে পড়ে আছে। নয়ত শ্মশানে ভূত প্রেত নিয়ে নৃত্য করছে। আর ঘরে থাকবেই বা কি? গঙ্গা, চণ্ডী, কালী এদের ঝগড়ায় বাড়ীতে তিষ্টানো দায়। সাধে কি আর শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়; ভাং খেয়ে অচৈতন্য হয়? মর্তের মানুষরা খুবই বুদ্ধিমান। এসব দেখে শুনেই তারা আইন করেছে কেউ এক স্ত্রী থাকতে আর একটি বিয়ে করতে পারে না।

কাজের কথা শোন, একেবারে নারায়ণকেও ডেকে নিয়ে এসো, তাঁকে ছাড়া চলবে না।

নারায়ণ ঠাকুরকে ডাকা সহজ। লক্ষ্মী ঠাকরুন ভারী সেয়ানা। আগে তো যে গৃহে সরস্বতী যেতেন তিনি বড় একটা সেদিক মাড়াতেন না। এখন দু'বোন জোড়ে জোড়েই ঘোরেন। লক্ষ্মীর কৃপা না থাকলে আজকাল সরস্বতীর কৃপা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ভাবটা ঐ বাইরেই। ঘরে তিনি স্বামীর সঙ্গে হাসি গল্প করেন। স্বামীর পা দুখানা কোলে নিয়েই বসে থাকেন—যেন সপত্নী কাছেও ঘেঁসতে না পারেন।

ব্রহ্মা হুঙ্কার ছাড়েন, যা বলছি শোন। তুমি বড় বেশী বক্ বক্ কর। দেবরাজকেও একবার খবর দিও।

ভ্রূ কুঁচকে চিত্রগুপ্ত বলে, হ্যাঁ কথা বললেই বক্‌বক্ করা হয়। আমার কথা বলার দরকার কি? আমি শুধু রাত দিন ঘাড় গুঁজে হিসেব নিয়েই বসে থাকি। সবাই যেমন খুসি চলবে। বললেই নিন্দে, এই ইন্দ্রদেব শচীরাণীর চোখে ধুলো দিয়ে কারো না কারো পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনিতেই তো শ্রেষ্ঠ রূপসী মেনকা রম্ভা উর্বশীরা রয়েছেন, তবু কি চুলবুলুনি যায়? তাঁর অসুবিধে কী, মরতে তো মরল সেই অহল্যাই।

ব্রহ্মা আট-চোখ আরক্ত করে ধমক দেন, তুমি যাবে না কি? বড় বাচাল হয়ে গিয়েছ।

অসন্তুষ্ট মুখে চিত্রগুপ্ত জবাব দেয়। আমি কথা বললেই যখন দোষ তখন দরকার কি আমার কথা বলে। হাজার হলেও দেবতা তো। রাত

দিন কলম পিষতে পিষতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার দাখিল। আজ কালের পেনগুলিও হয়েছে তেমন, দুদিন লিখলেই নিব খারাপ। বললেই আপনারা বিরক্ত। তোমাকে আর পেন দিয়ে পারা যায় না! স্বর্গে তো আর কালোবাজার নেই যে, আমি কালোবাজারে বিক্রী করে দেই।—বলেই চিত্রগুপ্ত বেরিয়ে পড়ে।

নারায়ণ আসেন, আবেশ বিহ্বল নয়ন, তখনো সুখস্মৃতি বিজড়িত; হাতজোড় করে বলেন, কি প্রভু! তলব কেন?

ব্রহ্মা জবাব দেন, সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এইতো দেবাদিদেবও এসে গেছেন।

মহাদেবকে দেখে নিয়তি ও প্রকৃতি অধোবদন হয়। মহাদেবের ব্যাঘ্র চর্ম খানা বড়ই খাটো! হয়ত কণ্ট্রোলের বাজারে কেনা। পর মুহূর্তেই আসেন সহস্রলোচন—রাজকীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। অন্যান্য দেবতারাও এসে যান।

সব শুনে ইন্দ্র বলেন, তাইতো এরা অনেক এগিয়েছে। প্রতিকার করা দরকার।

আশুতোষ হাসেন। আরে দেবতাকে খর্ব করবে মানুষ—তাও কখনো হয়? এরা ভূত নয়, প্রেত নয়, রাক্ষস দানব কোনটাই নয়। কোমল হৃদয় মানুষ, কতটুকু শক্তি ধরে?

চন্দ্র আর্তস্বরে বলে ওঠে, এরা মহাশক্তি ধরে। ক্ষমতা এদের অসীম। এর ভেতর আমার কাছে পাঠিয়েছে তাদের গ্রহ। আর দু'দিন পরে তারা এসে করবে আমার রাজত্বে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এতদিন আমি ছিলাম অদ্বিতীয়। আজ মানুষ আরো কয়েকটি কৃত্রিম চাঁদ সৃষ্টি করেছে। তার পরে হয়ত তারাই হবে আসল। আমি স্থাবর বলে এক পাশে কোনঠাসা হব। বুঝুন একবার আমার বিপদ!

সহস্রলোচন বলেন, বিপদ সত্যি। এতদিন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে এক—কামনা নিয়ে করেছে তপস্যা। সেখানে বহু ভাবে তাকে নিরস্ত করা গিয়েছে। অসুর দৈত্য দানব যারাই মাথা তুলতে চেয়েছে তাদের ধূলিসাৎ করতে সময় লাগেনি। কিন্তু এবারে কোটি কোটি মানুষের সমবেত চেষ্টা। এ সাধনা বিফল করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঐক্যের বল অসীম। এখানে মেনকা রম্ভা বিফল হতে বাধ্য। দেখা যাক নারায়ণ কি বলেন।

এদিকে গরুড়কে দেখে দেবাদিদেবের সর্পকুল পালিয়ে যায়। প্রকৃতি উঃ বাবা বলে লাফিয়ে ইন্দ্রের ঘাড়ে পড়ে! নিয়তি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

মহাদেব আরক্ত নেত্রে নারায়ণের দিকে তাকান। নারায়ণ তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলেন, প্রভু আমি গরুড়কে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। সকলেই নারায়ণের কথা সমর্থন করেন। নিয়তির মাথায় জল বাতাস দিতে সে উঠে বসে। প্রকৃতি লজ্জায় আর ইন্দ্রের দিকে চাইতে পারে না।

ইন্দ্র বলে—সকটু মাইণ্ডেড মেয়েরা ভীতিজনক কিছু দেখলে এমনি হয়। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আবার সভার কাজ আরম্ভ হোক।

চিত্রগুপ্ত বলতে থাকে, ভেবে দেখুন সেই আদি মানব কী অসহায় জীব, প্রকৃতির হাতের পুতুল! তারপর ধাপে ধাপে সে আজ কোথায় উঠেছে। তার বুদ্ধিবৃত্তিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় সে আজ অনেক কিছুই আয়ত্তে এনেছে। নিজেকে সুরক্ষিত করার ক্ষমতা তার এসে গেছে। সে বোবার মুখে ভাষা ফুটিয়েছে, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছে, পঙ্গুকে করেছে সুঠাম। শুধু কি তাই? জন্ম নিয়ন্ত্রিত মৃত্যুকে দীর্ঘ দিন রোধ করেছে! করেছে কুৎসিতাকে সুন্দর; কাটা ঠোঁট জুড়ে দিচ্ছে, ভাঙ্গা হাত-পা জুড়ছে। নিজেদের খুসিমত বিকৃত অংশ শরীর থেকে কেটে বাদ দিয়ে, প্রয়োজন মত নতুন করে জুড়ে নিচ্ছে, আজ মানুষই কারিগর।

ইন্দ্র বলেন, তাতে আমাদের ভয় পাবার কি আছে? ওরা তো আর স্বর্গে আসছে না। দেবত্বও চাইছে না।

চন্দ্র ভীত কণ্ঠে বলে ওঠেন—নিশ্চিন্ত হবেন না! দেবত্ব চাইবে না কে বলল? ক্ষমতা ওদের যেমন বাড়ছে—আকাশে উড়ছে, দেবাদিদেবের পীঠস্থান কাঞ্চনজঙ্ঘায় পর্যন্ত হানা দিয়েছে। মায় চন্দ্রলোকে হানা দিচ্ছে, কি হাল যে আমায় করবে ভেবেই পাচ্ছি না। মর্তে আবার আসল জিনিস বড়ই লজ্জার। সেখানে নকলের সম্মান বেশী। প্রত্যেক হাই ফ্যামেলিতেই কিছু নকল ফুল নকল লতাপাতা ঘরে রাখে। আসল আজ উপেক্ষিত। আসল গাছপালা দেখলেই কেটে ফেলে। আপনারা বলছেন ভয় নেই!

ব্রহ্মা বলেন—আর অপেক্ষা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। শ্রীবিষ্ণু এবার কোন অবতার হয়ে আমাদের রক্ষা করবেন দেব?

নারায়ণ কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে চুপ করে থেকে বলেন—এবার আমার অবতার জন্ম নেওয়া প্রয়োজন হবে না। মানুষের রিপু লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রবল হয়েই মানুষকে ধ্বংস করবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধ্য নেই মানুষকে এই লোভ হতে বাঁচায়। সমস্ত মঙ্গলচিন্তা সব শুভবুদ্ধি তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সে প্রতিবেশীর কবর খুঁড়তেই ব্যস্ত। জানে না ওই কবরেই হবে তার নিজের সমাধি। এই গগনস্পর্শী লোভই করবে তার সর্বনাশ। কেবল অপরের রাজ্যের দিকে লোভ। আরে বাপু তোর রাজত্বের সম্পদই তুই ভোগ করে ফুরুতে পারিস নে। কেন এই দুর্লোভ!

তাই বলছি ঘাবড়াবার কিছু নেই। যুগযুগান্তরের সাধনার ফল এটমের দ্বারা সে তার এই বিরাট কীর্তি নিশ্চিহ্ন করে প্রকৃতির ভার মুক্ত করবে। সে দিন আর থাকবে না একটিও প্রাণী। পৃথিবীর রূপ নেবে এক মহা-শ্মশানে এবং তা করবে এই ক্ষুদ্র মানুষ!—যারা ইচ্ছা করলে অমর হতে পারত, দেবত্ব পেতে পারত!

সভার কাজ শেষ হয়। দেবতাদেরও যেন বিষণ্ণ দেখায়। নরের ধ্বংস বুঝি তারাও চায় না। ক্রমে সৃষ্টিনাশ। মানুষ না থাকলে তারাই বা থাকবেন কি নিয়ে? *

* লোকসেবক
রবিবার—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, ২১শে মাঘ ১৩৬৮

নবসংকীর্তন

সুন্দর সুশ্রী ঝকঝকে নূতন যুগকে আমি ভালবাসি। এখানে অবলা সবলা হয়েছে। অবলা অবলীলাক্রমে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়। পাইলট, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, গভর্ণর হয়ে পুরুষের পৌরুষ খর্ব করে। মহারাণীর সঙ্গে মেথরাণী প্রতিযোগিতায় নামে, দু-রাণীতে ভেদ ঘুচে যায়। মণ্ডল চ্যাটার্জি বিয়ে হয়ে মানুষের জাতিভেদ দূর হয়। টাকায় একটা জাতি তৈরী হয়। ধনী আর দরিদ্র। ধনী কখনো হরিজন হয় না। বিশ্বভ্রাতৃত্বের রাখী নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। বিশ্বপ্রেমিক বলতে পারেন, শুধু নিজের ভায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়। তা যাক্। ছোট জিনিস সব সময় বড় করে দেখতে গেলে সংসার চলে না।

অনেকেই বলেন বটে পুরানোই ভাল। পুরনো চাল ভাত বাড়ে, পুরনো তেঁতুল কাশি সারায়। পুরনো ঘি মহোপকারী। পুরনো স্ত্রী রংচটা কর্ণপটাহ-বিদারী খন্‌খনে আওয়াজ হলেও সংসারের পক্ষে নিরাপদ।

মাথায় থাক এমন উপকার। বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে নূতন অতুলনীয়। নূতন চালের ভাতের স্বাদের কথা একবার ভাবুন। নূতন তেঁতুল? সে তো ভাবতেই জিভে জল এসে যায়। নূতন ঘি গন্ধে, স্বাদে ম-ম করে। আর নূতন স্ত্রী—ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। এর বর্ণনা দিতে গেলে রবি ঠাকুরের কলমও বুঝি হার মানতো। নূতন স্ত্রীর জন্য স্বামীরা এক কথায় প্রাণ দিতে পারেন। কিন্তু পুরনো স্ত্রীর জন্য নড়ে বসতেও বিরক্তি।

আগে পুরনো ডাক্তারে মানুষের কি গভীর আস্থা ছিল। তার অভিজ্ঞতার সম্মানই আলাদা।

আজ কিন্তু নূতন ডাক্তারই লোকে চিকিৎসার ব্যাপারে বেশী পছন্দ করে। কেননা নূতন ডাক্তার নূতন জার্নাল সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবহাল।

আগে কথা ছিল তিন ঠ্যাঙ্গা, 'তিন মাথা যার বুদ্ধি নিও তার'। তে মাথা আজ স্থবির বলে গণ্য। পাকা চুলের সৌন্দর্য আজ কেউ দেখে না। সম্মানও কেউ দেয় না। তাই বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা সযত্নে পাকাচুল লুকিয়ে রাখেন। কলপ দেন। বয়স হয়েছে এটা প্রাণপণে চেপে যেতে চান।

নূতনের কি মনোলোভা রূপ! যে শাড়ীখানা কাচ্‌লে রং উঠে যাবে তাও নূতন সময়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামান্য গিল্‌টির গহনাও কি নূতন সময়ে সোনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না? হয়তো বলবেন, দু দিন পরে যখন কালো হয়ে যায় তখন কি হয়?

তখন যাই হোক ওমরের বাণী এযুগের মানুষই যথার্থ পালন করে। জীবনের আসল সত্য বুঝে নিয়েছে।

আগের মানুষ বড় ঝামেলা করতে পারত। প্রেম করতে হলে চাঁদ, ফুল, নদী এ সব চাই-ই। কী মুস্কিল বলুন তো! কলকাতা শহরে কারু যদি প্রেমে পড়তে সাধ যায়, সে কোথায় পাবে এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস! মানুষ নকল চাঁদ ফুল তৈরী করেছে বটে, কিন্তু সেগুলি প্রেমের অপরিহার্য বলে নয়।

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়"

এ'র সন্ধান করতে হলে এ যুগের মানুষকে প্রেম মুলতবী রাখতে হয়। তাই যুগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, রেশন, কন্ট্রোল, ভাষা আন্দোলন এরই ভেতর রাস্তায় ট্যাকসিতে, বাসে রেস্তোরাঁয়, দিব্য প্রেম জমে ওঠে। বেশ ঘন হয়েই ওঠে। কখনো তা রেজিস্টারী অফিস বা ছাত্‌নাতলা পর্যন্ত চলেযায়। তারপর হানি মুন; এ্যানিভারসারী ডে, কয়েক দিন কত হৈ-চৈ। তারপর সব স্তিমিত হয়ে যায়। বিয়ের আগেই রোমাঞ্চটুকু শেষ হয়ে যায়, তাই বিয়ের পরে আর বেশী স্থায়িত্ব দরকার হয় না।

আগে একবার বিয়ে হলে তা জীবন ভোর কায়েম করেও মানুষের সাধ মিটতো না। স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধকে জন্মজন্মান্তর পর্যন্ত টেনে নিয়ে তবে মানুষ খুসী হত। আজ জীবনের অর্দ্ধেক বা বারো আনা কাটিয়ে বিয়ে করেও একজনকে নিয়ে বাকী সময়টুকু কাটানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব্ হচ্ছে না। তা না হোক—

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও,
বাকীর খাতায় শূন্য থাক
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে—
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

আগের মানুষের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্থায়িত্ব। শুধু নিজের জীবনই যথেষ্ট নয় পরবর্তী পুরুষদের ব্যবস্থাও পাকাপাকি চাই। বাড়ী করতো বিরাট জায়গা নিয়ে যেন কোন পুরুষেই স্থানাভাব না হয়। আজ কিন্তু আমরা মাপসই মাপেই

বাড়ী করি। আমার ছেলেদের জন্য একখানা ঘরের জায়গা নির্দিষ্ট থাকলেও নাতিদের কোন ব্যবস্থার কথা আমাদের এখন মনেই হয় না। বাড়ীর প্রসারত্বও পরের পুরুষ পর্যন্ত পৌছায় না।

একখানা খাট করলে পুরুষানুক্রমে তা ব্যবহার হত। এখন খাট আগে যায় কি জীবন আগে যায়।

আজ ভারী কাঁসার বাসন ভঙ্গুর কাঁচের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। কাঁসার চেয়ে আধুনিক গৃহিণী কাঁচের বাসন পছন্দ করেন অনেক বেশী।

সোনার চেয়ে নকল জিনিষেরই চাহিদা বেশী। সোনার মজবুত ভারী গহনা আজ লজ্জাকর। গহনা যত হাল্কা হয় ততই ভালো। ভেঙ্গে গেলে ক্ষতি নেই, নূতন ডিজাইন করা যায়। এক ভরিতে পাঁচ সেট হলে আরো ভাল, পাঁচ রকম পরা যায়। তার আয়ু পাঁচ দিন হলে ক্ষতি কি? সৌন্দর্যই আসল।

শাড়ী ব্লাউজ দেখে একথা আরো বেশী মনে হয়। কেননা শাড়ী কিনতে গিয়ে সেখানা কদিন টিকবে একথা ভাবার মত বেরসিক মানুষ বুঝি আজ নেই-ই। ঝকঝকে হলেই হ'ল। কাচলে নষ্ট হলেও ক্ষতি নেই—না কেচে কিছু দিন তো পরা যাবে!

ওমর সে কথাই বলে গিয়েছিলেন:

"এক লহমা সময় আছে
সর্বনাশের মধ্যে তোর—
ভোগ সায়রে ডুব দিয়ে কর
একটা নিমেশ নেশায় ভোর।

ধন্য কবি। এ যুগের মানুষ তাই তোমায় অনুসরণ করছে। তুমি এই চেয়েছিলে তো? *

---

* লোক সেবক—রবিবারের আসর
রবিবার ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৯

দিন রাত্রির গল্প।

ঢং ঢং করে এগারোটার ঘণ্টা পড়তে সকলের খেয়াল হয় রাত্রি হয়েছে। উঠতে হবে। মিষ্টার সিকদার বলেন, এ সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে যায়। মিষ্টার রায় বলেন, বাকি রাত্রিটুকু এখানে কাটালেও আমাদের ভালই হয়। সিকদার কী একটা বলতে হাসির দমকে ঘর যেন ফেটে পড়ে। হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ, হুঃ হুঃ লহরের পর লহর উঠতে থাকে। মনেই হয়না এ একটা ডাক্তারের চেম্বার, যেন একটা আনন্দ মেলা।

ডাক্তারখানা নামটাই কেমন জানি গম্ভীর। এখানে মানুষ আসে প্রাণের দায়ে, অসুখ থেকে সুখ পেতে। তা এদিক থেকে ডাক্তার বোস শুধু রোগীকেই সুখী করেন না, তার আত্মপরিজনরাও সুখী হয়। রাত ৯টার পর যখন রোগী আসা শেষ হয়, তখন আসে ডাক্তারবাবুর কয়েকটি ভক্ত—নিয়মিত গাল-গল্প শোনেন। ওষুধ নেবার তাগিদের চেয়েও ডাক্তারবাবুর সঙ্গ কামনায়ই এঁরা বেশী আসেন। বক্তা ডাক্তারবাবু নিজে।

আর দেরী করা চলে না, উঠতেই হয়। চেম্বার বন্ধ করে বাড়ী আসতে আসতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। তাপসী ততক্ষণ বহু রকমে খাবার গরম রাখতে চেষ্টা করছে আর ঢুলছে। ডাক্তারের পায়ের শব্দ পেতেই তাড়াতাড়ি এসে দোর খোলে। ডাক্তার গম্ভীর মুখে ঘরে ঢোকেন। এ যেন কিছুক্ষণ আগের সেই হাসি-খুশী ডাক্তার নয়। মুখ থমথমে ভ্রূ কুঞ্চিত, অবসন্ন, ক্লান্ত মানুষটি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসেন। তাপসী আবার স্টোভ ধরিয়ে খাবার গরম করতে থাকে। ডাক্তারবাবু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, কে তোমায় গরম করতে বলেছে? কতদিন তোমায় আমার খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়তে বলেছি।

তাপসী নীরব। হয়ত বা মুখখানায় কেউ আরেক পোঁচ কালি বুলিয়ে দেয়, গভীর চোখ দুটিতে আর একটু ছায়া ঘনায়। ঠোঁট দুটিও বুঝি বা একটু নড়ে ওঠে। কিন্তু কোন বাক্যস্ফূর্ত হয় না।

খাওয়া শেষ করে ক্লান্ত শরীর ডাক্তার বিছানায় এলিয়ে দেন।

রোগীদের কাছে ডাক্তার বোস দেবতা হয়ে উঠেছেন। বোস যাদু জানেন।

এ ডাক্তারকে কল দিয়ে রোগীর আত্মীয়স্বজন নিশ্চিন্ত; রোগীরা মহাখুশী। ডাক্তারবাবু শুধু শারীরিক চিকিৎসাই করেন না, তিনি মানসিক চিকিৎসাও করেন। দুদিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা করেন বলেই রোগী সেরে ওঠে ঝটপট্।

চৌধুরীকে দেখেই বলেন, আপনি যে ভীষণ অসুস্থ—শুয়েই থাকবেন। তারপর যথারীতি ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে যখন বেরোন, রোগীর বাড়ীর লোক রাস্তায় এসে চুপিচুপি ডাক্তার বাবুকে বলেন—আপনি করলেন কি ডাক্তারবাবু? এর কী এমন অসুখ—অসুখ বাই। এখন আপনার কথার পরে একে বিছানা থেকে তোলাই দায় হবে।

শোনা যায় ডাক্তারের প্রাণখোলা হাসি—সে বুঝেই তো আমি ও কথা বলেছি, রোগী চায় অসুস্থ সাজতে, আপনারা কেউ তা সমর্থন করেন না। বেচারীর দুঃখের অবধি নেই, ভাবে আমার এত অসুখ তবু আমার আত্মীয়-স্বজনের গ্রাহ্য নেই। তাই একে আমি এখন ক্রমাগতই রোগী করে রাখব। তারপর যখন রোগী হবার মজা ভাল ভাবে বুঝবে, তখন 'আমার কিছু হয় নি' বলে জোর করেই উঠবে। সে কদিন আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

ঘোষের বাড়ীর রোগীণী দেখে বলেন—দেখুন আপনার যা অবস্থা, ওষুধ হিসেবে সবই খাওয়া দরকার। আমার মনে হয় মাছের যুষ না খেলে আপনার সারতে খুবই দেরী হয়ে যাবে। রোগিণী দাদার মুখের দিকে তাকায়, ডাক্তারবাবু ভাইকে চাপ দেন বাঁচাতে হলে মাছের যুষ দিতেই হবে।

বৃদ্ধাদের ব্যবস্থা হয় প্রতিদিন গঙ্গাস্নান। তাঁদের পথ্যে কোন বিধিনিষেধ নেই। কেউ হয়ত আপত্তি করেন যুষ খেলে ব্লাড প্রেসার যে বেড়ে যাবে? ডাক্তার সেই প্রাণ-মাতানো হাসি হাসেন, বলেন টিকিট যাদের কেনা হয়ে গিয়েছে তাদের আর কষ্ট দেওয়া কেন?

কারো ব্যবস্থা হয় গড়ের মাঠের মাদুলী টিকিট, কাউকে বা মাসে দুদিন সিনেমা দেখার ব্যবস্থাও ডাক্তারবাবুকে দিতে হয়। দে'র বাড়ীর বুড়োকে খেতে দেন, মাছ, মাংস, ছানা, দই। দাসের বাড়ী গিয়ে হিসেব কষতে বসেন, তাইত পথ্য তো কেবল দিলেই হবে না পয়সাটাও তো দেখতে হবে! লেবুর

বদলে দু'আনা সেরের টমেটোতেই কাজ চলবে। আর দুধের বদলে বরং একটা ডিম দেবেন, বার্লি বেশ করে নুন-লেবু দিয়ে খাবেন। কিপটে দাস দু'হাত তুলে ডাক্তারবাবুকে আশীর্বাদ করেন। ডাক্তারের চোখেও হাসি চিকমিকিয়ে ওঠে।

রোগী দেখা তাঁর পেশা শুধু নয়, নেশা। এর ভেতরই তিনি বুঁদ হয়ে আছেন। কত রকমের লোকই যে দুনিয়ায় আছে। এদের সঙ্গে খেলতে ভারী মজা। কত সব আজগুবি গল্প বলে রোগীদের প্রচুর আনন্দ দেন। তাই রোগীরাও ডাক্তার বোস বলতে অজ্ঞান।

এত নামডাক তবু ভিজিট বাড়াতে পারেন না। অর্থের দিকে নজর দেবার কথা মনেই হয় না, একবারের ভিজিটেই প্রয়োজন হলে দুবার যান। তাই নামের তুলনায় পকেট হাল্কা, কিন্তু ভিড় অত্যধিক।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে দেড়টা-দুটো বেজে যায়। স্নান-খাওয়া সমাপ্ত করে একখানা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে বসেন। তাপসী এসে কাছে বসে. এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। তারপর একসময়ে হয় তো বলে—ওগো শুনছ? আজ একটা ভিখারী বাড়ীর ভিতর ঢুকে গিয়ে কী কাণ্ড করেছিল জান?

কোনও সাড়া না পেয়ে চুপ করে যায়। একটু ঘুরে আসে। আবার বলতে থাকে—জান আজ জিতুদের বাসায়·········

আঃ! একটু কি বিশ্রাম করতে দেবে না, বলে ওঠেন ডাক্তার বোস।

শিশুর মতই বুঝি ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে তাপসীর। উদ্গত চোখের জল চাপতে তাড়তাড়ি পাশের ঘরে চলে যায়। চোখ মুছতে মুছতেও ওর যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে মন সচকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু না শুধু হাওয়া, খটাস্ করে দরজায় একটা শব্দ করে তাপসীকে ব্যঙ্গ করে যায়।

চারটের বেল পড়তেই ব্যথা-জ্বালা সব কিছু ভুলে তাপসী চায়ের জল চাপায়। চা দিয়ে তাপসী বলে—আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে?

কেন?

অনেকদিন সিনেমা দেখিনি। একটা ভাল বই এসেছে। চল দেখে আসি। এক নিশ্বাসে কথা কটি বলে তাপসী হাঁপাতে থাকে।

ডাক্তার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন—আমি যাব এখন সিনেমায়?

তাপসী আরেকটু সাহস সঞ্চয় করে বলে—গেলে দোষ কি? তাছাড়া কাল যে দেবুর ভাত। একটা কিছু কিনতেও তো হবে।

তা আমি কী করবো? যা দেবার কিনে নিয়ে এসো। সিনেমায় যেতে চাও যাও, আমি তো তোমাকে বারণ করিনি।

সিনেমা কখনো কারও একা দেখতে ভাল লাগে? কাল দেবুর ভাতে যাবে তো? তাপসীর স্বরে মিনতি ঝরে পড়ে।

না—না। এ সব সামাজিকতা আমার পোষায় না। তাছাড়া আমার সময়ই বা কৈ? বলেই ডাক্তার বেরিয়ে যান।

স্থাণুর মত তাপসী বসে থাকে। মনের ভেতরটা জ্বালা করতে থাকে। বান্ধবীর গতকালের ডাকে আসা চিঠিখানা নজরে পড়ে, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তুমি সৌভাগ্যবতী। ডাক্তার বোস দেবতা। আমার নন্দাই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ননদের মুখে ডাক্তার বোসের গল্প আর শেষ হয় না। তুমি ধন্যা। এমন লোকের জীবন-সঙ্গিনী হওয়া বহু যুগের তপস্যার ফল······ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে তাপসী বসেই থাকে! মুখ দিয়ে বেড়িয়ে যায় "তুমি ধন্যা"। ভগবান!

কিন্তু কী করতে পারে সে? আত্মহত্যা? দূর দূর! এই সুন্দর পৃথিবী হতে সে বিদায় নিতে পারবে না। কিন্তু করবে কী? এমনি করেই কি সে শুকিয়ে মরবে?

কিছুদিন ধরে ডাক্তার বোস এক জটিল রোগিণী নিয়ে বিপদে পড়েছেন। নন্দার অসুখ কিছুতেই ধরা পড়ছে না। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ওষুধ-পত্রের স্তূপ জমে উঠেছে আর রোগিণী শুকিয়েই যাচ্ছে। অত্যন্ত দুর্বল, অবসাদগ্রস্ত, মনমরা হয়ে থাকে। কোন ওষুধেই বিশেষ কাজ হচ্ছে না, স্বামী বেচারী তো ডাক্তারবাবুর কাছে কাল প্রায় কেঁদেই ফেলেছে। ডাক্তারবাবু! যে করেই হোক নন্দাকে সারিয়ে দিন—বলে ডাক্তারবাবুর পায়ে হাত দিচ্ছিল। সংসারে কোন অশান্তি আছে বলেও মনে হয় না, তবু এরকম হবার মানে কী? ভাবতে ভাবতে ডাক্তার বোস বাড়ী গিয়ে দেখেন, তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। খুশীই হন ডাক্তার বোস। আজ তাপসীকে তবে সত্যি জব্দ করতে পেরেছেন, ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন ভোরে রামু চা-জলখাবার দিয়ে বললে—মার খুব মাথা ধরেছে, মাকে দেখে যাবেন।

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন—এখন হবে না, দুপুরে দেখব।

দুপুরে ডাক্তার বোসের মেজাজ ভালই ছিল। নন্দার অসুখ ধরা পড়েছে। নন্দা অসুস্থ তাই অনিল নন্দার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখেই চলে। ওর ভয়, না হলে নন্দা আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাছাড়া অসুখের এই বিরাট ব্যয়ভার বহন করার জন্য গোপনে অনিল গোটা দুই টিউশনি করছে এবং কোনক্রমেই নন্দা যেন জানতে না পারে সে জন্য নিয়ত লুকোচুরি করছে। ভয়, নন্দা জানতে পারলে অনিলকে কখনো এত খাটতে দিতে রাজী হবে না। কিন্তু এই শুভ প্রচেষ্টায় নন্দা ভুল করে কাতর হয়ে পড়েছে। নন্দা ভাবছে স্বামীর আর তার উপর আসক্তি নেই, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, বাড়ী থাকতেই চায় না। সে দিন গল্পচ্ছলে ডাক্তার বোস নন্দার কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন। এখন অনিলের কাছে শুনে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে ডাক্তার বোস দেখেন সদর ভেজানোই আছে। দেখেই মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। এদের আর কাণ্ডজ্ঞান হবে না; দুপুরে কেউ সদর খুলে রাখে?

অভ্যস্তভাবে ইজিচেয়ারে চোখ বুজে বসার পরও যখন চুড়ির শব্দ বা কাপড়ের খস্‌-খস্‌ কানে এল না তখন বিরক্ত হয়ে চোখ মেলেও কাউকে না দেখতে পেয়ে তাপসীর ঘরে ঢুকে দেখে সেখানেও তাপসী নেই। ডাক্তারের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। গম্ভীর মুখেই গামছাটা টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে স্নান করে এসেও কাউকে না দেখে নিজেই ভাত নিতে গিয়েও থমকে যায়। এঁটো হাতেই এ ঘর সে ঘর খুঁজতে থাকে। সমস্ত ঘর-দুয়ার যেন খাঁ-খাঁ করছে, তাপসী নেই।

কিছুক্ষণ রামুকে ডাকাডাকি করেও সাড়া মিলল না। বোস অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে উঠতেই দেখে রামু ঢুকছে।

ডাক্তার বোস হুঙ্কার ছাড়েন—আর বাড়ী ঢুকতে হবে না, যাও! রামু মাথা চুলকে বলে, আমার তো বেশী দেরী হয় নি। অসুস্থ মেয়ে ছাড়তে কি চায়! কাজ তো সব সেরেই গিয়েছি। মা কই?

মা কই তা আমি জানি হতভাগা? তুই বাড়ী থাকিস কি করতে?

বাঃ, আমার মেয়ের অসুখ। মা-ই তো বললেন, বিকেলে তোর যাওয়া হবে না। তুই এখন যা, দুপুরেই চলে আসিস।

তবে তোর মা গেল কোথায় ? হঠাৎ যেন ডাক্তার বোসের কণ্ঠস্বর অসহায় হয়ে ওঠে।

দুজনে মিলে সমস্ত ঘর-দোর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাপসীকে পায় না। যে একদিন সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল সে আজ নেই, কোথাও নেই।

সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খোঁজ করা হয়েছে। বাপের বাড়ীও খোঁজ নেয়া হয়েছে, সেখানেও তাপসী যায় নি।

তাপসী তবে গেল কোথায় ? ডাক্তার বোস ঘটনাটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন বাপের বাড়ী গিয়েছে। কিন্তু রামুর কথাতে প্রকৃত ঘটনা জানতে কারও বাকি নেই।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। দিন শেষ হয়, রাত্রি আসে। রাত্রি যায় দিন আসে। কিন্তু ডাক্তার বোসের মনে হয় দিনগুলি যেন থেমে গেছে। *

শারদীয় মধুবাংশ—১৩৫০

শিল্পীর মতামত

আজ আমাকে একটু শীগ্‌গীর বেরুতে হবে।

দুপুর বেলা কোথায় যাবে ?

জয়ন্ত—না দুপুরে যাব না। এই খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করেই বেরুব।

সে তো রোজই যাও।

জয়ন্ত জুতো পালিস করতে বসে যায়। লেবু দিয়ে, স্পিরিট দিয়ে, কালি দিয়ে, তবু যেন তার পছন্দ মত পরিষ্কার হয় না। জুতো কিন্তু ঝক্ ঝক্ করতে থাকে। তারপর শেভ্। বহুক্ষণ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারবার কামায়। মুখে ঘসে ফিট্‌কিরি, পাউডার। মুখখানা সুন্দর মসৃণ কোমল হয়ে ওঠে। গুন্ গুন্ করতে করতে ঢোকে বাথরুমে। সুগন্ধ সাবানের শুভ্র ফেনা বেরুতে থাকে নর্দমা দিয়ে, দীর্ঘ সময় স্নান করে বাইরে আসে। অনিমাকে হাঁক দেয়—ভাত দিয়েছ ?

অনিমা বলে—ভাত দিয়ে তুলে রেখেছি। চিরকাল বাবুর পাঁচ মিনিটে স্নান হয়, বাথরুমে ঢুকলেই ভাত দি, আজ সেই পাঁচ মিনিট পঞ্চাশকেও ছাড়াবে আমি কী করে জানবো ?

বেশ করেছ গো, বেশ করেছ, এখন খেতে দাও।

খেতে বসে জয়ন্ত এ কথা সে কথা বলে, হঠাৎ অনিমার মাছ রান্নাটার উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করে। দিলদরিয়া মেজাজে আর দুটি ভাত চেয়ে নেয়। অনিমার দিকে চেয়ে বলে তোমার তো স্নান হয়ে গিয়েছে, একেবারে বসে পড়লে পারতে ?

অনিমা বলে—আমাকেও নিয়ে বেরুবে নাকি ?

জয়ন্ত হেসে ফেলে—তোমায় নিয়ে কোথায় যাব বল ? আমি যাই রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। সাংবাদিকের কাজ বড় কঠিন। যে যত আগে নূতন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে তার তত সুনাম, কাজে উন্নতি।

অনিমা বলে—'কাজে যা উন্নতি তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

জয়ন্ত আর কথা বাড়ায় না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। অনিমা রান্না ঘরের কাজ চুকিয়ে এসে দেখে, জয়ন্ত বাক্স খুলে ও'র জামা কাপড় বের করছে।

অনিমা বলে—একি, শোওনি ?

শুয়েছিলাম, ঘুম হ'ল না, আজ যাব টালায় অনীতা চাটার্জির বাসায়, তার ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ নিয়ে আসবো, এ মাসের বসুমতীতে তা ছাপতে হ'বে।

ও হরি! এই কথা, সে জন্যই ঘুম হ'ল না।

খুসির বান দেখছি সকাল থেকেই উপচে পড়ছে। তা শ্রীমতীর কাছে গিয়ে কী হবে? আমিই তো সে সংবাদ দিতে পারি।'

তোমার জীবনী নাকি? কি যে বল? অনীতা চাটার্জি একটি যে সে ষ্টার নয়, তার দৈনন্দিন খবর জানার জন্য কত মানুষ উদগ্রীব হ'য়ে আছে। শুধু একটু দেখার জন্য যে রাস্তায় ওরা চলে, সে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক দাঁড়িয়ে থাকে। আজ আমি তার কাছে গিয়ে সব খবর জেনে আসব।

ওগো! আমিও তো সাংবাদিক গৃহিণী, কাজেই ফেলনা নই। যে রিপোর্ট আনতে তোমার এত হৈ-চৈ, তা আমি ঘরে বসেই লিখে দিতে পারি। এমন নিখুঁত ভাবে লিখবো যে তোমার অনীতা চাটার্জিও এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না।

জয়ন্ত বলে—সাধে কি আর লোকে বলে যে এগারো হাত কাপড়ে মেয়েদের কাছা হয় না। অনীতা চাটার্জির জীবনী তুমি কী জান।

অনিমা জবাব দেয়—ওই সান্ত্বনা নিয়েই তোমরা থাক। কাছার উপর আমাদের এতটুকু আস্থা নেই বলেই ওটা আমরা দিই না, হয় না না—বুঝলে মশাই! ওই কাছার জন্যই তো তোমাদের যত বিভ্রাট। পেছনে একজনকে কাছা আগলে চলতে হয় বরাবর।

জয়ন্ত বলে—না আর সময় নষ্ট করবো না, যেতেও অনেকটা সময় লাগবে। আর যদি একটু আগে পৌঁছি না হয় বাড়ির কাছে অপেক্ষা করব। দেরী হয়ে গেলে বড় লজ্জার কথা হবে, আর হয়তো কাজও হবে না। কত কাজ এদের, তবু যে আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেছে সেকি সোজা কথা!

জয়ন্ত সাজ গোজ আরম্ভ করে। সুন্দর ব্রাউন রংয়ের সুট—ফর্সা রংএ' চমৎকার মানায়। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাইটা বাঁধে। মুখে দেয় ক্রীম, পাউডার,

হাতের আংটিটা একটু বড় হয় বলে জয়ন্ত খুলেই রাখে। আজ সেটি পর্যন্তও ভোলে না। নিখুঁত ভাবে সাজসজ্জা করতে জয়ন্তের আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগে।

অনিমা বলে তুমি কি সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছ, সাজ যে আর হ'তেই চায় না গো?

জয়ন্ত অনিমাকে একটু আদর করে বলে—বিয়ের কাজ তো অনেক দিনই চুকিয়েছি। আর অভিনয়? আমার মনিবানী পছন্দ করে না। এই বলে কটাক্ষ করে বেরিয়ে যায়।

অনিমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চেয়ে থাকে স্বামীর যাবার পথের দিকে। জয়ন্তকে সুশ্রীই বলা চলে। লম্বা চওড়ায় বেশ সুপুরুষ। অনেকদিন অনিমা জয়ন্তের চেহারার দিকে চেয়ে একটা গর্বই অনুভব করেছে। আজ যেন মনটা কি রকম ভেতরে মুচড়ে ওঠে। চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

হঠাৎ একটা কৌতুক অনিমার মুখে ঝিলিক মেরে ওঠে। একটা প্যাড্ আর পেন নিয়ে বসে যায় চেয়ারে। রাত্রি আটটার সময় জয়ন্ত আসে। অনিমার মুখে চোখে চাপা কৌতুক।

বলে—কী গো! অনীতা চাটার্জির জীবনী এনেছ?

জয়ন্ত জবাব দেয়—হ্যাঁ, চমৎকার লোক। আমি যেতেই আমাকে বসালো। যা জানতে চেয়েছি এতটুকু বিরক্ত না ক'রে তাই আমাকে জানিয়েছে।

অনীতা চাটার্জির জীবনী তো আমি জানি।

তাই নাকি? তোমার সাথে আলাপ ছিল নাকি? তা থাকলেও তার আগের জীবনের খবর তুমি জান্‌বে কোথা হতে?

অনিমা বলে—আচ্ছা দাও রিপোর্টটা, দেখি কী জেনেছ'।—অনিমা রিপোর্ট পড়তে পড়তে মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। বলে—চমৎকার! কী মজা!

জয়ন্ত খুসি হয়, বলে—বলিনি তোমাকে যে চমৎকার; এখন বুঝলে?

অনিমা কোন জবাব না দিয়ে একখানা কাগজ এনে জয়ন্তর কাছে ফেলে দেয়। জয়ন্ত পড়তে থাকে।

শিল্পির মতামত।

বেলা চারটার সময় অনীতা চাটার্জির কাছে যাবার সময় ঠিক করা হয়। আমি কলিংবেল টিপতেই একটি চাকর আমাকে নিয়ে হলে বসায়, একটু পরেই অনীতা চাটার্জি হাসি মুখে ঘরে ঢোকেন, আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাই, তিনি

প্রতিনমস্কার জানিয়ে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন এবং আমাকে বসতে বলেন।

আমি বলি—আপনাকে দু চারটে প্রশ্ন করে বিরক্ত করবো।

তিনি বল্লেন—বলুন আমায় কী বলবেন ?

আমি—আপনার দৈনন্দিন রুটীন কী ?

অনীতা—সাধারণ দৈনন্দিন রুটীন স্নান, খাওয়া, সংসারের কাজ করা, কুটনো কোটা, রান্নার তদারক করা। যে দিন সুটিং থাকে সে দিন অবশ্য বাইরেই বেশী সময় কাটাতে হয়।

আমি—অভিনয় করতে হ'লে কী কী গুণের দরকার হয় ?

তিনি—অভিনয় করতে হলে চেহারা, কণ্ঠ-সঙ্গীত, অভিনয়দক্ষতা, সবই দরকার হয়। তবে আমি বলব সব চেয়ে বেশী দরকার অভিনয়দক্ষতা ; অভিনয়কে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারলে বড় হওয়া যায় না।

আমি—আপনি কি মনে করেন ভদ্রঘরের মেয়েদের এ পথে আসা ভাল ?

তিনি—নিশ্চয়ই, ভদ্রঘরের মেয়েরা এগিয়ে আসুন এটাই চাই।

আমি—আপনি এ লাইনে এসেছিলেন কেন ?

অনীতা চাটার্জি—আর্থিক প্রয়োজন ছিলনা তা নয়, তবে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁকই প্রধান কারণ। ছোটবেলা থেকেই আমি অভিনয়কে মনেপ্রাণে ভালবাসি।

আমি—আপনার বাড়ীর লোকের আপত্তি ছিল না ?

তিনি—প্রথমে একটু আপত্তি ছিল, ক্রমে তা দূর হয়ে যায়।

আমি—কোন ছবিতে অভিনয় করে আপনি বেশী আনন্দ পেয়েছেন ?

তিনি—সব ছবিতেই অভিনয় করতে আমার ভাল লাগে, তবে সবচেয়ে আমি বেশী খুসি হয়েছি বঁধুতে অভিনয় করে।'

আমি—আপনার কি কোন 'হবি' আছে ?

তিনি—হবি' বিশেষ একটা কিছুতে নেই, তবে পড়াশুনা আমার ভাল লাগে। মাসিক বসুমতী আমার প্রিয় সাময়িকী। এটা আমি উল্টে পাল্টে পড়ি। সেলাইতে আমি আনন্দ পাই, গান আমার অন্তরের জিনিস, রান্না করতে আমার খুব ভাল লাগে। পরিজনদের খাওয়া দেখতে আমি ভালবাসি—যদিও আমার ছেলে হয়নি। আমার ছেলে হ'লে তাকে নিজ হাতে খাওয়াব বলেই মনে করি। সংসার করাতেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

আমি—ভবিষ্যতে আপনার কী করার ইচ্ছা ?

তিনি—ভবিষ্যতে আমি আরও ভাল করে অভিনয় করব, সংসার করব—এই-ই আমার কামনা। আর একটি কাজ আমার প্রিয়—যে ভাবেই হোক কিছু সময় করে নিয়ে স্বামীর কাছে থাকা। স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা।

আমি বলি—কি রকম পোষাক পরিচ্ছদ আপনার পছন্দ ?

তিনি—সাদা, সিম্প্‌ল্ পোষাকই আমি পছন্দ করি। আড়ম্বরহীন জীবন আমার ভাল লাগে।

আমি বলি—আর আপনার সময় নষ্ট করব না। বলে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে আসি ·······

কাগজটা পড়া শেষ করে জয়ন্ত দেখে অনিমা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

জয়ন্ত একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে বলে—এ উল্টোপাল্টা লেখাটা কোথা থেকে আনলে ?

অনিমা বলে—কেন তখন বলেছিলাম না অনীতা চাটার্জির জীবনী আমিই লিখে দিতে পারি।

এবার জয়ন্ত চটে ওঠে—এটা কী হয়েছে ? উল্টোপাল্টা কতগুলি কথা বসানো হ'য়েছে।

এবার অনিমা খিল্ খিল্ করে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

বা ! তুমি বুঝি এ প্রশ্ন আগে, সে প্রশ্ন পরে করতে পারনা ? জবাবগুলি তো নির্ভুল হয়েছে।

জয়ন্ত কেমন যেন মনমড়া হয়ে পড়ে। এই অনীতা চাটার্জির রিপোর্ট আনার জন্য আজ কতদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করছে, কত চিন্তা, কত সমস্যা, আর এ বলে কী ? কিন্তু লেখাটি ত খুব ভুলও হয় নি ? শুধু আগের প্রশ্ন পরে, পরের প্রশ্ন আগে করেছে।

জয়ন্ত বলে—লক্ষ্মীটি, বলনা, এ লেখা তুমি পেলে কোথায় ? এ তোমাকে কে বলেছে ?

অনিমা এবার গলা ছেড়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

ওগো বুদ্ধিমান, ওগো কাছাদেনেওলা আদ্‌মি, এ আবার কাউকে বলে দিতে হয় নাকি ? তোমাদের মাসিক বসুমতীতে প্রতি মাসে যা বেরোয়, একটু লক্ষ্য

করলেই দেখা যায় যে সব তারকাদের জীবনী প্রায় একই, প্রত্যেকেরই সংসারের কাজ ভাল লাগে, স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, সিম্পল্ পোষাক আসাক এসব থাকবেই। আমি একটি স্কেচ্ও এঁকেছি, অনিতা চাটার্জি স্বামীকে প্রণাম করছেন। নীচে লিখে দিয়েছি, প্রতিদিন ভোরে তিনি যা করেন। এটাও সাথে ছাপিও। আরও সুখ্যাতি পাবে।

জয়ন্ত কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। সব তারকাদের জীবনই এক রকম? দূর! তা হতেই পারেনা। কেউ ভালবাসেন সঙ্গীত, কেউ ভালবাসেন শিল্প, এ কখনো এক হ'তে পারে? মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কত হবে?

সাধে লোকে বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। *

* মন্দিরা—বৈশাখ, ১৩৬০

বাজেট ঘাটতি

শুনছ? দীপালি এসেছে। ওদের একদিন নিমন্ত্রণ করতে হয়।

দীপালি এসেছে না কি? তা এখন আবার নিমন্ত্রণ কেন?

মনোরমা হেসে ফেলে—কী যে বল, সেই বিয়ের পরে একদিন জামাই-মেয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলে। আবার এক বছর পর ওরা এলো। এখন একদিন না আনলে চলে কখনো? তোমার দাদার মেয়ে, না আনলে লোকে তোমাকেই নিন্দে করবে।

তাতো বুঝলাম। কী দিয়ে করি তাই বল?

কী দিয়ে করবে তাতো লোকে বুঝবে না; যে করেই হোক করতে হবেই।

ভুবনবাবু হতাশ ভাবে বলেন—বেশ, তাই কর।

কিছুদিন পরে মনোরমা ভুবনবাবুর পাতে ভাত দিয়ে হাওয়া করতে করতে বলে—ছাখো পাঁচুর জন্যে একজন মাষ্টার রাখতেই হবে।

ভুবনবাবু শক্ খাওয়া লোকের মতো হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

মনোরমা বলে—কথাটা তুমি ভেবে দেখো, পাঁচু এখন উপরের ক্লাসে উঠেছে, এখন একজন টিউটার ছাড়া চলেই না।

সর্বসাকুল্যে আড়াইশ' টাকা মাইনে পাই, ছেলেমেয়েদের ভালো করে খেতে দিতে পারিনে, এর ওপরে আবার মাষ্টার!

মনোরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—উপায় কী বল? ছেলেপুলের শিক্ষার জন্য তো খরচ করতেই হবে।

তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে কেন, তুমি পড়াও না?

বেশ বলেছ। কোন জন্মে পাশ করেছিলাম এখন কি আর কিছু মনে আছে। তাছাড়া আমার সময় কোথায়? তোমার সংসার আগলাব, না ছেলে

পড়াব। একাধারে রাঁধুনী, ঝি, ধোপা, কত পোষ্টই তো আমায় দিয়েছ, আর কেন ?

ভুবনবাবু রাগে গর গর করতে করতে চলে যান।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষক বহাল হয়। মাসখানেক পরে কর্তা হুঙ্কার ছাড়েন, এবার পূজোয় কোন কাপড় কেনা হবে না।

তা মিনতি রবিকে তো পাঠাতেই হবে।

কেন ?

নতুন কুটুম। পুজোর দিনেও মেয়েজামাইকে কাপড় না দিলে লোকে বলবে কী ?

বলবে আবার কী ? আমি কি সমস্ত জীবনই কাপড় দেব নাকি ? মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, এখন আর আমার দায় কী ?

মনোরমা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দেয়—কী যে বল ! তুমি কি সারা বছর কাপড় দাও ? পূজোয় বষ্ঠিতে দু'খানা দাও তাতে আবার এত কথা।

বেশ আর কাউকে দেব না। শুধু ওদেরই দু'খানা।

আমার হয়েছে যত জ্বালা। তোমার মাকে দিতে হবে না ?

তাঁকে তো ভাইরাই দেবে।

তা বলে তুমি বছরের দিনে মাকে একখানা কাপড দেবে না ?

ব্যাস তা হলে ঐ পর্য্যন্তই। বলে ভুবনবাবু সিগারেট ধরান।

তোমার যে কী এক স্বভাব হয়েছে ! পাচু, তিনু, অনু, ছানু ওরা ছেলেমানুষ, ওদের বছরের দিনে একখানা নতুন জামা-কাপড় না দিলে চলে কখনো ?

বুঝেছি গো বুঝেছি। সকলের জন্যই চাই, কিন্তু আসবে কোথা থেকে তা ভেবেছ কখনো ?

আমার আর ভালো লাগে না বাপু। হবে কোথা থেকে, আসবে কোথা থেকে তা আমি কী জানি ? যা না হলে নয় তাই তো বলি, বলে মনোরমা ঘর থেকে চলে যায়।

ভুবনবাবু স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে এসে বলেন—কি এখনো রান্না হয়নি ?

এই যে হ'ল। ছানুটা বড় কাঁদছে, কি হয়েছে বুঝতে পারছি না।

কাঁদুনে ছেলে-মেয়ে তোমার কাঁদবেই।—বলে ভুবনবাবু নিজেই আসন নিয়ে খেতে বসেন।

একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি মাছে জল দিয়ে তোমায় ভাত দেব।

মাছ খেতে গেলে আর আমার চাকরী থাকবে না।

এই যে এক্ষুনি দিচ্ছি একটু দাঁড়াও। মুস্কিল হয়েছে ঘি-টা ফুরিয়ে। কী দিয়ে এখন ভাত দি?

ঘি কে চেয়েছে? আমাকে দুটি নুন ভাত দিয়ে ভদ্রতা করতে বস।

তোমার বাপু বড্ড ঠেশ দেওয়া কথা।

ভুবনবাবু উঠে পড়েছেন দেখে মনোরমা এক হাতা ভাত থালায় তুলে ঘির শূন্য শিশি উপুর করলো।

ছানুটা ওদিকে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। ভুবনবাবু বাড়ী ফিরতেই মনোরমা কেঁদে ওঠে।

অবস্থা দেখে ভুবনবাবু ডাক্তার আনতে যান।

জ্বর সহজে সারেই না। মাসখানেক যমে মানুষে টানাটানির পর ছানু যখন দাড়ালো ভুবনবাবু তখন বসে পড়েছেন। হ্যাঁ, একেবারেই বসে পড়েছেন। শ'তিনেক টাকা হাওলাত হয়েছে।

মনোরমা পরিতৃপ্ত মুখে ছানুর দিকে চেয়ে বলেন—উঃ কি চেহারাই হয়ে গিয়েছে। ছাখো, ওকে কয়েক দিন চেঞ্জে পাঠাতে পারলে বেশ হ'ত।

ভুবনবাবু বলে ওঠেন,—তোমার হুকুম হলেই পারি। আশ্চর্য এই মেয়ে মানুষ! ভগবান কী দিয়ে যে এদের তৈরী করেছিলেন।

মনোরমার চোখে জল এসে যায়! হ্যাঁ, আমারই তো যত দোষ। সবই আমার জন্য করতে বলি।

সদরে একখানা গাড়ী দাঁড়ায়। মনোরমা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে—ওগো, বেয়ান আর বেয়াই মশাই ছানুকে দেখতে এসেছেন। তুমি চট করে একবার দোকানে গিয়ে কিছু ময়দা পাঠিয়ে দাও। অমনি বাজারের থলেটিও নিয়ে যাও। কিছু পাকা মাছ কিম্বা মাংস হলেই ভালো হয়; সেই সঙ্গে পটল আলুও এনো। আর বেয়াই মশাই-এর জন্য সামান্য একটু ফলটলও এনো বাপু। দই আর সন্দেশটা বরং তিনু নিয়ে আসুক।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি ওদের এনে বসাচ্ছি, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। জিনিস এলে তবে তো খাবার তৈরী করবো।

ভুবনবাবু ধীরে ধীরে থলেটি নিয়ে ভাবেন, আর কেন? এখনি যেন গাড়ী চাপা পড়ি। সংসারের সুখ তো খুবই ভোগ করেছি।

মনোরমা যেতে যেতে ভাবতে থাকে, আর পারা যায় না। কুটুম দেখলেও আতঙ্ক হয়। মাইনেটা আর একটু বাড়তো।

* * * *

ঝনাৎ করে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দীপ্তি বলে—নাও তোমার চাবি, নাও তোমার হিসাব পত্র। এই সামান্য টাকায় মানুষ কখনো সংসার চালাতে পারে? আমি বলেই চালাচ্ছি, না হলে এই চারশ' টাকায় কখনো আজকালের সংসার চলে?

কমলেশ সন্ধির মনোভাব নিয়ে বলে—আহা চটো কেন? আমি কি বলেছি তুমি বেশী খরচ করছো?

বেশী কম বুঝি না বাপু, এ টাকায় আমি চালাতে পারবো না। আমি কেন কোন মেয়েই পারবে না।

এ মাসে একটা সোফাসেট না কিনলেই নয়। ড্রয়ীং রুমের কি ছিরি, মিস্টার বাসুরা মাত্র এক মাস এসেছে, এরই মধ্যে চমৎকার ঘরদোর সাজিয়ে ফেলেছে। তারপর মিসেস ভট্টাচার্য্যের ম্যারেজ এ্যানিভার্সারী ডে-তে অন্তত ত্রিশ টাকার একখানা শাড়ি দিতেই হবে।

বল কি, ঐ বুড়ি মুটকিটার এ্যানিভার্সারী ডে করা হয়!

কী আশ্চর্য! বয়স হয়েছে বলে এ্যানিভার্সারী ডে করবে না! আসল হ'ল এনার্জি। ফূর্তি করতে জানতে হয়। তোমার মতো কেবল খরচের চিন্তা করে কি আর ভদ্রভাবে থাকা চলে? মিস্টার বাসুরা এলে বসাবে কোথায় শুনি?

কমলেশ অপরাধীর মত বলে, আমাকে কী করতে বল? আগে বাবা-মাকে কিছু পাঠাতাম, তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

লজ্জা করেনা বলতে? আপনা খেতে নেই ঠাই শঙ্করাকে ডাকে। তোমার হয়েছে সেই দশা! আমি চিন্তায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, কী করে সংসার চালাব আর তোমার ক্ষোভ হ'ল তোমার বাবা-মাকে টাকা পাঠানো হয় না। কোন লজ্জায় বিয়ে করেছিলে? ঠাকুরটা ভালো চপ কাটলেট তৈরী করতে পারে না। একটা ভালো বামুন চাই—কোন খেয়াল আছে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

সত্যি, এত অল্প মাইনেতে বিয়ে করাই আমার ভুল হয়েছে।

*　　*　　*　　*

মা, খোকনের আজ তিন দিন মিছরি নেই। বাবাকে বলেছিলেন ?

না মা, আমি বলিনি। মাসের শেষে যখন ভালই জানি, তোমার শ্বশুরের হাতে পয়সা নেই, তখন কি করে আমি বলি ? তুমি বললে এক রকম।

না মা, তা আমি বলতে পারবো না।

বেশ তো, এ ক'টা দিন একটু চিনি দিয়েই চালিয়ে দাও না।

মীরার কথাটা পছন্দ হয় না, তারপর বলে—মা ! আমার ভগ্নিপতি বিকালে আমায় দেখতে আসবেন। তিনি আমার হাতের লবঙ্গলতিকা খুব পছন্দ করেন। আমায় কিছু ক্ষীর আনিয়ে দেবেন ?

বিস্ময়ের সুরে যোগমায়া বলেন—লবঙ্গলতিকা করবে তাতে ক্ষীর কী হবে ? নারকোল কোরা দিয়ে করলেই যথেষ্ট।

না মা, ক্ষীর দিয়েই আমি বরাবর করি।

আদিখ্যেতা করো না। চিরকাল আমরা লবঙ্গলতিকা করে এলুম নারকেল দিয়ে আর আজ কিনা ক্ষীর না হলে লবঙ্গলতিকা হবে না। হিসেব করে না খেলে টাকা দু'দিনে উড়ে যায়। আমাদের লবঙ্গলতিকা খেয়ে তো কেউ নিন্দে করে নি। একটু বুঝে-সুঝে চলতে শেখ। আমরা আর ক'দিন।

মীরা মুখ ভার করে চলে যায়। নিজের ঘরে ঢুকে মীরা দেবেশকে বলে, ওগো, "একদিন রাতে" বইটা নাকি খুব ভালো হয়েছে আজ চারখানা টিকিট নিয়ে এসো তো। দিদি জামাইবাবুকেও নিয়ে যাব।

আচ্ছ আমি টিকেট কাটবো কোত্থেকে ? তুমি তো জান আমি যা মাইনে পাই তা বাবার হাতে তুলে দি।

বাবা সবার কাছে বলে বেড়ান, মানুষ এ সময় ছেলের রোজগারে খায়, আমি ছেলে বৌকে খাইয়ে কুল পাইনে। সত্যি মাত্র চার'শ টাকা বাবার হাতে তুলে দিতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

আচ্ছা তোমার জন্য বাবার আটকাচ্ছে কী ? তিনি পেনশন পান পাঁচ'শ, দুটো ফ্ল্যাটের ভাড়া পান সাত'শ, তুমি দাও চার'শ। তবু টানাটানি তোমাদের বাপু লেগেই আছে। একটু শখ-আহ্লাদ করার উপায় নেই। অথচ সবাই জানে আমার মস্ত বড়লোকের বাড়ী বিয়ে হয়েছে।

রাগ করলে কী হবে। বাবা তিনতলার ফ্ল্যাট দু-খানা না তুলে আর একটুও বাজে খরচ করবেন না।

মীরার মুখে আর কথা যোগায় না। নিরুপায় ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলে—মা, আজ রাত্রে দিদি জামাই-বাবুকে খেতে বললে হয় না? শাশুড়ী বলেন—না না, এখন অত হাঙ্গামা চলবে না। তোবার শ্বশুর এক শ' বিঘা জমি কেনার জন্য ব্যস্ত আছেন। এখন একটু সংক্ষেপেই সব সারতে হবে। যখন যেমন তখন তেমন চলতে হয়। এখন আমাদের যে কী অবস্থা যাচ্ছে। তবু অমন শ্বশুর পেয়েছিলে বলেই সব ঠিকমত চলছে।

মীরা স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।

* * * *

এ মাসে একটা আয়া রাখতেই হবে।

বেশ তো রাখ, কে তোমায় বারণ করেছে।

না হলে সম্মান থাকে না। তা ছাড়া বেবীকে নিয়ে তো আর আমি সারাদিন থাকতে পারিনে। আমার রেস্টেরও তো প্রয়োজন আছে।

মিস্টার সিগারেটের কৌটো থেকে একটি সিগারেট নিয়ে বলে—নিশ্চয়ই, আয়া ছাড়া কি করে চলে? মিসেস পাউডারের পাফ বুলাতে বুলাতে বলে—এবার গরমে কোথায় যাবে?

তুমি যেখানে হুকুম করবে।

আমি বলি এবার কাশ্মীর চল। বার বার দার্জিলিং সিমলা ভাল লাগে না।

তোমার চয়েস-এর উপর কি আমি কখনো কথা বলি?

আর দেখ, একখানা বুইক্ কিন্তু এবার কিনতেই হবে।

মিস্টার আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বলে—সে তো খুবই ভাল কথা। বেশ মজা হবে। কখনো ড্রাইভ করবে তুমি, কখনো আমি। নিত্য নূতন পথে যাব।

মিসেস হাতের বালাটার দিকে চেয়ে বলে—মুস্কিল কি জান, এ মাসেই আমার আর একসেট জড়োয়া গয়না করতেই হবে।

মিস্টার বলে—চল, অর্ডার দিয়ে আসি।

মিসেস এবার চটে ওঠে—তুমি তো সবেতেই বেশ তো কর না, বলছো। করি কী দিয়ে ভেবেছ? ওই শুনতেই বার'শ টাকা মাইনে। এদিক করতে গেলে ওদিকে কুলোয় না।

মিস্টার অসহায় ভাবে বলে—আমায় কী করতে বল? আমি তো যথাসর্বস্ব ওই রাঙ্গা পায়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। এখন যা হুকুম করবে তাই তামিল করবো। এ দিকে অফিসে আমার কিছু জিনিস পত্র দেওয়া দরকার তাও তোমায় বলতে ভরসা পাইনে।

না, এ ভাবে আর পারা যায় না। টাকা যে কী হয়, কুলোতেই চায় না।

ঘাবরাও কেন? বাজেট সব সময়েই ঘাটতি হয়। দেখ না আমাদের গভর্ণ-মেণ্টেরও বাজেট ঘাটতি।

গভর্ণমেণ্টের ঘাটতি হলে তো আমাদের উপর 'কর' ভার চাপান। আমরা কার উপর চাপাই?

মিস্টার সিনহা হা হা করে হেসে ওঠেন। বাজেট ছেটে দাও। তা বলে আমার সিগারেট নয়! *

* সংহতি—শ্রাবণ, ১৩৬৮।

আধুনিক রান্নাঘর

আজকাল মানুষের সময়ের মূল্য যথেষ্ট। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল যথেষ্ট, মেয়ে বৌও ছিল অনেক, তাদের উপর পালা করে রান্না করা, দেওয়া থোওয়া ইত্যাদির ভার ছিল। সাধারণতঃ মেয়েদের তখন রান্না করা বাসন মাজা, ঘর নিকানোর কাজই ছিল প্রধান। এর চেয়ে বেশী তাদের কাছে কেউ আশা করত না। অবশ্য মুড়ি ভাজা, ধান কোটা, ধান সেদ্ধ করা, নানারূপ ফসল ঘরে তোলা এ সব ভারী কাজ তাদের অনেককেই করতে হতো। তারপর বার মাসে তের পার্বণ তো ছিলই, তবে পরিবারে লোকসংখ্যাও ছিল প্রচুর।

এখন একটি ছোট পরিবারে একটি গৃহিণীকেই একাধারে সংসারের বহু দাবী মিটাতে হয়। রান্না ছাড়াও খাবার করা, দোকান করা, প্রয়োজনমত ডাক্তারের কাছে যাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়িত করা, ছেলেদের পড়ানো, কখনো কখনো চাকুরী করা। তাই আজ তার পক্ষে ষোড়শোপচারে রান্না করা ভীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া ধোঁয়া এবং কয়লা কাট ছাই ইত্যাদি নোংড়া জিনিস ঘাঁটা রান্নাঘর সম্বন্ধে ভীতি উৎপাদন করে। এ বিষয়ে হিটার সত্যি বড় আরামদায়ক। ধোঁয়া নোংরা তো নেই-ই, যে কোন মুহূর্তে আগুন তৈরী। খরচ একটু বেশী হলেও আমার মনে হয় ছোট পরিবারে এটি অত্যাবশ্যক জিনিস। হিটারে রান্না করলে রান্নাঘরের ধোঁয়া ঝুল কমে যায় বলে রান্নাঘর এমনি অনেকটা পরিষ্কার থাকে। তার উপর নিজেরা একটু যত্ন নিলেই রান্নাঘরখানা একেবারে ঝকঝকে তকতকে রাখা সহজ হয়। আর সুন্দর রান্নাঘরে বাড়ীর কর্তা ছেলেমেয়েদের খেতে ভালই লাগে। সকলের সম্মেলনে রান্নাঘরখানা হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। হিটারে অল্প সময়ের ভেতর অল্প খরচে স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজনকে এটা সেটা রান্না করে খাওয়ানো চলে। তাতে যে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি তা আর কোন মেয়েকে বলে দিতে হবে না।

হিটারে প্রয়োজনমত শোবার বা বসবার ঘরে ফ্যানের নীচে অল্প হাওয়ায় বসে সকলের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাবার চা ইত্যাদি তৈরী হতে পারে। গৃহিণীর পরিশ্রম এতে গায়ে লাগে না, উপরন্তু প্রিয়জনের সঙ্গ-সুখ পেতে পেতে নিজ হাতে তৈরী খাবার তাদেরকে পরিবেশন করে প্রচুর আনন্দ পান। এই সঙ্গে যদি কিছু কাঁচের বাসন কিছু এলুমিনিয়ম বা কলাই করা বাসন করে নেন তবে মাজার হাঙ্গামাও অনেকাংশে কমবে। একটু সাবান-ন্যাকড়াতে ধুয়ে ফেল্লেই পরিষ্কার। এতে গৃহিণী নিজেই সংসারের অনেক কাজ করতে পারেন এবং অনেক টাকার সাশ্রয় হয়। আর মাকে করতে দেখলে ছেলে-মেয়েরাও কিছুটা স্বাবলম্বী নিশ্চয়ই হবে। অন্ততঃ ওরা এটা বুঝবে এ কাজগুলি করণীয়। আজকাল নানা কারণে বাধ্য হয়ে অনেক পরিবারে রান্নাবান্নার কাজটাও ঝি-চাকরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে রান্না বা সংসারের অন্যান্য কাজ যতটা সম্ভব নিজেদেরই যে করণীয় সে শিক্ষা ছেলেমেয়েরা পায় না। তাই 'ছুটির হিড়িকের মত গল্প' আজকাল অনেক বাড়ীতেই বাস্তবে দেখা যায়। একদিন ঠাকুর-চাকরের অনুপস্থিতিতে গৃহিণীরা চোখে সর্ষেফুল দেখেন, বিপর্যয় কাণ্ড বেধে যায়। অথচ সংসার-জীবনে এটা অপরিহার্য বিষয়। প্রতিটি মেয়ের সুষ্ঠুভাবে সংসার করা শেখা অতীব প্রয়োজনীয়। যার নিজের করার প্রয়োজন হয় না তিনিও যদি নিজে কাজটি জানেন ঠাকুর-চাকরকে দিয়ে সেইমত করাতে পারেন। নয়ত নিজেরাই হয়ে পড়েন ঠাকুর-চাকরের হাতের পুতুল। ভাল জিনিস বাড়ীতে এলেও ভাল রান্না হয় না। আর গৃহিণী যে কত বড় একটা আনন্দ হতে বঞ্চিত হন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আর যাদের লোক রাখার সঙ্গতি নেই অথচ নিজেরাও জানেন না বা পারেন না তাদের তো দুর্দশার সীমাই নেই।

সংসারে খরচ আজকাল এত বেশী, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত খরচ এত অত্যধিক যে, খুব কম লোকেরই ঠাকুর-চাকর রাখার সাধ্য থাকে। তবু অনেকেই আজ আর রান্নাঘরে যেতে যেন রাজী নন। তারা হতে চান মন্ত্রী, অধ্যাপক, পাইলট রাষ্ট্রনায়ক। এ সবও হওয়া দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু সকলেই তো আর সব রকম কাজের উপযুক্ত হতে পারেন না। আমরা চুনো পুঁটিরাও তো আছি। তাই আমাদের মেয়েদের জন্য বহু বিষয়ের সঙ্গে রান্না বিজ্ঞানও কম্পানুসারী হওয়া দরকার। তা বলে সেকেলে রান্নাঘরে নয়, আজকের দিনের বিজ্ঞানকে সম্বল করে সব রকম সুবিধাযুক্ত আধুনিক

রান্নাঘর। হিটার, জল না ছড়িয়েও ধোয়া-ধুয়ি করার একটা সুব্যবস্থা যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক সুবিধা, সময় সংক্ষেপ চাই, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চাই। কাঁচের বা কলাই করা বাসন। প্রথমে খরচ কিছু মনে হলেও শেষে সুবিধাই বেশী পাবেন। মসলা বাটা একটা সমস্যা বটে, গুঁড়ো মসলার রান্না তেমন রসাল হয় না। তবে অনেকেই আজকাল বেশী মসলা পছন্দ করেন না। গুঁড়ো হলুদ অবশ্য ভালই চলে।

প্রতিটি জিনিস সাঁতলানো আমাদের রান্নার একটা বিরাট সময়-সাধ্য ব্যাপার। মাদ্রাজী মেয়েদের দেখেছি রান্নার ব্যাপারটাকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে। অথচ সংসারের জন্য কি অসম্ভব পরিশ্রম ওরা করে। ছেলেরা শুধু টাকা এনেই খালাস। সন্তান পালন, রান্না করা, র‍্যাশন আনা, বাজার করা, ওষুধ আনা, বাগান করা সবই মেয়েরা করে। ঠাকুর তো একটি মাদ্রাজীকেও রাখতে দেখিনি, তা কর্তা যত টাকাই মাইনে পাক। চাকর কোন কোন বাড়ীতে রাখে বটে, শুধু বাসন ধুয়ে দেবার জন্য। মেয়েরা নিজেরাই মসলা গুঁড়ো করে রাখে। রাত্রি ৪-৩০ মিনিটের সময় উঠে ওরা দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করে। অতি নিয়মিত বলে ওদের স্বাস্থ্যও ভাল। ২।৩টি কাঠ-কয়লার উনোন এক সঙ্গে ধরিয়ে একটিতে ভাত একটিতে টক (চারুপানী), আর একটিতে হয়তো কিছু বেগুন বা ঝিঙে বা লাউ, অর্থাৎ একটা তরকারী একটু সিদ্ধ করে নিয়ে তিল তৈল ও মসলার গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিলে। তারপর পাতে ঘি এবং ঘোল ও নানারূপ আচার বা চাটনী-সহযোগে ভাত খায়। নানারূপ কাঁচা চাটনী ওরা তৈরী করে। বেশ অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ীতেও এই ব্যবস্থা দেখেছি। রান্নায় সময় কম লাগে বলেই মাদ্রাজী মেয়ে এত কাজ একা করতে পারে।

তা বলে আমাদের রান্না এত সংক্ষিপ্ত করতে চাই না। একেইতো ভোজনবিলাসী বাঙ্গালীর আজকাল ভোজনের সামগ্রীর নেহাৎ অভাব, তাও যদি আবার আমারা রান্না সংক্ষিপ্ত করি তবে উপায় নেই। তাই খুদ-কুঁড়ো যেটুকুই জুটুক সেইটুকুই আমরা যত্নসহকারে নিজ হাতে রেঁধে দিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, খরচও কম হবে। তা বলে বহির্বিশ্বের ডাকও আজ আর আমাদের উপেক্ষা করা চলে না, তাই চাই দুটোর সমন্বয়।

যুগান্তর, রবিবার ১২ই কার্ত্তিক ১৩৬২।

শিশু প্রসঙ্গ

শিশু শিক্ষা আজ এক বিরাট সমস্যা। কিছুদিন আগেও শিশু-শিক্ষা নিয়ে মানুষ তেমন মাথা ঘামাতো না। মা বাবা তো শিশুর দিকে মোটেই নজর দিতেন না। ঠাকুদা-ঠাকুমার কাছেই শিশু মানুষ হতো। তার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। খরচও ছিল না। প্রকৃতির নিয়মেই শিশু বেড়ে উঠতো। তার ভিতর দু চারজন প্রকৃতই মানুষ হতো। আজকের অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন। আজ চেষ্টার ত্রুটি নেই, বরং শিশুকে প্রকৃত মানুষ করার আগ্রহে বহু বাবা মা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। তবু শিশুর মনুষ্যত্ব লাভ যেন ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে।

প্রতিটি মা বাবাই চান তাদের শিশু শ্রেষ্ঠ হোক। এক হিসেবে শিশুই তাদের ভবিষ্যৎ, শিশুই পরকাল। এহেন শিশুকে মানুষ করার জন্য মা-বাবা সর্ববিধ ক্লেশ সহ্য করবেন। এটা আশ্চর্য নয়।

তবে কেন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে?

আমার মনে হয় শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

আজ একটুকু বয়স থেকে শিশুর আড়ম্বরের আর প্রাচুর্যের শেষ নেই। সাধ্যের বাইরে খরচ করে তাকে মানুষ করার চেষ্টা করা হয়। তার গড়ে ওঠার চেয়েও প্রতিটি মা বাপের চেষ্টা থাকে তাকে গড়ে তোলার। নিজের জীবনে যে সব সাধ অপূর্ণ থেকে যায়, ছেলেমেয়েদের জীবনে তা পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন; ভুলে যান, ছেলে-মেয়েদের জীবন আর তাদের জীবন এক নয়। ঘা খেয়ে তারা যে বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন, শিশুর সে সত্য তার মূল্য উপলব্ধি করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বরং মা বাবার নিষেধকে শৃঙ্খল বলে ভাঙার আগ্রহ তাদের বেড়ে যায়।

মা-বাবা টেনেই যেন শিশুকে বড় করে তুলতে চান। তাদের শ্যেন দৃষ্টির সম্মুখে শিশুর তিন বছর সাড়ে তিন বছর বয়স হতে না হতে আরম্ভ হয় শিক্ষা। শিক্ষা মানে একটু আধটু আরম্ভ করা নয়, রীতিমত কয়েক ঘণ্টা ধরে তাকে পড়ানো হয়। ক্রমে বাড়তে থাকে তার বইয়ের সংখ্যা। এর ভিতর একটু এদিক সেদিক হলে আর রক্ষা নেই। পড়ার ভিতর নেই কোন আনন্দের ব্যবস্থা।

সাধারণত মা-বাবা আজকাল নিজেরাও বড় একটা পড়ান না। শিক্ষকের হাতে ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দিয়ে কর্তব্যমুক্ত হন। বহু টিউশনি করে ক্লান্ত শিক্ষকের ছাত্রের সঙ্গে হাসি গল্প করার সময় বা মন কোনটাই থাকে না। তিনি সহানু-ভূতিহীনভাবে ছাত্রকে পড়ার ত্রুটির জন্য তিরস্কার করেন। বাবা-মাকে বলে দেবার হুমকি দেন। ফলে শিশুদের বই হয়ে ওঠে বিভীষিকা। ওরা দেখে, পড়ার জন্যই ওদের যত দুর্গতি।

স্কুলেও তদবস্থাই। বহু শিফটে কাজ করে করে ক্লান্ত শিক্ষক কোনও রকমে দায় সারেন। ছাত্র সংখ্যাও প্রায় আয়ত্তের বাইরে। ফলে, পড়ার সঙ্গে পরিচয় শিশুর আরও কমে যায়। এদিকে সংসারের আবর্তে মুখ দিয়ে গেজলা-ওঠা বাবা-মা যখন দেখলেন ছেলে ফেল হল, তখন তাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। তারাও আজ বড় অসহায়। অধিকাংশেরই নিজেদের বাড়ি গিয়েছে। চাকুরি মাত্র ভরসা। আজকের এই ব্যয়-বাহুল্যের দিনে চাকুরির টাকায় খেয়ে থাকাই দায়। তার উপর এক একটি শিশুর শিক্ষার জন্য কি অসম্ভব ব্যয়! তা ব্যর্থ হলে খেপে যাওয়াই স্বাভাবিক।

যে শিশু একবার ফেল হল, সে অমনি অপাঙক্তেয় হয়ে গেল। স্কুলে, বাড়িতে, সহপাঠীদের কাছে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার শেষ থাকে না। শিশু অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। সে কেবলই ভাবতে থাকে, "আমি আর পাশ করতে পারব না।" কেউ সহানুভূতি নিয়ে তাকে বোঝাতেও যায় না।

এই কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে শিশুর মাথা নুয়ে পড়ে। খুব কম শিশুর পক্ষেই তা ঝেড়ে ফেলে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। সে বাবা মা, শিক্ষক, প্রতিবেশী, সহপাঠী সকলের কাছেই অপদার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সত্যি কি তাই? এখানে শিশুর অপরাধ কতটুকু?

পড়া তো ওষুধ নয় যে চোখ কান বুজে ঢক করে গিলে ফেললাম। 'পড়ো' বললেই পড়া হয়? আমার মনে হয়, শিশু যদি পড়ায় না পারে সেজন্য দায়ী তার বাবা, মা, শিক্ষক ও আবহাওয়া। তাঁদেরই কোথাও গলদ আছে।

পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও ক্রমশঃ এত বেড়ে যাচ্ছে যা ভালভাবে পড়ে ওঠা শিশুদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। আমরা চাই বহুবিধ পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে, শিক্ষার মান বাড়িয়ে ছেলেদের পণ্ডিত করবো। ফলে বিশ্বকবির 'তোতা কাহিনী'-র মতই আমাদের ছেলেদের পেটে বিদ্যা গিস্-গিস্ করে। অবস্থা যা দাড়িয়েছে 'রা' বন্ধ হতেও আর বেশী দেরী নেই।

কথা উঠতে পারে, "সব শিশুই কি পড়ায় বিমুখ হয়?" না তা হয় না। মুষ্টিমেয় ২।৪ জন এমনি ভাল হয়। ২।১ জন প্রতিভা নিয়েই জন্মায়। তাই ৭৫ হাজার ৮০ হাজারের মধ্যে দেড় হাজার পৌনে দুই হাজার ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে যায়। সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের নিয়ে আমার কথা নয়। যারা অবহেলিত, তাদের নিয়েই আমার কথা। এই দুর্ভাগাদের জন্য সকল দুয়ার বন্ধ।

এ পর্যন্ত যা বললাম তা সবই শিশুদের পড়া নিয়ে। শিশুদের চরিত্র সম্বন্ধে সেই একই কথা। মুশকিল হয়েছে, শিশুদের ন্যায় অন্যায় আমরা কখনও ওদের মাপকাঠিতে বিচার করি না। আমরা বিচার করি আমাদের মাপকাঠিতে। ফলে বিচার ওদের ওপর অত্যাচার হয়ে দাড়ায়। ওরা হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর। সহজ পথে খেলাধুলা করতে না পেলে ওরা বাঁকা পথ ধরতে বাধ্য। খেলার নেশায় মিথ্যা বলতে পারে। সেজন্য তিরস্কার করলে খেলা বন্ধ করবে না, বরং লুকিয়ে খেলার নেশায় মেতে উঠবে।

বাবা-মা যদি মাঝে মাঝে শিশুদের উপযোগী ছবি তাদের দেখিয়ে আনেন, তবে ছেলেমেয়েরা সাধারণত পয়সা চুরি করে সিনেমা দেখতে যাবে না এটা ঠিক।

শিশুরা কোন অন্যায় করলে তা অপরকে বলে বেড়ালে তারা খুবই বিরক্ত হয়। আর সে কাজ দ্বিতীয়বার করতে এতটুকু দ্বিধা করে না। কিন্তু নিজেরা তিরস্কার করে অন্যকে জানতে না দিলে শিশু অভিভাবকের উপর কৃতজ্ঞ থাকে।

ওরা কোন কাজ করে এলে আমাদের মনঃপুত হয় না। হয়ত ফেলে ছড়িয়ে কিছু করে এলো। আমরা ভুলে যাই, আমাদের মাপকাঠিতে ওদের বিচার করলে চলবে না। ওরা প্রথম শিখছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি ত থাকবেই। শিশুর প্রতি এতটুকু অবহেলাও যেমন দেখাতে নেই, তেমন ওদের উপর বেশী নজর দেওয়াও খুবই বিপজ্জনক। অতিরিক্ত আঁকরিয়ে থাকলে না হয় শিশু স্বাবলম্বী, না হয় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আবার এ খুব সত্যি যে, শিশু যদি কোন ভাল কাজ করে তবে তার প্রশংসা করা উচিত। আমরা প্রশংসা না করলে কী করে তার ভাল কাজে উৎসাহ আসবে।

অনেক অভিভাবকই বলেন, প্রশংসায় ছেলে খারাপ হয়। শুধু দেখা দরকার, প্রশংসাটা যেন সত্যি হয়। আজকাল আবার অনেকেই শিশুর উপর অতিরিক্ত নজর দেবার দরুণ তার কোনও জিনিস নিয়ে নিবিষ্টভাবে খেলা করা হয়ে ওঠে না। ফলে তার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে ওঠে চঞ্চল।

শিশু-মনস্তত্ত্ব শিক্ষার ক্লাস করলে বেশ হয়। ভবিষ্যৎ পিতা মাতারা ট্রেনিং নিয়ে শিশুদের চালনা করলে আর এত অঘটন ঘটে না। বিশেষ যখন প্রথম মা হয়, তখন ত প্রায় কারোই শিশু সম্বন্ধে কিছুই জানা থাকে না। তাই থেকে যায় অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি।

মা-বাবার অজ্ঞতার দরুণ যখন শাসন করা দরকার তখন স্নেহের আতিশয্যে শাসন না করা; আর যখন স্নেহ করার দরকার তখন শাসন করায় যে বিষম ক্ষতি হয় তা আর সমস্ত জীবনেও পূরণ হয় না। ফলে মা, বাবা, শিশু এবং তাদের আওতায় যারা থাকেন সবাই সমস্ত জীবন দুঃখ পান।

প্রতিমা গড়ার সময় যদি শিল্পীর ভুলে প্রতিমা বিকৃত হয়, একবার তৈরি হয়ে গেলে আর কি তা সংশোধনের উপায় থাকে? যে আগুন আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে, সেই আগুনই আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সব ধ্বংস করে। জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই চাই সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য হারালে পতন অনিবার্য। *

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার
রবিবার ১৯শে আশ্বিন ১৩৬৪।

শিশু-সদন

সেদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখি, বন্ধু ও তার স্বামী মহাশয় মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন।

কী ব্যাপার অজিতবাবু অফিসে যান নি ?

ম্লান হেসে বন্ধু বললে—ভাই বড় বিপদে পড়েছি ছেলেটাকে নিয়ে, তুমি বস।

চমকে উঠি—খোকন ? কেন, কী হয়েছে তার ? বলেই অদূরে চেয়ে দেখি, শ্রীমান একটি হাঁসের ঠ্যাং প্রাণপণে দন্তহীন মাড়ি দিয়ে চিবুচ্ছে।

নন্দা জবাব দেয়—হয়নি কিছু। আমার ছুটি তো কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে, এতদিন কেবলই ছুটি বাড়িয়ে নিচ্ছিলাম। এমন করে করে ৬ মাস কাটলো। কিন্তু এখন আর ৭ দিনের ভিতর জয়েন না করলে চাকুরি থাকবে না। কী করি বল তো ? ঝি-চাকরের হাতে ওকে প্রাণে ধরে তুলে দিতেও কোনমতেই মন সায় দিচ্ছে না। আমরা দুজন থাকবো অফিসে। যার কাছে খোকনকে রেখে যাব, সে নিশ্চিন্তমনে ওর কী অনিয়ম করবে, নোংরা হাতে অসময়ে কী খাওয়াবে তার ঠিক আছে ?

চুপ করে থাকি। কী জবাব দেব ? বাস্তবিক এ একটা সমস্যা বটে। আরও দু'জনকে দেখেছি, এ সমস্যায় বিব্রত হতে। একজন শেষ পর্যন্ত শিশুকে ঝি-চাকরের হাতে তুলে দিয়ে কাজে যেতে পারেননি। ফলে অসম্ভব আর্থিক দুর্গতিতে ভুগেছেন। অন্যজন ছুটি নিয়ে নিয়ে যখন দেখেছেন, আর ছুটি নেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় তখন জয়েন করেছেন বটে কিন্তু মোটেই মন দিতে পারেননি কাজে। কাজে গিয়েও কেবলই ভাবেন শিশুর কথা। ফলে অফিসের কর্তার কাছ থেকে বার বার সাবধান বাণী শুনেছেন।

এতদিন মেয়েদের কাজ ছিল, গুছিয়ে সংসার করা। এর বেশী তার কাছে কেউ দাবি করতো না। যে মেয়ের কর্মশক্তি ছিল বেশী, যার প্রতিভা ছিল নানা দিকে, সে হয় তো পাট দিয়ে সিকা তৈরী করতো, কাঁথায় নকশা তুলতো, কুলোয় পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করতো গল্পে কথায় বা ছড়া কেটে মেয়ে-আসর জমাতো। এর

বাইরে যাবার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। সমাজও এর চেয়ে বেশী মেয়েদের কাছে আশা করেনি। বরং তাদের ঘরের কোণে আটকে রাখতে পারলেই নিশ্চিন্ত হত। যত দুর্দৈবই ঘটুক, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণেই তাদের বসে থাকতে হবে। বাইরে প্রলয় ঘটে গেলেও বেরানো তার চলবে না।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে শুধু ছেলেদের রোজগারে পরিবার চলা এখন প্রায় অসম্ভব। তাই দেখতে পাই বিবাহিতা, অ-বিবাহিতা মেয়ে আজ চাকুরি করছে। এক হিসেবে এটা খুবই ভাল হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও নারীর চোখের উপর তার অতি প্রিয়জন না খেয়ে মরলেও তার চোখের জল-ফেলা ভিন্ন আর কিছু করার ছিল না; বা অক্ষম স্বামীর স্ত্রীকে সমস্ত আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে ভাই-এর সংসারে ভাশুরের সংসারে রাত্রিদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হত। এদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা বর্ণনা করার ভাষা নেই।

আজ যদিও এ অবস্থা থেকে নারী কিছুটা মুক্তি পেয়েছে তবু বাধা-বিপত্তিরও শেষ নেই।

চাকুরি যদি বা জুটলো তা রক্ষা করা বিষম দায়। মাতৃত্বের গৌরবের সঙ্গে চাকুরির গৌরব যেন আদায় কাঁচকলায়। আজকাল ভাবী মায়েদের আগে একমাস ও পরে দু মাস ছুটি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তারপর চাকুরে মায়ের বাচ্চা রাখার কোনই সাধারণ ব্যবস্থা নেই। আয়া রাখা তো আমাদের শতকরা নিরানব্বুইটি বাঙালী ঘরে প্রশ্নই ওঠে না। একটি ঝি বা চাকর রাখলেও মোটা খরচ পড়ে, যা আমাদের অধিকাংশেরই সাধ্যের বাইরে। তা ছাড়া বড় কথা এই যে, ঝি বা চাকরদের শিশু সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নেই। এদের হাতে ঐটুকু শিশুকে ছেড়ে দিতে মায়েদের খুবই আপত্তি। ফলে বহু মাকে দেখেছি, বাচ্চা হবার পরে কার হাতে তার ভার দিয়ে যাবেন সে সমস্যায় প্রথমে কেবল ছুটি নিতে থাকেন। তারপর চাকুরি ছেড়ে দেন। এভাবে বা অনুরূপ কারণে অন্যান্য নারী-প্রতিভারও অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে।

আজকালের দুর্দিনে চাকুরি ছাড়া কী সাংঘাতিক! তা আবার বাচ্চা হবার পরে, যখন বাচ্চার জন্যই প্রচুর ব্যয় হয়। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে, আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের মত শিশুসদন গড়লে। সেখানে মায়েরা নিশ্চিন্তে তাঁদের বাচ্চাদের রেখে কাজে যেতে পারবেন। আর এতে আরও অনেক অশিক্ষিতা, অর্ধ-শিক্ষিতা মেয়েও কাজ পাবে। অশিক্ষিতাদের ছ'মাস

আট মাস শিশু সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়ে মোটামুটি কাজের যোগ্য করে নেওয়া চলে। এখানে দরকারও হবে বহু রকম লোকের। শিশুর দুধ বার্লি তৈরি করা থেকে তাকে খেলা দেওয়া, একটু বড় হলে খেলাধূলার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নেওয়া—কত ধরণের কাজের লোক দরকার।

আর এমন নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থানে শিশুকে রেখে যেতে পারলে মা নিশ্চিন্তে কাজে মন দিতে পারবেন। কাজ বেশী হবে, ভাল হবে। শিশুও শৃঙ্খলার ভিতর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সত্যিকারেরর মানুষ হয়ে উঠবে। ছোট-বেলা হতে বহু শিশুর সঙ্গে একত্রে মানুষ হবার দরুন শিশুর সামাজিক ব্যবহার মধুর হবে, অপরের সঙ্গে চলার যোগ্যতা আসবে। অতি ছোট বয়স হতে নিয়মের ভিতর দিয়ে চলায় নিয়মানুবর্তিতা তার মজ্জাগত হবে। তা ছাড়া আমাদের অনেকেরই এমন বাড়িতে বাস, যেখানে হাওয়া আলোর সঙ্গে প্রাচীন-কালের ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। সেদিন থেকেও শিশু একটি ভাল জায়গায় প্রতিদিনের অনেকটা সময় কাটিয়ে এলে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। তাই মনে হয়, আমাদের দেশেও শিশু সদন গঠন করা খুবই দরকার। সরকার এদিকে একটু নজর দিলে বহু মেয়ের জীবিকার সংস্থান ও বহু রকমের নারী-প্রতিভার বিকাশ হবে, বহু সংসার বেঁচে যাবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ শিশুরাও সত্যিকারের মানুষ হবার সুযোগ পাবে। আমাদের দেশে আজকাল কিণ্ডার গার্টেন বা অনুরূপ শিশুবিদ্যালয় অনেক হয়েছে। সেখানে একটু বড় না হলে শিশুদের দেওয়া যায় না। আর তাদের সময় অনুসারে শিশুদের পাঠাতে ও আনতে হয়।

শিশু-সদন গঠিত হলে মায়েরা তাঁদের সময়মত শিশুদের রাখতে পারবেন। এদিকে আজ নজর দেওয়া সত্যিই দরকার। তাতে শিশু মা, সংসার এবং পরিবারের অর্থ-সমস্যার সমাধান হবে। *

* রবিবাসরীয় আনন্দবাজার
রবিবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৪।

আমাদের ঘরোয়া কথা

"রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব গো"...

কে যেন গেয়ে চলেছে। শুনে মনে হল মেয়েদের ব্যাপারেও কি এ কথাটা খাটে? কিন্তু তখনই মনে হল এটা সম্পূর্ণ ভুল। আজ নারীর আন্তরিকতায় বা ভালবাসায় পুরুষকে ভোলাবার সুযোগ সুদূর-পরাহত। সেখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই: কনে দেখার ব্যাপার বরাবরই জটিল ছিল। আজকাল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী মানুষ ব্যাপারটাকে আরো জটিলতর করে তুলেছে।

পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, পরমা সুন্দরী, প্রকৃত গৌরবর্ণা, অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ পাত্রী চাই। যৌতুক তো থাকবেই। কি সর্বনাশ। বাংলা দেশে গৌরবর্ণা মেয়ে কয়টি বলুন তো? আজও শিক্ষিত মানুষের বিচার হবে বর্ণ দিয়ে? যে বর্ণের ব্যাপারে আমাদের এতটুকু হাত নেই। বাইরের সুন্দরের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? অতি রূপবান মানুষও স্বভাবে কী ভীষণ কুৎসিত হয়ে ওঠে। আবার অতি কুৎসিত মানুষেরও স্বভাবে কতই না মিষ্টি লাগে। তখন তাকে অপরূপ মনে হয়। তা ছাড়া স্ত্রী কি ঘরের আসবাব? যার হাতে তুলে দিতে হবে সংসারের দায়িত্ব, ঐতিহ্য তার বিচার চেহারা দিয়ে; তারপর ভাবুন বেচারী পিতার কথা, মেয়েকে দীর্ঘদিন খাওয়াতে, পরাতে, উচ্চশিক্ষার গুরু ব্যয়ভার বহন করতে, পূর্বেই এক বিয়ের খরচ হয়ে গিয়েছে। এখন আসর সাজিয়ে, কনে সাজিয়ে, বৌভাতের খরচা বরের পিতার হাতে তুলে দিয়ে কন্যা পার করতে পিতার প্রাণটুকু পার হবার দাখিল। পূর্বে পৈত্রিক ভিটে বন্ধক দিয়েও কিছু টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হত, এখন সে গুড়ে বালি। ভিটে আছে কয় জনের?

আজও যদি বিয়ের বাজারে শুধু রূপ আর রূপেয়া ধরেই আমরা বসে থাকি তবে কোথায় থাকে আমাদের শিক্ষার গর্ব? পূর্বে আর একটু সুবিধে ছিল। চেনা জানার ভেতর অনেক বিয়ে হতো। তাতে মেয়ের চেহারা বা পাশ নিয়ে

তেমন আপত্তি ঘটতো না। বংশ বা অন্যান্য গুণে উৎরে যেত। ছেলের সম্বন্ধে মেয়ের বাড়ীর, মেয়ের সম্বন্ধেও ছেলের বাড়ীর লোক প্রকৃত সংবাদ পেত। চেনা, জানা ঘরে বিয়ে দিতে পারলে অনেকটাই নিশ্চিন্তি। আজ আগুন নিয়ে খেলা চলছে। তাই খবরের কাগজে এমন খবরও দেখা যায় যে, বিয়ের পরে নব-বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর পয়সা কড়ি নিয়ে উধাও। আজ আমরা কোথায়? অসম্ভব বলে আর কিছুই নেই।

মেয়েদের মনোবৃত্তিরও অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। কারো অধীন হবার কথা ভাবতেই পারে না। তারা ভাবে—বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে শুধু খাবে, সিনেমা দেখবে, বেড়াবে, নিত্য নূতন শাড়ী গহনা কিনবে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে আর কিছু করণীয় আছে বলে তারা জানে না এবং ধরেই নেয়—তাদের শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল হবে।

এদিকে বিয়ের নামে ছেলেদেরও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াব কী? যার তিনশত টাকা মাইনে সে ভাবে, পাঁচশত হোক, তখন বিয়ে করা যাবে। বৌ-পোষা কি চাট্টিখানি কথা! একাধিক পরিবারেই দেখি বিয়ের যোগ্য ছেলেদের বিয়ের কথা বললে জবাব দেয়, আজ কালের বৌ এসে তো তোমাদের কাজ করে দেবে না। তার চেয়ে তোমাদের কাজের লোক রেখে দিচ্ছি।

মেয়েরা বলে—পয়সা না থাকলে বিয়ে করে মরতে যাব কেন? চাকুরী করে খাব?

সক্ষম মেয়েরা চাকুরী করে খেলে এবং কাজের লোক রেখে সংসার চালালেও জীবনের বহু সমস্যাই বাকী থেকে যায়। তাই আবার সম্বন্ধের খোঁজ করতেই হয় এবং তা হয় খবরের কাগজের মাধ্যমে। দু-পক্ষেই নিক্তি নিয়ে বসে থাকেন। কনে পক্ষের চাই অফিসার; নয়ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা চার্টার্ড একাউণ্টেন্ট। আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই, যেন মেয়ে সুখী হতে হলে এগুলি অপরিহার্য।

আর বর পক্ষে প্রকৃত সুন্দরী, অন্ততঃ ম্যাট্রিক, যেন এই মানুষের পরিচয়ের একমাত্র মাপ কাঠি। তারপর নগদ ৫।৭ হাজার তো চাই-ই। আজকাল ক্বচিৎ কখনো দু' একজন মহৎ লোক দেখা যায় যাঁরা বলেন—দাবী নেই। এটা খুবই আনন্দ ও গর্বের কথা। কেউ বা আবার দেখে শুনে এমন সম্বন্ধ করেন যেখানে পাওয়া যাবে প্রচুর। সেখানে নিজের মহত্ব

বজায় রাখতে আপত্তি কী? বলেন—আমার কোন দাবী নেই। এও মন্দের ভাল। অন্যের মহত্ত্বকে প্রকাশ করার সুযোগ দেন।

আজকাল শিক্ষিতা মেয়ে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্বামীদের চলতে হয় দেশে, বিদেশে। সেখানে নানা ভাষা নিয়ে কারবার, তার উপর প্রয়োজন-বোধে চাকুরি করা, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য অন্ততঃ ম্যাট্রিক-পাশ দরকার নিশ্চয়ই। তাছাড়া আজকাল সহধর্মিণীর চেয়েও সহমর্মিণীর প্রয়োজনই বেশী।

তবু সব জিনিসেরই বুঝি সীমা আছে। ট্র্যাজেডিটা বুঝুন, একটি বড় বংশের মেয়ে মা মারা যাওয়ায় ছোট ছোট ভাই-বোনেদের মানুষ করতে হয়, সংসারের সমস্ত দায়িত্বই এসে পড়ে তার ঘাড়ে। শিক্ষিত বাপ পরম যত্নে মেয়েকে যেটুকু লেখাপড়া শেখান, সেটুকু তুচ্ছ নয়। তার চলার পথে যথেষ্ট পাথেয়। দেখা যায় বিয়ের বাজারে মেয়েটি একেবারে অচল। ম্যাট্রিক পাশ নয় শুনে কেউ আর দেখতে আসারও দরকার মনে করে না। ঘটনাক্রমে এলেও চা-জলোযোগ করাই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাড়ায়। একটি পরিচিত পরিবারে মেয়েটির সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করা হয়। হৃদয়ের সম্পদ, সাংসারিক কাজে পটুতা জানা সত্ত্বেও শুধু ম্যাট্রিক পাশ নয় বলে সে পরিবারও নাকচ করে দেয়। পূর্বের অঙ্গহীন মেয়েরও বুঝি এমন দুর্গতি হতো না। অথচ এই পরিবারের বড় বধূটি দেখতে সুশ্রী নয়, কিন্তু তার গুণে সমস্ত পরিবার এমন মুগ্ধ যে বৌ ছাড়া কেউ কিছু করার কথা ভাবতেও পারে না। কী করে তিনি ছাড় পত্র পেয়েছিলেন কে জানে! হয়তো কয়েক বছর আগে বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

এতো গেল ডিগ্রীর কথা। এবার বলি রূপের কথা। এক ধনীর দুলালী বড় হতেই বাবা-মা বিয়ের চেষ্টা করেন। মেয়েটি দেখতে কালো। তাই সহসা তার সম্বন্ধ জোটে না। মেয়েটি বলে—সে বিয়ে করবে না। এম, এস-সি, পাশ করে রিসার্চে লেগে যায়। বাবা-মা কত ঝুলোঝুলি বিয়ে দেবার জন্য। মেয়েটি রাজী নয়। আমরা সুখ্যাতি করি—বাঃ চমৎকার মেয়ে। কী হত বিয়ে করে। একদিন ওর এক বন্ধু ধরে পড়ে—হাঁরে তুই বিয়ে করবি না?

পাত্র কোথায়?

বেশ যা হোক! তোর পাত্রের অভাব! তুই আজ মুখের কথা খসালে কাল মাসীমা-মেশোমশাই ডজনখানেক ছেলে এনে হাজির করবেন।'

সে তো আসবে আমার বাবার দেওয়া জড়োয়া গহনা আর নগদ কয়েক

হাজার টাকা নিতে, আমাকে নিতে নয়। কেউ যদি কিছু যৌতুক না নিয়ে আমায় বিয়ে করে তবেই আমি বিয়ে করবো। নয়ত নয়।

সে দিন যেন মেয়েটিকে নূতন করে দেখলাম। তার বিয়ের উপর বিতৃষ্ণায় কারণ বুঝলাম। তাই বলছিলাম—গুণে ভোলাবার, হৃদয়ের সম্পদে ভোলাবার আগে চাই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ আর প্রকৃত গৌরবর্ণ। এটাই সংসারে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। এ না হলে সংসারের বাইরেই থাকতে হবে চিরকাল। *

ভারতবর্ষ : বৈশাখ ১৩৬৮ : মেয়েদের কথা।

আমাদের উৎসব

সেকালের উৎসব ছিল বেশীর ভাগ ধর্ম সম্বন্ধীয়। বার মাসে তের পার্বণ। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি নিয়মিত অজস্র দেব দেবীর পূজা ছাড়া আরও কতকগুলি দেখা দিত প্রয়োজনের তাগিদে। প্রতিটি পূজারই সার্থকতা ছিল ব্যাপক। গরুর বাছুর হয়েছে অমনি ত্রিনাথের মেলা করতে হবে। অর্থাৎ ঐ নূতন গরুর দুধে ক্ষীরের নাড়ু করে পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকে পূজার নামে আনন্দ করে সবাই মিলে খাওয়া। গাছে কলার কাঁদি পড়লেই নারায়ণ সেবার ইচ্ছা হত। সবাই মিলে সিন্নি মেখে ঐ কলা খাওয়া, সকলে এক সঙ্গে আনন্দ করা। অগ্রহায়ণ মাসে নূতন চাল, খেজুরী গুড় দেখা দিলেই আরম্ভ হত নবান্নের উৎসব। ঘরে ঘরে সে কী আনন্দ। সকলে মিলেমিশে খাওয়া। গ্রীষ্মের ফলপাকুড় দেখা দিলে ঠাকুরকে শীতল দেওয়া হত। এমনিতর প্রতিটি উৎসবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হত। প্রতিটি পূজায় বহু লোকের সহিত যোগ ছিল, ছিল প্রাণের পরশ।

একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকতো। সেখানে প্রাত্যহিক পূজা হত। সেই সঙ্গে ছিল ন্যায়, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও কর্ম। বাড়ীর বালিকাটিও ঘুম থেকে উঠে ফুল দুর্বা তুলতো, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঘর মোছা, প্রয়োজনে পূজার আয়োজন সবই করতে হত। ভাল ফলটি দেখলেই টপ্ করে মুখে পুরে দেবার কথা কল্পনাও করতে পারত না। কেউ। জানত সেটি ঠাকুরের নৈবেদ্যে লাগবে এবং আর পাঁচজনকে প্রসাদ দিয়ে তার ভাগ্যে এক টুকরা পড়তে পারে, নাও পারে। সেজন্য তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। এই ত্যাগ, এই সংযমই বুঝি উত্তরকালে তাকে দিতে শেখাতো। নিজের কথা নিজে ভাবার অবকাশই মিলতো না।

এসব উৎসবের জন্য আর্থিক প্রয়োজনও ছিল খুবই কম। বেশীর ভাগ ফল-পাকুড, কলা, শশা, নারিকেল, বেল ইত্যাদি বাড়ীতেই হত। চাল ডালও অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের জমির ছিল। সর্বোপরি ছিল সহৃদয় আন্তরিকতা,

মনে ছিল আনন্দ। সমালোচনার মনোভাব নিয়ে কেউ আসতো না। যা পেত তাতেই খুসি হত সবাই, নিজেদের উৎসব বলেই মনে করতো। উৎসবের উদ্যোক্তাদেরও পূর্বে বা পরে আর্থিক সমস্যায় মাথায় হাত দিয়ে বসতে হত না বলে আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে বাধা হ'ত না।

বিয়ে-চুড়ো উপলক্ষ্যে আসত কাশীর ঠাকুমা, বরিশালের মাসী, মৈমনসিং এর দিদি, দিল্লীর পিসী। বহুদিন পরে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হত। সংসারের এক ঘেয়ে খাটুনী হতে সবাই জুরোত জিরোত। এসব কাজের বাড়ী এসে যে সবাই বসে থাকত তা নয়। সবাই প্রবল উৎসাহে কাজ করত যোগ্যতা অনুসারে। কেউ পিঁড়ি কুলো চিত্রণ করতে বসে যেত, কেউ আলপনা, কেউ বা গানে আবার রান্নায় বা কেউ এমনিতর বহুবিধ কাজ স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে কোরে যথেষ্ট সুখ্যাতি আর আনন্দ অর্জন করতো। তারপর পনের দিন বা একমাস থেকে সামান্য উপহার দিয়ে একখানা নমস্কারী শাড়ী নিয়ে বিদায় নিত!

আজ আমাদের অবস্থা অতীব করুণ। জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই। তুচ্ছাতি তুচ্ছ জিনিসটি সংগ্রহ করতেও দম বেরিয়ে যায়। সোজা পথে কোন কিছুই পাবার উপায় নেই, সব ঘোরা পথে সর্বরকমে নাজেহাল অতৃপ্ত মানুষ তবু বাঁচতে চায় উৎসবের মধ্যে। সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দশা একপাশে সরিয়ে রেখে আমরা উৎসব করি। উৎসবে যোগ দিই কিছুক্ষণ আনন্দ করতে। হাসতে চাই, হাসাতে চাই। কিন্তু সে চাওয়া বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এখন উৎসব বলতে আছে বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কালীপূজা, ও সরস্বতীপূজা। পূজা এলেই অভিভাবকদের হৃদকম্প আরম্ভ হয়, ভাবনা কী করে পূজার মাসের খরচ চালাবেন? কয়েকটি পূজার চাঁদা, দেখতে যাবার খরচ, ঠাকুরের কাছে ভোগ দেয়া, তা আবার এক আধখানায় চলবে না। তার উপর কম্পিটিশন—কে কত দামী কিনতে পারে। অনেক কোম্পানিতে এ সময় বোনাস্ দেয় বটে, তবু ব্যয়ের তুলনায় সে কিছুই নয়। আর যাদের বোনাস নেই তাদের তো সোনায় সোহাগা। এড্‌ভান্স নেয়। পূজার আনন্দ বলতে ঠাকুর দেখে ঘুরে বেড়ানো, এই হল দুর্গোৎসব। এরপর আছে বিজয়া, সেটাও পূর্বের মত অনাড়ম্বর নয় যে নাড়ু মোয়ায় হবে। চাই দোকানের নানাবিধ মিষ্টি, বাসি হোক, ছানার বদলে ময়দা থাক, তবু এ না হলে বিজয়া হবে না। উৎসবের প্রাণ হল মাইক। আর পূজার সার্থকতা হ'ল মন্ত্রী উপমন্ত্রীর উদ্বোধনে।

এরপর আছে কালী পূজা ও সরস্বতী পূজার চাঁদার জন্য এসে লোক দাঁড়ায়।

এও একাধিক, কালীপূজা মিটতেই আবার ভাই ফোঁটা দেখা দেয়। আর আছে জন্মদিন, এ্যানিভার্সারি ডে, অন্ন-প্রাশন, বিয়ে ইত্যাদি।

এসব উৎসবের আমন্ত্রণ পেলে সকলের আগে মনে পড়ে আর্থিক দিক। তারপর আর কোন আনন্দ জাগে না। জাগে আতঙ্ক। উৎসবে গিয়ে দু'দিন থেকে আসার প্রশ্ন তো একেবারেই অবান্তর, সবার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে আসতে হয় গাড়ী না পাবার তাড়ায়, উৎসব দেখে আসাও অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। নিমন্ত্রণের নামে মস্ত ঠাট্টা, খাওয়া নয়, খাওয়ার প্রহসন। অনেক ক্ষেত্রেই ডিস্ হয়। সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে, গাড়ী ভাড়া দিয়ে, তারপর ঘরে এসে রেঁধে খেতে উৎসবের আনন্দ ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই ভোগ হয়। নিমন্ত্রণের দক্ষিণা বড় প্রাণান্তকর।

সাধ্যের অতিরিক্ত দেয়াটাই আজ রেয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেও প্রতিযোগিতা কে কত দামী জিনিস দিতে পারে। ফলে আনন্দের প্রশ্ন তো ওঠেই না ; উপরন্তু আছে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, আর্থিক দুর্গতি।

এই-ই আজ আমাদের উৎসবের রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশকেই জিজ্ঞাসা করে শুনেছি, 'হঁ্যা বিয়ে তো হবে, দেবে যে কী? সামনে আরেকটা জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আছে। দিয়ে দিয়েই ফতুর হলাম। আর পারিনে।' বহু লোককেই একথা বলতে শুনি। তাই ভাবি, আজ আমাদের উৎসবটা কোথায়? উৎসবের নামে আরো খানিকটা দুর্গতিই কি আমরা ডেকে আনি না। কথায় বলে সাধ্যের বাইরে দান হয় না। আজকাল সাধ্যের ভেতর কিছু হয় না! তাই মানুষ মাত্রা ছাড়াতে ছাড়াতে কোথায় যে এসে দাঁড়িয়েছে—তা বুঝি সে নিজেও জানে না। আর উৎসব বলে যাকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই তাতে উৎসবের কোন মঙ্গল তো নেই-ই, আছে বিকৃত উত্তেজনা, আর পরে সীমাহীন অবসাদ।

* ভারতবর্ষ : পৌষ, ১৩৬৮।

শিশুর যত্ন

খবর পেলাম, বিমলারা কলকাতা বদলী হয়ে এসেছে। আর বিমলার একটি ছেলে হয়েছে। বড় সুখবর। বিমলা পুন্নামক নরকের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে কিনা জানি না, তবে বেচারী যে পর পর পাঁচটি কন্যা প্রসব করে চোরেরও বাড়া হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তা জানতাম। তদুপরি শাশুড়ীর বৌ এর কী ও পাঁচজনের কাছে ব্যাখ্যা ও বৌকে অন্তর টিপুনী দেওয়া তো আছেই। সুরেশবাবু স্ত্রীকে হয়তো গালি দিতেন না, তবে যখন তখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তুলে হা হুতাশ করতেন, তা বিমলার পক্ষে যে প্রীতিকর হত না, এ হলপ করে বলতে পারি। এর সবটুকু অপরাধ বিমলা নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে বেচারি আর মাথা তুলতে পারতো না।

খবর পেয়েই বিমলার বাসায় যাব যাব করেও কিছুদিন দেরী হয়ে গেল। রাজ্যের কাজ যেন ভীড় করে একের পর এক সময় বুঝে আমায় ব্যস্ত করে তুলেছিল। তাই যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ওদের বাসায় যেতে বেশ কিছু দিন দেরী হয়ে গেল।

আমায় দেখেই বিমলা সোল্লাসে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে ছেলে কোলে দিলে।

আমি দেখলাম শিশুটি বড় রোগা আর হাল্কা। এমন রোগা কেন বিমলা? বলতেই বিমলা কেঁদে ফেললো।

বললে, ভাই, কী বলব তোমায়, দেখেছ তো আমার মেয়েদের স্বাস্থ্য? ওদের আমি এতটুকু যত্ন করি না, ওরা যা পায় তাই খায়, যেখানে সেখানে শোয়, সময় মত একটা জামা পর্যন্ত গায়ে দেয় না, ভগবানের কৃপায় ওরা ভালই আছে। আর এই ছেলেকে আমি এতটুকু নামতে দিই না, সব সময় কোলে আছে। ওকে গরম জল ছাড়া কখনো স্নান করাই না, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমরা সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে শুই। তবু কী করে ওর ঠাণ্ডা লাগে, বল তো? আমাদের সাধ্যে কুলোয় না, তবু ওকে দুধ খাওয়াই। তবু পেট খারাপ ওর লেগেই আছে। চেহারা তো দেখছই। অথচ আমার মেয়েদের আট মাস দশ মাসে ভাত ধরিয়েছি। এ ভগবানের কেমন বিচার বল তো?

এক সঙ্গে এত কথা বলে বিমলা যেন হাঁপিয়ে পড়ে। গলদ কোথায়, এতক্ষণে বুঝতে পারি।

মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা ঘটনা। দু'জন মহিলাকে দেখেছিলাম মুরগী পুষতে। একজন লেগহর্ণ মোরগ রাখতেন আর দেশী মুরগী। ঐগুলি দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে কী যত্নই না করতেন! বাচ্চাগুলিকে আটকে রেখে খেতে দিতেন শাক, বাঁধাকপি, ছোটমাছ, গুগ্‌লি। মাঝে মাঝে নিজে গার্ড দিয়ে দিতেন এক-আধ ঘণ্টা। পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট দিয়ে ঘর ধুইয়ে দিতেন। রশুন খাওয়াতেন, কিন্তু কী আশ্চর্য দিনের পর দিন মড়ক লেগে সব একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতো। মহিলাও না-ছোড়-বান্দা, তিনি আবার নূতন উৎসাহে বিদেশী মুরগীর পোলট্রি করেন, বহু বই খরিদ করে এ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন, কিন্তু তবু জয়টিকা আর তার ভাগ্যে জুটলো না, প্রতিবারই মড়ক লেগে তাঁর বহু যত্ন বহু সাধনা ব্যর্থ করে দেয়।

দ্বিতীয় মহিলা পুষতেন কতকগুলি দেশী মুরগী। তিনিও অনেক বাচ্চা ফোটাতেন। আর বাচ্চাগুলি ২।১ দিন একটু গার্ড দিয়ে রেখেই ছেড়ে দিতেন মার সঙ্গে। ২।১টি বাচ্চা হয়তো চিলে কি বেড়ালে নিত—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাকী-গুলি দিব্যি বেড়ে উঠতো। ওরা দু এক মুঠো ভাত বা ধান মুরগীকে খেতে দিত। আর এন্তার বাচ্চা খেত ও ডিম ফোটাত। এঁর মুরগীর কখনো মড়ক লাগতে দেখিনি।

অযত্ন যেমন ক্ষতিকারক, তেমন অতিরিক্ত যত্নও তাই। পুতুপুতু মোটেই ভাল নয়। মানুষ মুরগী নয়। তবু মানুষও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। মাটি, হাওয়া, আলো, তেল, জল-এসব ছাড়া শিশু সুস্থ থাকবে কী করে? প্রবাদ আছে—"কোলের ছেলে জরা, মাটির ছেলে সেরা।" বদ্ধ ঘরে শিশুকে শোয়ালে বাইরে বেরুলেই তার ঠাণ্ডা লাগবে। গরম জল একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ঠাণ্ডা জল তার পক্ষে মারাত্মক হবে। অথচ শিশুর প্রকৃতি আর কিছু বদলাতে পারে না। সে সুযোগ পেলেই জল ঘাঁটবে। শিশুর প্রকৃতি হল প্রতিটি জিনিস স্পর্শ করে মুখে দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। শিশুকে বেশী কোলে রাখলে তার স্বাস্থ্যই শুধু খারাপ হয় না, সে পিছিয়ে পড়ে। শিশুর শরীর প্রকৃতির নিয়মেই সুস্থ থাকে, সে ওঠে রাত্রি চারটায়। উঠেই পায়খানা করবে। খাওয়া একটু বেশী হলে তুলে দেবে, একটু শরীর খারাপ হলে খেতে চাইবে না।

এখন আমরা যদি জোর করে ওকে ভোর বেলা উঠতে না দিই বা খেতে না

চাইলেও জোর করে খওয়াই, তবে ওর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে কেন? শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে ভালবাসে। প্রথম খেলার উপকরণ ওর নিজের হাত-পা। হাত-পা চেনা হয়ে গেলে তারপর লাল রং চিনতে থাকে মাঝে মাঝে শিশুর পক্ষে কাঁদাও মঙ্গলজনক। তাতে শিশুর লাংসের জোর বাড়ে। খেলায় বাধা দিলে শিশুর মেজাজ বিগড়ে যায়, একাগ্রতা নষ্ট হয়।

শিশুকে তিন ঘণ্টা পর খাওয়ানো অভ্যাস করা ভাল। প্রথম হয়তো একটু উসখুস্ করবে বা কাঁদবে, তখন মধ্যে একটু মধু বা মিছরির জল দিলেই শান্ত হবে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে গ্লিসারিন মাখিয়ে মাঝে মাঝে মুখটা পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল। দাঁত উঠলে তো জল ন্যাকড়া দিয়ে নিশ্চয়ই দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। ছ'মাস বয়স থেকে শিশুকে কিছু শক্ত জিনিস খেতে দিলে ওর দাঁত ওঠার সুবিধে হয়। এ সময় দেখা যায় শিশু কামড়াতে চায়। বিস্কুট বা পাঁউরুটি বেশ কড়া টোস্ট বা আখ একটু থেতো করে দিলে ওদের দাঁত ওঠা সহজ হয়। আরামও পায়। এ সময় শিশুর চাপ-ফুড দরকার। যেমন একটু আলু বা ডিমের হলদে অংশটা, দুটি ভাত, ভাত একেবারেই খাওয়ানো না গেলে এক আধ ঝিনুক ফেন, বার্লি, সাগু, বিস্কুট ইত্যাদি দেওয়া দরকার। এ সময় আদর করে শুধু দুধ খাওয়ালে লিভারের দোষ হয়ে চিরদিনের জন্য শিশুর লিভারটি নষ্ট হয়ে যাবে। শিশুর খাওয়া স্নান এ-গুলি নির্দিষ্ট সময়ে করা দরকার, তাতে ওর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নিয়মানুবর্তিতা হয়। সঙ্গে আদর করে শিশুকে কখনো খাওয়াতে নেই।

ওদের পোষাক-আসাকও খুব ঢিলে হওয়া ভাল, যেন পোষাকের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব বায়ু চলাচল করতে পারে। গরমের সময় বেশীর ভাগ সময় খালি গা রাখাই সঙ্গত। শীতের সময় অবশ্যি ভিন্ন কথা। তখন আবার যথোপযুক্ত গরম জামা-কাপড় পরানো প্রয়োজন। তা বলে ঘরে বন্ধ করে রাখা বা কখনো মাটিতে নামতে না দেওয়া উচিত নয়।

তবে কি শিশুকে তার নিজের উপরই ছেড়ে দেওয়া যায়? না, তা সম্ভব নয়, গার্ড দিতে হবে বৈকি, তা বলে অস্বাভাবিক উপায়ে নয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। জল-হাওয়া-আলো এসব তার চাই-ই। পরিমাণ মত এ না পেলে স্বাস্থ্য ও মনোবল কোনটাই তার হবে না।

* মাসিক বসুমতী : (অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে) : মাঘ, ১৩৬৪।

স্বধর্মে

লিখি আমি অনেক দিন। কিন্তু কাউকে জানাই নি। ভয় ছিল কেউ যদি লেখা পড়ে হাসে। পেট আমার প্রায় ফাটে, আর কাউকে না জানালে নয়। তবু মানের দায়ে চেপে থাকি।

বন্ধু মহলে যখন আলোচনা হয় সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা উচিৎ কিনা? আমি তখন এক বক্তৃতা দিই। সুন্দরীকে সুন্দর ভাবে রাখতে পারলে তবেই বিয়ে করা উচিৎ। একটি সুন্দরী বৌ এনে তুমি তাকে আট-পৌরে ব্যবহার করবে এ কেমন কথা। নিত্য ব্যবহারে রং চটে যাবে, ধুলো কাদা লেগে যাবে।

বন্ধুরা বলে সাবাস। তুমি একটি জিনিয়াস্।

আবার আলোচনা চলে শাশুড়ী বৌ বনে না কেন?

আমি বলি—তার কারণ শাশুড়ী তার ক্ষমতা জাহির করে, বৌকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, বহুদূর শেকড় বিস্তৃত করে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বহুদর্শী হিসেবী মন সব সময়ই লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে। বধূর জোয়ারের সময়, উচ্ছলতা এখন তার ধর্ম, তাই দুই বিপরীত ধর্মে খটাখট লেগে যায়।

বন্ধুদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, বলে—আর ছদ্মবেশ পরে থেকো না, তুমি নিশ্চয় এসব নিয়ে খুব ভাব আর লেখ।

উচ্ছাসের মুখে বাঁধ থাকে না। বলে ফেলি—তা একটু আধটু লিখি।

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—দেখাও।

আমার কৃপণের ধন বাহির করি।

সবগুলি পড়ে তারা খুব খুসি, তাদের বন্ধু সাহিত্যিক এবং তারা আবিষ্কারক এটাই বোধ হয় এতটা উচ্ছ্বাসের মূল।

চলতে থাকে আমার নবোদ্যম। কতক্ষণে বন্ধুরা সব আসবে আর আমি আমার নূতন লেখা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব তাই ভাবি। কেউ এলেই উস্‌খুস্ করতে থাকি কী করে আমার লেখার কথাটা তুলি, আর আমার গল্পের বন্যায় ওদের ভাসিয়ে দিই। যাকে পাই তাকেই ধরি গল্প শোনার জন্য।

ক্রমে মানুষ আমায় একটু ভীতির চোখে দেখতে থাকে এবং সাধ্যমত আমার সঙ্গ এড়িয়ে যায়।

স্ত্রী তো আমায় দেখ্‌লে আঁতকে ওঠেন, এই বুঝি আমার লেখা তাঁকে শোনাতে বসি। আরে রাম! মেয়ে মানুষ লেখার বোঝে কী? এতদিন তো আতুর ঘরে ঢোকা আর চাল সেদ্ধ করা ছিল তাদের কাজ, এখন না হয় তারা শিক্ষিতা হয়েছেন, শিক্ষিকা হয়েছেন। সপ্তাহে একটি দিন নারীজগৎ বলে কাগজে এক চিলতে স্থান পেয়েছেন। মোচার ঘণ্ট আর খেচুর পোলাউ রান্নার কথা লেখেন। তাই বলে সাহিত্য! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! অপরের লেখা শোনার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত নেই।

বন্ধুদের উৎসাহ অবশ্যি এখনো ভাটা পড়েনি। ওরা শুধু বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত নয়, এ সব ছাপানোর চেষ্টাও করে।

কিন্তু কোন সম্পাদকের সঙ্গে তো পরিচয় নেই!

একদিন বন্ধুরা সুখবর নিয়ে আসে, আমাদের হাবুলের পিসের মামাশ্বশুরের ভায়রা ভাই-এর কাকা হন, একটি বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক। কাজেই আত্মীয় যখন পাওয়া গিয়েছে তখন আর দেরী করে লাভ নেই। আগামী রবিবার যাওয়া ঠিক হয়।

মিনিট পল ক্ষয়ে ক্ষয়ে রবিবার এগিয়ে আসে।

সম্পাদক মহাশয়ের কাছে গিয়ে দেখি তার বাসায় ছোট খাটো একটি আসর বসে গিয়েছে, আমরা নমস্কার করে এক পাশে বসে পড়ি।

সম্পাদক মহাশয় তার লেখা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, এ কাগজ সে কাগজ, এ সম্বন্ধে সে সম্বন্ধে কত সনে কোন কাগজে তিনি কি লিখেছিলেন।

কখন আমার হাঁ যে বেড়ে যাচ্ছে টের পাইনি। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এটা পড়া হলেই আমার লেখাগুলি দেব। ঘরে আমারই মত আরও অনেকে গভীর উৎকণ্ঠায় মিনিট গুনছে। ক্রমে ১২ টার বেল পড়লো, তখন সেদিনের মত লেখা ছেড়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম।

আপনারা নিশ্চয় বলবেন, লেখা তো তোমরা শোনাতে পারনি বাপু তবে এত হাসি কেন?

কেন হাসছি শুনুন তবে। মনে পড়লো একটা পুরানো গল্প—এক ভদ্রলোক নাম ছিল দুঃখীরাম। জীবন ভোর সে কেবল দুঃখই পেল। সে ভাবতো আমার নাম যদি দুঃখীরাম না রাখতো তো আমি সমস্ত জীবন এত দুঃখ পেতাম না।

একদিন দুঃখীরাম চলেছে, পথশ্রমে ক্লান্ত, দেখে একটি মেয়ে মানুষ ধান কুটছে। দেখে সে বলে—আমায় একটু জল দেবে ?

মহিলা ঢেঁকির উপর থেকেই বলে—রেজো এঁকে একটু জল দে।

জল খেয়ে দুঃখীরাম বলে—আচ্ছা তোমার নামও বুঝি দুঃখীনি বা সীতা ?

মহিলা বলে—না তো ! আমার নাম কমলা, আর এই রেজো মানে রাজ্যেশ্বর আমার ভাই। আমরা দু'ভাইবোনে ধান কুটে চাল বিক্রী করি।

একথা শুনে দুঃখীরামের মনটা যেমন হাল্কা হয়েছিল তেমনি আজ সম্পাদক মহাশয়কে লেখা পড়ে শোনাতে দেখে আমারও দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। *

* অর্চনা : শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৫।

পাদ প্রদীপ

মা বললেন—বেরুচ্ছিস নাকি ?

না, মা এই গরমের ভেতর বেরুতে ভাল লাগে না। ন-বৌদির কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি। বলে গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে পাড়ায় ন-বৌদির বাড়ী যাই।

ন-বৌদি একগাল হেসে অভ্যর্থনা করেন—এস ভাই, এস, কি ভাগ্য আমার !

আমি চটিটা বাহিরে খুলে ন-বৌদির খাটে গিয়ে বসে বলি—যেটা হামেশাই হচ্ছে, সেটা আর ভাগ্য বলে কেউ স্বীকার করে না।

বৌদি বলেন—কোথায় হামেশা ? বাবুদের সময়ই হয় না। তুমি না এলে আমার বিছানাটা কাঁদতে থাকে।

আমি হেসে ফেলি—যাক্ তা হলে এতদিনে আমার বিছানায় বসাটা আইন সঙ্গত হল।

বৌদি বলেন—তুমি বস আমি চা করে আনি।

ন-বৌদি মানুষটি ভালই। মানুষজন এলে খুশী হন। তবে এই বিছানার উপর বড় দুবলতা, দুখানা জাজিমের উপর পুরু তোষক ধবধবে চাদর। বিরাট দুটি পাশ বালিশ, চারটি মাথার বালিশ, পরিপাটি করে সাজানো। এখানে কাউকে হাত দিতে দেয় না। আমার কেমন জানি এ বিছানায় বসে বৌদিকে না চটালে মোটেই ভাল লাগে না। বৌদি চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন —দেখো বসেছ আমার বিছানায় যেন চা ফেল না।

বলি—ফেললে কি হবে ? এ খাট কি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ?

বৌদি হাসেন। বলেন—তা নেব না, আমি না থাকলে তোমার ন'দা এ খাটের দিকে চাইতেও পারবেন না।

এত আস্থা ভাল নয়।

বৌদি সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন তোমাদের অতুল যে আবার স্কুলে ভর্তি হল গো ?

বিস্মিত হয়ে বলি—আবার ও স্কুলে ভর্তি হল ?

হ্যাঁ, ওর বড় বোন বোধ হয় কিছু করছে। রোজই দেখি দশটায় বেরোয়, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যায়।

তাতে স্কুলে ভর্তি হয়েছে বুঝলেন কি করে?

না বোঝার কী আছে? দশটায় যায়, চারটায় ফেরে বইপত্র হাতে নিয়ে। সতুর বাবা কিন্তু খুব বাঁচা বেঁচে গেল।

কী রকম?—চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি।

বাঃ, দেখনি কতদিন যাবৎ অসুখে ভুগে ভুগে হাড়িডসার হয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীর থেকে ভাই আসতে তবে সব চিকিৎসার ব্যবস্থা।

তাই বুঝি?

তা না তো কি? আচ্ছা তোমাদের কি চোখ নেই? তোমরা কিছুই দেখতে পাও না? পুরুষ মানুষ বড় তালকানা হয়।

সে জন্যই তো আপনারা আছেন।

বৌদি খুশী হন।—সত্যি ভাই মেয়েদের ছাড়া ব্যাটা ছেলেদের কখনো চলে? তোমার ন'দাও বলেন, "আচ্ছা তুমি এত খবর পাও কী করে"? আসল হল চোখের ব্যবহার। চোখ তোমাদেরও আছে কিন্তু কাজে লাগাও কই? সেদিন কী কাণ্ড হয়েছে জান? তোমার ন-দার পেট কন্‌কন্ করে। একটু লেবুর দরকার। আমায় বললেন পাড়ায় কি পাওয়া যাবে? দেখনা সুবোধদের বাড়ী।

আমি বললাম—সুবোধদের বাড়ী পাওয়া যাবে না, নরেনদের বাড়ী পাওয়া যাবে। গেলও সত্যি তাই। তোমার দাদা ধরে পড়লেন—বল তুমি কী করে বুঝলে? তখন আমি রহস্য ফাঁস করি। নরেনদের দোর গোড়ায় ডাবের খোলা ফেলতে দেখেছি, তাই ভাবলাম ডাব যখন এসেছে নিশ্চই কারো পেটের গোলমাল, তা'হলে লেবু থাকা সম্ভব।

ন-বৌদির বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হই।

এমনি অজস্র ঘটনা ন-বৌদি বলে যান। ছেলেপুলে নেই, স্বামী আর স্ত্রী। সংসারে লোক অবশ্য দু-চার জন আছে, যেমন একটি ননদ, একটি ভাগ্নে, একটি চাকরও আছে। ন-বৌদির সময় অজস্র, আর সময় তিনি এ ভাবেই খরচ করেন।

আরেক দিনের কথা।

তোমাদের পাড়ায় বিয়ে লাগলো গো।—ন-বৌদি বললেন।

কার বিয়ে?

অমুর।

অনুর বিয়ে ঠিক হয়েছে না কি ?

হাঁ, ঠিক বইকি। এক পার্টি যখন দুদিন দেখে গেল তখন এখানেই হবে মনে হয়। মেয়ে দেখিয়েছে দেড় বৎসর আগে যে কাতানখানা কিনে ছিল সে খানা পরিয়ে। আর একদিন চারমাস আগে যে কাঞ্চিভরমখানা কিনেছিল সে খানা পরিয়ে।

বা-বা! আপনার এতও মনে থাকে। শাড়ীর বয়স পর্যন্ত মুখস্থ। আপনি পড়াশুনা করলে জজ হতেন।

ন-বৌদি খিল খিলিয়ে হেসে ওঠেন।—তা একটা কিছু হতাম। কিন্তু সে দিকে আর গেলাম কৈ ?

না গিয়ে ভালই করেছেন। আমাদের পাড়ার খবর তা হলে আমরা পেতাম কী করে ?

কী জানি ভাই, কেন যে তোমাদের ওসব চোখে পড়ে না। জান নন্দদের কাল বিকেলে রান্না হয়-নি। বোধ হয় কর্তা গিন্নী ঝগড়া করেছে।

কে বললো ?

এ সব কথা কেউ বলে নাকি ? কাল বিকেলে ওদের উনুনের ধোঁয়াই দেখলাম না।

এমনও তো হতে পারে যে ওদের বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল বা খাবার আনিয়ে খেয়েছে। ঝগড়া হয়েছে আপনি বুঝলেন কিসে ?

ন-বৌদি আবার খিল খিলিয়ে হেসে ওঠেন। এই বুদ্ধি নিয়ে সংসার করবে কী করে বল তো ? ওহে বুদ্ধিমান ! যদি নিমন্ত্রণ থাকতো তা হলে যেতে দেখতাম আর খাবার আনিয়ে খাবে নন্দরা ! এই তোমার বুদ্ধি, আর লোক পাওনি।

হেরে গিয়ে চুপ করে থাকি।

ন বৌদি জর্দা খান, ঠোঁট দুখানা লাল টুকটুকে। পানের বাটাটি বড় পরিপাটি সাজানো। আমায় একটি পান-দেন।

আবার আমায় কেন ? খেতে অবশ্যি ভালই লাগে, বিশেষ গন্ধের জন্য। কিন্তু যদি অভ্যেস হয়ে যায় এই মুস্কিল।

বৌদি বলেন—হলই বা অভ্যেস। রোজগার পত্র কর, তোমাদের অসুবিধা কি ? তোমার ন-দা তো খুব পান জর্দা খান। প্রথমে আমি খেতাম না তিনি বলতেন খাওনা একটা, না হলে আমায় দেবার গরজ হবে কেন ? এমনি করেই আমার অভ্যেস হয়েছে।

আবার আমাকেও দলে টানছেন !—বলে উঠে পড়ি।

একদিন ছুটির পর বন্ধুর বাসায় যাই। গিয়ে দেখি রমেন সেজেগুজে কোথায় বেরুচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে ওঠে—এসেছিস ? খুব ভাল হয়েছে। আমার একা যেতে ভাল লাগছে না, চল আমার দিদির বাসায়।

ওর সঙ্গে ভবানীপুরে ওর দিদির বাসায় যাই। সেখানে আমরা যে ঘরে বসে গল্প করছি সেই গেট দিয়ে এক ভদ্রলোক দোতলায় উঠে গেলেন, যেতে যেতে কী ভেবে একবার আমাদের ঘরের দিকে ফিরে চাইলেন। আমি কোণের দিকে ছিলাম বলে ভদ্রলোক আমায় দেখতে পান নি।

আমি অভিভূত হয়ে বসে ছিলাম। রমেন বলে—এই যে ভদ্রলোককে দেখলি এ এক অদ্ভুত লোক। হালে বিয়ে করেছেন, দিদির উপরতলায় একখানা ঘর নিয়ে আছেন, কিন্তু রাত্রিতে থাকেন না। রাত্রি গোটা দশেক পর্যন্ত থেকে তারপর মেসে চলে যান। মেসের লোকদের নাকি এখনো বিয়ের কথা জানান নি, তাই মেসে তার ফেরা চাই-ই।

দিদি বলেন—আরও কাণ্ড করেন ভদ্রলোক। সকালেতো এখানে আসে না। একটা পার্ট টাইম কাজ নাকি করেন। রাত্রিতে এসেও খান না, বলেন মেসের ভাত ফেলা যাবে। পয়সা যখন দিয়েছি নষ্ট করব কেন ? বৌ বিশেষ পীড়া-পীড়ি করলে ২।১ দিন খেয়ে যান।

আজকাল বৌ খুব রাগ করে বলে—এভাবে আমি আর কত দিন বন্দী থাকব ? মেস ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে এসো। ভদ্রলোক বলেন—দাঁড়াও আগে সবাইকে জানাব, নেমন্তন্ন খাওয়াব, তোমায় গয়না দিয়ে সাজাব তবেই না।

এরপরে দিদির বাসায় কি বলেছে, আর কি শুনেছি খেয়াল নেই। রমেন বললে তোর শরীর খারাপ নাকি রে ?

হ্যা, শরীরটা ভাল লাগছে না আমি যাই। বলে উঠে পড়ি। রমেনও সঙ্গে আসে। দিদি আরেক দিন যাবার জন্য অনুরোধ করেন।

বাসায় এসেই কাপড় না ছেড়ে ন-বৌদির বাড়ী যাই। বৌদি বলেন—কাপড় ছাড়নি যে, এই এলে বুঝি ?

তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করি—ন'দা কোথায় ?

ন-বৌদি গালে হাত দিয়ে বলেন—শোন কথা। তিনি কি এখন আসেন ? তাঁর আসতে আসতে রাত্রি দশটা এগারোটা হয়।

এতরাত্রি তিনি কী করেন ?

কী আর করবেন? বন্ধু বান্ধবের বাড়ী যান, তাশ খেলেন ঘরে তো ছেলে পুলে নেই মন টিকবে কেন।

আহাম্মুক! কথাটা মুখে এলেও সামলে নেই।

ন-বৌদি বলেন—জান রামুদের বাসায় কী কাণ্ড।

ধমকে বলি—রামুদের বাসার খবর না রেখে নিজের বাসার খবর রাখুন। বলেই হন্ হন্ করে বাড়ী চলে আসি।

রমেনের দিদির বাসার নব-বিবাহিত ভদ্রলোকই ন'দা।

*

হাওড়া বার্ত্তা: শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৯।

শফরী ফরফরায়তে

শিখা প্রায়ই লক্ষ্য করে এই নামটিকে। বয়স বেশী নয়; চঞ্চল বিমর্ষ সব কিছুতেই বিরক্তি। চেহারাখানা মন্দ নয়। কিন্তু বড় মেজাজ।

অনীতা ধপাস্ করে শিখার বিছানায় বসে পড়ে।

শিখা একটু হেসে বলে—কী ভাই খুব বুঝি পরিশ্রান্ত?

হ্যাঁ পরিশ্রান্ত তো বটেই, এখন একটু সময় পেয়েছি তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু গল্প করে যাই। কাজ আর কাজ, আমাদের মেট্রনও হয়েছে তেমনি। বে-থা করেন নি তো! সংসারের ঝামেলা নেই। আমাদেরও চাক ঘুরিয়ে ছাড়েন। কাজ ছাড়া একমিনিট নিজেও থাকেন না, আমাদেরও থাকতে দেন না।

শিখা বলে—তা যা বল ভাই। ভদ্রমহিলা কিন্তু আদর্শ মহিলা, কি দরদ দিয়ে যে রোগীদের দেখেন। কারও এতটুকু অসুবিধা সইতে পারেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলে, হ্যাঁ ভাই তোমার বর কি কলকাতা থাকেন না? তুমি তো ছুটি নাও না!

অনীতা গম্ভীর হয়ে বলে—আমার বর নেই। বর থাকলে কি কেউ আর নার্সিং করতে আসে?

একী বলছ তুমি? তোমার সিঁথিতে যে আরেক জনের পরমায়ুর নিশানা!

হ্যাঁ, ঐ বিভ্রান্তিকর নিশানাটা এখনো মুছতে পারিনি। আমি অবশ্যি দিই না। আমার ঠাকুমা দিয়ে দেন। আচ্ছা বলতো ভাই যে স্বামীকে আমি স্বীকার করি না তার মঙ্গল চিহ্ন ধারণ করায় আমার সার্থকতা কী?

স্বামীকে স্বীকার কর না? কেন?—শিখার স্বরে গভীর বিস্ময়।

সে অনেক কথা ভাই। লিখলে একখানা উপন্যাস হয়ে যায়। আমাদের অদৃষ্টে স্বামী সুখ নেই।

তোমাদের? তোমার আর কার?

আমার এক বন্ধুও স্বামীর ঘর করে না। আমার বিয়ে হল, বর দেখতে সুন্দর, পয়সাকড়ি ভালই উপায় করে। কোন ঝামেলা নেই। এ সব দেখেই দিয়েছিল।

কিন্তু শাশুড়ীই যে আমার অদৃষ্টের শনি তা তো কেউ ভাবেনি। তাই সবাই আশ্চর্য হয় শুনে, তোর অসুবিধা কী ?

অসুবিধা যে কী তা বোঝাই কি করে। শাশুড়ী বলেন, মাথায় কাপড় দেবে। এটা মানবে। হুট করে একা বেরুবে না। এসব আবদার আজকের দিনে চলে কখনো ? বললাম ওঁকে। তিনি মাতৃভক্ত সুবোধ বালক হয়ে বললেন, মার মনে দুঃখ দিওনা। মা আমায় ছোট নিয়ে বিধবা হয়েছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমাদের উচিৎ মাকে একটু শান্তি দেয়া। বুঝুন নীতি কথা। বৌকে বলতে তো আর গায়ে লাগে না।

বিস্ময়ে শিখা উঠে বসে বলে—আমায় আবার আপনি আজ্ঞে কেন ভাই ? তুমি তখন কী করলে ?

কী আর করব। ভদ্রলোককে বললাম, আলাদা বাসা কর।

তিনি নির্বিকার ! একদিন খুব রাগ করে চলে এলাম বাপের বাড়ী।

বেশ কিছুদিন পরে তিনি এলেন। সেই কাঁদুনি, আমার দিকে চেয়ে সহ্য কর। মার যে আমরা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি হটিয়ে দিয়েছি। স্পষ্ট বলে দিয়েছি যদি আলাদা থাকতে রাজী হও তবেই আমি যাব, নয়ত নয়। ওসব ট্যাক-ট্যাকানী আমার ভাল লাগে না।

শিখা বেদনা বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে—এখন বেশ শান্তিতে আছ ?

শান্তি অশান্তি বুঝি না। স্বাধীন ভাবে আছি। দুঃখ কী ? আমি তেমন মেয়ে নই যে শাশুড়ীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে শ্বশুর বাড়ী পড়ে থাকবো। কিছুদিন দেখলাম। কিছুতেই যখন তারা তাদের গোঁ ছাড়লে না, তখন নার্সিং-এ ভর্তি হয়ে গেলাম। নিজের পেটটা চালাতে পারবো না কি ?

শিখা বলে—পেট চালাতে পারলেই বুঝি আর কোন সমস্যা থাকে না ? এমনি ভাবেই জীবনটা কাটবে ? এখানে খুব স্বাধীন ভাবে আছ ? কারো মন যোগাতে হয় না ?

মন যোগাব কেন ? খাটি খাই। তবে এক এক সময় কর্তৃপক্ষ বড় অবিচার করে। কোন মতে ট্রেনিংটা শেষ করতে পারলে কাজ নিয়ে চলে যাব।

ভাল।—বলে শিখা বিষণ্ণ মুখে শুয়ে পড়ে।

অনীতা উঠে যায়।

কিন্তু শিখার শুয়ে থাকার সময় কোথায় ? যে দিন সংসার রেখে হাসপাতালে এসেছে পেটে একটা ব্যথা নিয়ে সে দিন বড় নিঃসহায় মনে হয়েছিল। ভেবেছিল

বুঝি বনবাসে যাচ্ছে। সব ছেড়ে আসতে কী খারাপই লাগছিল। এখন ব্যথা নেই, নানা ভাবে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রথম ছিল কেবিনে। কেবিন তার কাছে কয়েদখানা মনে হত। তাই প্রায় জোর করে নিজেই এসেছিল এদের ভেতর, সাধারণ বেডে। এখানে এসে সে বেঁচেছে, অনেক কাজ পেয়েছে। একটি বৃদ্ধা এসেছেন, পায়ের হাড় অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছে। শারীরিক কষ্টের চেয়েও অশুচিতার গ্লানিতেই বৃদ্ধা ম্রিয়মান। সে ব্রাহ্মণ, এই অস্পৃশ্যদের মধ্যে সে জলস্পর্শ করবে না। অনেক বুঝিয়ে, ধর্মকথা বলে বৃদ্ধাকে খাওয়াতে হয়। ২নং বেডের রোগিণী একটি বাচ্চা রেখে এসেছে তাই তার কেবল কান্না। তাকে বোঝানো এক কাজ। ৩নং রোগিণীর ভাত বন্ধ তাই তার একটা না একটা ছুতো লেগেই আছে। তাকে শান্ত করেও নিজের ফল দুধ শিখা দিয়ে দেয়। ৪নং বেডে একটি মুসলমান বৃদ্ধার চোখ অপারেশন করিয়েছে। শিখা মিটসেফ থেকে খাবার বের করতে সাহায্য করে, খাইয়ে দেয়। এতেই অন্যান্য রোগীরা বড় আঘাত পায়। শিখাকে সবার ভালই লাগে। মানুষের জন্য করে, তাতে কেউ বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু তা বলে মুসলমানকে করবে? এ জন্য সকলেই শিখার উপর বিরক্ত অথচ ওকে ছাড়া কারো চলেও না। ব্রাহ্মণী অনেক করে বুঝিয়েছে, জাত ধর্ম খুইও না। তা কে শোনে কার কথা।

অনীতা বলে—আচ্ছা তুমি কি একটু বিশ্রাম করতেও পার না। এ সব করতেই কি হাসপাতালে এসেছিলে?

ক্ষতি কী ভাই? শুয়ে বসে কি সময় কাটে? আমার সময় কাটছে ওদেরও একটু সুবিধে হচ্ছে।

কী জানি তোমার এ কেমনধারা সময় কাটানো বুঝি না।—বলে অনীতা কাজে চলে যায়।

একদিন ভিজিটিং আওয়ারের পরে অনীতা এসে শিখার বেডে বসে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে।

শিখা বলে—হঠাৎ এত উচ্ছ্বাস কেন?

তোমার কাণ্ড দেখে, আচ্ছা তুমি ঘোমটা টেনে কাকে প্রণাম করছিলে?

তিনি আমার দিদিশাশুড়ী, তিনি আমায় না দেখে আর থাকতে পারলেন না। তাই হাসপাতালে ছুটে এসেছেন।

তার জন্য এতলোকের ভেতর তুমি ঘোমটা টেনে বসে থাকবে! মানুষ তোমায় কি ভেবেছে বল তো?

ভাবুকগে। ঘোমটা তো নয়, একটু মাথায় কাপড় দিলে যদি বুড়ো মানুষটা খুশী হয়, তবে সেটুকু করাই কি ভাল নয় ?

তোমার ধরণ ধারণ বড় সেকেলে। সে জন্যই মেয়েদের পড়াশোনা করা উচিৎ। তুমি সংসারের কাজ করে বোধ হয় বই ছুঁতেও সময় পাও না। ওদেশের মেয়েরা মা বাবার সঙ্গেও থাকে না; অথচ আমাদের দেশে মেয়েরা এখনো গোষ্ঠি-গোত্র নিয়ে থাকবে। শাশুড়ীর জ্বালাই সহ্য করা দায়, আবার দিদিশাশুড়ী !

শিখা বলে—তুমি রেগে গেছ। একা থেকে কী দেশোদ্ধার করবো ? ওদেশ ওদেশের জন্যই। নকল করতে গেলে ফল তার খারাপই হয়। আচ্ছা পশ্চিমের মেয়েরা তো শুনেছি গরম পোষাক পরে, আমরা পরলে কেমন হয় ?

অনীতা অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে—কী যে বল ! সেটা শীতের দেশ, সেখানে গরম জামা পরে বলে আমাদের এই গরম দেশে তা কখনো পারে ?

শিখা বলে—আচ্ছা ওদেশে শুনেছি খুব আপেল হয়। আপেল যেমন খেতে ভাল তেমন দেখতে, আমাদের বাংলা দেশে কেউ লাগায় না কেন ?

অনীতা তাচ্ছিল্য ভাবে জবাব দেয়—কী হবে লাগিয়ে ? বাংলার জলবায়ুতে তা হবে কেন ?

তা হলেই বোঝ ও দেশের নকল আমাদের সহ্য হয় না, কারণ আবহাওয়াই আলাদা।

নাঃ, তোমাকে বোঝানো যাবে না।—অনীতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—গরম কাপড় পরা, আপেল লাগানোর কথা নয়, ওরা কতটা এগিয়ে গিয়েছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে...

শিখা বলে—এগিয়ে যাবার সঙ্গে শাশুড়ী বুঝি বেমানান ?

অনীতা বলে—তর্ক করে লাভ নেই, এখন তো হাসপাতালে কিছু কাজ নেই। বেগার না খেটে একটু পড়াশুনা কর দেখি। দাস মনোবৃত্তি ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর।

শিখা বাধ্য ছাত্রীর মত বলে—আচ্ছা কী বই পড়ব বল তো ?

সে আমি বলে দেব। অনীতার শিখার উপর অসীম অনুকম্পা। বেচারী ঘোমটা টেনেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, হুকুম মেনে স্বাধীন সত্বাই হারিয়ে ফেলেছে, হাসপাতালে পর্যন্ত এর ওর হুকুম তামিল করে চলেছে। তাই ওর ইচ্ছা হয় শিখাকে একটু মানুষ করতে।

একদিন শিখা গল্প করেছে ওর শ্বশুর বাড়ীর। ওর বয়েরা পাঁচভাই চারবোন, জ্যাঠ শাশুড়ী, খুড়ী শাশুড়ী আছেন। বিরাট পরিবার।

এতগুলি লোকের মন যুগিয়ে চল?—বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে অনীতা।

চলি বই কি। শুধু কি আমিই চলি? ওরাও যে চলে। আমি কী খেতে ভালবাসি, কী পরতে ভালবাসি তা ওরা জানেন। ছোট্ট দেবরটি পাকা পেয়ারাটি পেলে দৌড়ে নিয়ে আসে আমার জন্য। দিদি-শাশুড়ী আমি যা ভালবাসি বাজার থেকে তাই আনতে বলেন। তুমি আমার দুঃখের কথা ভেবে শিউরে ওঠ। আমি একটা রাজ্য জয় করার আনন্দ পাই। মানুষের ভালবাসা আদায় করা সে যে কী আনন্দ! কী নেশা! তার তুলনায় ত্যাগ আমার কতটুকু? কাউকে একটু চুল বেঁধে দিলে খুশী, কাউকে বা আমার কাপড়খানা পরতে দিলে খুশী। কারো হাতের কাজ টেনে করে দিলে খুশী। দু-একজন ব্যতিক্রম নেই তা নয়! যেমন আমার জ্যাঠাশাশুড়ী একটু পিটপিটে মানুষ। সমস্তদিন পরিশ্রম করলেও তিনি আরো করছি না বলে অভিযোগ করেন। এদের মন যোগাতে কিছু সময় লাগে, পরিশ্রমও। তারপর অবশ্যি খুব খুশী হন। আনন্দও পাওয়া যায় বেশী। সহজ পথে হাঁটাতো কিছু নয়। বন্ধুর পথ যে অতিক্রম করতে পারে সেই তো জয়ী।

অনীতা বলে—তোমার জয় আমার মাথায় থাকুক। সমস্ত দিন তুমি এই করে বেড়াও, নিজে সখ আহ্লাদ কর কখন?

নিজের বলে আলাদা তো কিছু রাখিনি ভাই!

অনীতা বলে—আচ্ছা যেখানে মেয়েরা আজ ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে, ভারতীয় মেয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছে, সেখানে সংসার নিয়ে, শাশুড়ী, দেওর নিয়ে মেতে থাকাটাই কি যথেষ্ট সার্থকতা? আজও কি আমরা এসবের উর্ধ্বে উঠবো না।

উর্ধ্বে কোথায় উঠবে ভাই? ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে আরতি সাহা, ভাল কথা। কিন্তু সংসার থেকে বেরিয়ে এলেই মুক্তি পাবে তুমি? জীবনকে উন্নত করতে হলে পায়ের নীচের মাটি শক্ত হওয়া চাই বলেই, শ্বশুর বাড়ীর ভিতটাকে শক্ত করে নেওয়া দরকার। মেয়েরা যত উন্নতই হোক সংসার তাদের চাই-ই। সেখানেই তাদের সার্থকতার মূল। মেয়েরা সংসার তৈয়ারী করে কত মমতায়। সেখানে সে সাম্রাজ্ঞী, দু'হাত ভরে সবাইকে দেবে, দেওয়াটাই তার সার্থকতা, দিয়ে থুয়েই সে এগিয়ে যাবে সফলতার দিকে।

কী জানি বাপু। আমার মনে হয় এসব নীতি কথা পুঁথি পুস্তকেই ভাল। সত্যি কি আমাদের জীবনে কেউ পারে? সত্যি বলতো ভাই, তোমার যদি উপায় থাকতো অর্থাৎ চাকুরী করার ক্ষমতা থাকতো তবে কি এই শ্বশুর বাড়ী থাকতে পারতে? আমাদের দেশের মেয়েরা যে উপায়হীন। তাই আজ ভগবানকে ধন্যবাদ দিই ভাগ্যে স্কুল ফাইনালটা পাশ করেছিলাম নয়ত আজ দাঁড়াতে পারতুম কি? আমার মনে হয় তুমি একেবারেই পড়াশুনার সুযোগ পাওনি।

পারাটাই যে আমাদের সাধনা হবে। মানুষ বাদ দেয়ার বড় বদনাম; মানুষ সইতে পারে না। মানুষ বাদ দিয়ে আমরা কোন অরণ্যে বাস করব বল তো?

কী জানি ভাই, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝি না। মানুষের সকলের আগে স্বাধীনতা।—বলে কাজে যায় অনীতা।

শিখা বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ছুটি হয়ে গিয়েছে। অনীতার খুব খারাপ লাগছে। শিখা তার বন্ধু হয়ে উঠেছে যদিও ওর গেঁয়োমিগুলি ভাল লাগে না। তবু মেয়েটা বড় ভাল। শিখার দিদি-শাশুড়ী শিখাকে নিতে এসে অনীতাকে বলেন, তোমাদের যত্নের গুণেই আজ দিদিমণিকে সুস্থ করে নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের আশীর্বাদ করছি সুখে থাক।

অনীতা বলে—শিখার জন্য আমাদের খুব খারাপ লাগবে। বড ভাল বৌ আপনার।

বৃদ্ধা কথাটি লুফে নেয়—সে আর বলতে? দু দুটো এম. এ. পাশ করেছে। আমি তো ভয়ে মরি এ নাতবৌ আমাদের গ্রাহ্যই করবে না। ওমা তাজ্জব কাণ্ড! যেন দশভুজা। দশ হাতে কাজ করছে। সংস্কৃতেও এম. এ. পাশ। তাই কি সুন্দর যে আমায় গীতা পাঠ করে শোনায়। তেমন আবার দশ রকম রান্না করে খাওয়ায়। হাতের রান্নারও কি স্বাদ, তাই তো কেঁদে মরি, ভগবান এমন বৌ যদি দিয়েছ, তার আবার অসুখ হল কেন? ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন, তোমাদের সেবায় দিদিকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

অনীতাকে কেমন জানি বিবর্ণ দেখায়। কাজের ছুতোয় চলে যায়।

ওরা যাবার সময় অনীতাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

শিখা ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাইতে চাইতে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে। *

* মেয়েদের কাগজ : শ্রাবণ, ১৩৭০।

অপত্য

—মণি

—কিগো ?

—আর কত দিন আমাদের এমনি থাকতে হবে ?

—সে তো তুমি জান অভি, আমি তো কতদিন থেকেই বলছি, এবার একটা ব্যবস্থা কর।

—আমার বড্ড ভয় হয়, বেশী চাইতে গিয়ে পরে যদি একেবারেই হারাই। তোমায় না দেখলে আমি বাঁচব না মণি, তাই এক একবার ভাবি এই-ই আমার ভাল, তোমায় দেখছি, তোমার কথা শুনছি।

—কিন্তু এ দেখায় তৃপ্তি হয় ? তুমি তোমার দিক সামলাও। আমি বাবাকে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমায় বাধা দেবেন না। জানো অভি, আমি বাবার বড় আদুরে মেয়ে, তিনি কক্ষনো আমার কাজে বাধা দেন না।

—তবু আমি ভরসা পাইনে মণি ! তুমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কখনো যাওনি ? তাই তাঁর বাধা দেবারও দরকার হয়নি। আমার দিক দিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। আমি তোমার জন্য সব কিছু ছাড়তে রাজী। দরকার হলে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেব তবু তোমাকে হারানো আমার সইবে না।

—আহা ! আমার যেন খুব সইবে ? ছেলেদের এমন নিষ্ঠুরতার কথা হামেশাই শোনা যায়, তা বলে কোন মেয়ে কখনো এমন হয় না।

অভিক সকৌতুকে হেসে ওঠে। বলে—তাই নাকি ? যাক্‌গে আমরা যখন দুজনেই ভাল তখন আর আমাদের আটকায় কে ? এবার সুমনা ব্যানার্জী, সুমনা প্রামানিক না হয়ে যায় না।

…একটি কোণে বসব দোঁহে, হট্টগোলের ঢের তফাতে।

সুমনা সোজা হয়ে বসে বলে—আর কোণে বসলে চলবে না অভি, কটা বেজেছে ত্থাখো। বলে, নিটোল হাতখানা বাড়িয়ে দেয় অভিকের দিকে।

অভিক হেসে ফেলে বলে, ঘাড়ির দিকে চোখ পড়ে না ; চোখ পড়ে, চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্যে।

সুমনা কৃত্রিম রোষকটাক্ষে বলে, তুমি বসে বসে কাব্য কর ; আর দেরী করলে বাবা বড় ব্যস্ত হ'বেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিক উঠে দাঁড়ায়। বলে—এ সময়টা কোথা দিয়ে যে কেটে যায় বোঝাই যায় না। এরই মধ্যে সাতটা বেজে গেছে?

সুমনা চিন্তিত ভাবে জবাব দেয়—বাসায় পৌছুতে আটটা বেজে যাবে। তাও যদি ঠিক-মত বাস পাই।

অভিক বলে—দ্যাখো, ছেলে আর মেয়ে—মেয়েরা যতই শিক্ষিতা হোক তবু বাপ মা তাদের উপর ভরসা রাখতে পারেন না। তুমি এম. এস.-সি পড়ছ তবু দেখ একটু বাইরে থাকলেই তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখেন।

সুমনা ভ্রূ নাচিয়ে জবাব দেয়—সে তোমাদের মত দুশমনের ভয়েই। তাছাড়া আজকাল ট্রাম বাসের ভীড়ের জন্যও কেউ বেরুলে মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

অভিক আউটরাম ঘাটের জেটির উপর থেকে নামতে নামতে থমকে দাঁড়ায়, সুমনা দু'পা পিছিয়ে যায়, বাহাদুরি রাখ। পেছনে আরও পায়ের শব্দ হয়। অভিক দ্রুত নামতে নামতে বলে—বাপস্, এ যেন লোকের মাথা লোকে খায়। কোথাও এতটুকু নিরিবিলি নেই।

সুমনা মুচকি হাসে। বলে—বদবুদ্ধি করতে গেলে এমনি জব্দ হওয়াই উচিৎ। সে দিনের মত ওরা জনারণ্যে মিলিয়ে যায়।

পরদিন সুমনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়েই দেখে অভিক উপস্থিত। বলে—আজ কোনদিকে মহাশয়ের অভিরুচি?

অভিক বিনীত ভাবে জবাব দেয়—মহাশয়া যেদিকে নির্দেশ দেন।

—তা হলে দেবদর্শনই বাঞ্ছনীয়। চল বেলুড়। গঙ্গার বুকে নৌকায় ভাসব।

—খুব যে সাহস দেখছি। এখন বেলুড় গেলে রাত্রি হয়ে যাবে খেয়াল আছে? তারপর তোমার বুড়ো খোকা কাঁদবে না?

সুমনা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। বলে—দেখ, বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না। বাবার আমি বড় মেয়ে। আমাকে একটু সময় না দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। এটা ভালবাসার ধর্ম। প্রিয়জনের জন্য সতত শঙ্কা। আজ আমি বলেই এসেছি ফিরতে দেরি হবে। তোমার পাল্লায় পড়ে এন্তার মিথ্যে কথা চালিয়ে যাচ্ছি।

অভিক যুক্তকরে বলে—নারী, তোমার রোষবহ্নি সংবরণ কর। তোমার মিথ্যের সমস্ত পাপ এই নরাধমের উপর ফেলে দিয়ে তুমি কলুষ মুক্ত হও।

সুমনা হেসে ফেলে। বলে, বুঝেছি কথার ভট্টচাজ্জি, এখন চল।

গঙ্গার বুকে অভিক উচ্ছ্বাসে বলে—

'হারাই হারাই ভয় যে গো তাই,
বুকে চেপে রাখতে যে চাই।'

—থাক অন্যের ভাষায় কথা বলে আর বাহাদুরির কাজ নেই।

অভিক বলে—সেজন্য আমি দায়ী নই। যে কথাই বলতে যাই, তাই দেখি কবি আগেই বলে গেছেন। তিনি আমার পূর্বে জন্মেছেন বলে যা কিছু ভাল ভাল কথা, সবই তিনি বলে যাবেন, এই-ই বা কেমন?

সুমনা হাসে। বলে—সত্যি তোমার দুর্ভাগ্য, কবির পূর্বে জন্মাও নি।

দিন এগিয়ে চলে। এম. এস.-সির রেজাল্ট বেরুলে দেখা যায়, সুমনা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে।

অভিক অভিনন্দন জানিয়ে বলে, এবারে আমাদের দিন এসেছে। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার, কেন না এখন তুমি স্বাধীন।

সুমনা বলে বাবার মেজাজ এখন বেশ ভাল আছে! তিনি যথেষ্ট উদার। একবার অনেক দিন আগে আমি একটি মেয়েকে বলেছিলাম নীচু জাত। বাবা কী রাগ যে করেছিলেন। বলেছিলেন—ছি সুমনা! মানুষকে কখনো নীচু ভাবতে নেই, জাত তো মানুষেরই সৃষ্টি।

অভিক বলে—সেই তো আমাদের ভরসা।

রোববার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ভবতোষবাবু বিশ্রাম করছিলেন। সুমনা এসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—আচ্ছা বাবা, আমি যদি তোমায় না জিজ্ঞেস করে কোন কাজ করি, তা হলে তুমি কি খুব রাগ করবে আমার উপর?

—না মা, তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি? তোকে আমি সব রকমে তৈরী করেছি। তোর বিদ্যেবুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। কোন অন্যায় কাজ তুই করবিনে। কিন্তু মা এই বুড়ো ছেলেকে না বলে করতে চাইছিস কেন? আমি জানলে হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারব।

জানলে কি আর রাজী হবে? আমি যদি......

—থামলি কেন? বল মনা, কী বলছিলি বল। আশ্চর্য, আমাকে বলতেও তোর কুণ্ঠা হয়!

নথ খুঁটতে খুঁটতে সুমনা বলে,—বাবা আমি……এক ভদ্রলোককে তোমার কাছে নিয়ে আসব, তিনি খুব ভাল।

—ঘামে নেয়ে ওঠে সুমনা।

—কে ভদ্রলোক রে মনা? তাকে কী করতে হবে, চাকুরি দিয়ে দিতে হবে? না কি তুই কিছু শিখতে চাস?

সুমনা বিব্রত হয়ে ওঠে। ভাবে—বাবাটা যেন কী! নত মুখেই জোর দিয়ে বলে—আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

ভবতোষবাবু যেন অপ্রত্যাশিত আঘাত পান। বহুক্ষণ তিনি চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেন, ছেলেটির বাড়ী কোথায়? কী করে, ক'ভাই, দেখতে কেমন, কি জাত?

সুমনা বলে বাড়ী পূর্ববঙ্গে ছিল। ব্যবসা করেন, জাতে সিড্যুল ক্লাস। কিন্তু তাতে কী হয়েছে বাবা? তোমার মন তো উদার। তুমি তো কতদিন বলেছ—জাত মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষ কেউই ছোট নয়।

ভবতোষ বাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। বহু কষ্টে সামলে নিয়ে বলেন—সে কথা সত্যি, মানুষ কেউ ছোট নয়। মানুষকে ছোট না ভাবা, আর বিয়ে করা এক নয় মনা। তোমার একটা ক্লাস আছে। সিড্যুল ক্লাসের একটা ছেলে উপরে উঠলে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক নাও উঠতে পারে। তখন তোমায় অসুবিধায় পড়তে হবে। তাছাড়া তুই তো জানিস নে মনা, তোর ছোটপিসীর দেবর মনতোষকে আমি জামাই করব বলে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। ওদের খুবই ইচ্ছা। তোর পড়ার বিঘ্ন হবে বলে আমি তোকে কিছু বলিনি। এমন চমৎকার ছেলে আর হয় না রে। আর তোর মার কথাটা একবার ভেবেছিস? তাঁর কী ভীষণ আঘাত লাগবে। তুই বড় মেয়ে, তোকে দিয়ে যে অনেক আশা ভরসা মণি, সম্ভব হলে তুই আজও ফের।

এক দমে এতগুলি কথা বলে এতক্ষণ ভবতোষবাবু যেন একটু স্বস্তি পান।

সুমনা মাথা নীচু করে বলে—আমার সুখের কথা ভেবে তোমরা কি এমন তুচ্ছ জিনিস ছাড়তে পার না বাবা? মাকে আমার বলার সাহস নেই, তুমি কি বোঝাতে পারবে না?

—আমার নিজের মনেই যে যুক্তি আসছে না, তা' তোর মাকে বোঝাব কী? আর তোর সুখের জন্য হয়ত অনেক কিছুই ছাড়তে পারি; কিন্তু এখানে সুখের সিকিউরিটি কোথায়? বরং তার উল্টোটাই আমি আশঙ্কা করছি!

তা ছাড়া আরো আছে, এ বয়সেরই ধর্ম, যার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশবে তাকেই মনে হবে, এমনটি আর হয় না।

—বুঝেছি, বুঝেছি তোমরা সবাই এক। ঐ মুখেই যত উদারতা—বলতে বলতে সুমনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ভবতোষবাবু চুপ করে বসে বসে ভাবতে থাকেন। মেয়েকে ডাকেন না। ভাবেন ও একটু একলা থেকে আমার কথাগুলি চিন্তা করে দেখুক।

সুমনা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সোজা গেট দিয়ে বেরিয়েই দোরগোড়ায় একটি ফিরতি ট্যাক্সি ধরে অভিকের মেসে গিয়ে ওঠে। তার উত্তেজনা তখন অনেকটা কমে এসেছে। ভাবছে—প্রেমের জন্য আজ আমি সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি। প্রেমের চেয়ে বড় আর কি আছে।

অভিক সব শুনে বলে—এ কী করলে সুমনা? এক কথায় সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এক কাপড়ে চলে এলে? এখন থাকবে কোথায়?

অভিকের কথায় সুমনা একটু দমে যায়। তার ধারণা ছিল অভিক ওর বীরত্বের কথা শুনে কতই না মুগ্ধ হবে। দু'জনে তখনই বেরয় ঘরের সন্ধানে।

একখানা ঘর ওদের জুটে যায়। বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘর। সেই ঘরের যে এত ঝামেলা তা জানা ছিল না। সমস্ত দিন দুজনে বিছানা, হাঁড়িকুরি, ঝাঁটা, বালতি কিনলো। ঠিক হল রেজিষ্টারি না হওয়া পর্যন্ত সুমনা ওর এক বন্ধুর বাড়ী থাকবে।

নূতন নূতন এই ঝামেলা ওদের ভালই লাগে। সুমনা পড়াশুনা নিয়েই থাকত, তাই সংসারীর কাজ কিছুই জানে না। যে কাজগুলি নেহাতই তুচ্ছ মনে হত এখন দেখে সেও মস্ত ঝামেলা।

ভাত রাঁধতে গিয়ে দুজনে হিমসিম খায়। ডিম ভাজতে গিয়ে সুমনা হাত পা পুড়িয়ে ফেলে। ওরা যতদূর থেকেই মাছ তরকারি কড়াতে দিতে যায়, তবু তেল ছিটকে এসে হাতে-পায়ে পড়ে। অভিক সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তারও কোন অভিজ্ঞতা নেই। রান্নার লোক আজ আসে, কাল পালায়। কল্পনার স্বর্গ ওদের মাটির পৃথিবীতে গড়ায়। তবু আনন্দেরও ওদের শেষ নেই। আত্মীয়-স্বজনের ব্যথা বন্ধু বান্ধব দিয়ে ভোলে। বাবার জন্য মনটা টন টন করলেই প্রচণ্ড অভিমানে চাপা দেয়। অসুবিধার ভেতরও মনের রঙ-এ ওরা সব কিছু রঙিন করে নেয়। পোড়া ভাত কাড়াকাড়ি করে খায়।

এই স্বর্গের ভিত একবার নড়ে উঠেছিল সুমনার অসুখে। সেদিন অভিক চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। কাকে সুমনার কাছে বসিয়ে ডাক্তার ডাকতে যায়, কে ওষুধ

পথ্য দেয়, কী করেই বা অভিক তার অফিস বজায় রাখে। সেদিন অভিকের মনে হয়েছিল, পারিপার্শ্বিক ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন সত্যি আছে। তার বাড়ীর লোকদের কথাও সেদিন একটু বেশী মনে পড়েছিল, কিন্তু উপায় কী? তার বন্ধু অধীরেশ আর তার স্ত্রী মেবা না থাকলে কী যে হত!

ঈশ্বরের করুণায় সে বিপদ কেটে গেছে। সুমনা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সংসারের অনেক কাজ সে শিখে ফেলেছে। ঝি-চাকর আর তাকে ছমকি দিতে পারে না।

অভিক কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে, সুমনার দাপাদাপি যেন অনেক কমে এসেছে। তাকে কেমন যেন ক্লান্ত শীর্ণ দেখায়। অভিক চেপে ধরে, তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে নাকি মণি? তোমাকে যেন কেমন দেখায়। সুমনার মুখে কে যেন রাশি রাশি আবীর ছড়িয়ে দেয়। অভিক বলে---কী হল, বল না।

সুমনা আরক্ত মুখে যা বলল, তাতে এক অনাস্বাদিত আনন্দের মূর্ছনায় অভিক বিহ্বল হয়ে ওঠে। ঠিক এই হ যেন তারা চাইছিল। আজ পাঁচ বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। এতদিন কী যেন এক ফাঁক ছিল। তাদের বেবী আসছে। আকাশে বাতাসে যেন সেই আনন্দের বার্তা ঘুরে বেড়ায়। চিরকেলে পুরনো কথা, অথচ কত নূতন, কত মধুর।

উভয়েরই আলোচনার বিষয়-বস্তু ঐ অনাগত শিশুর সম্বন্ধে।

অভিক বলে, ছেলে হ'বে, না মেয়ে হবে বল তো?

সুমনা চুপ করে থাকে। অভিক বলে—প্রথমে মেয়েই ভাল, তোমাকে সাহায্য করবে।

সুমনা বলে—ছেলে হলে তোমার পেছনে দাঁড়াবে।

তার কী নাম হবে, দেখতে কার মত হবে, এই নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই।

দিন এসে যায়। যথা সময়ে অভিক হাসপাতালে গিয়ে দেখে সুমনার পাশের ছোট্ট বেবী, খাটখানা আলো করে একটি শিশু ঘুমুচ্ছে।—কেমন আছ মণি? —বলেই শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। যেন একতাল মাখন, পশমের মত চুল।

এবারে চলে শিশুকে বাড়ী আনার আয়োজন। সুমনা বাড়ী এসে দেখে স্তূপীকৃত শিশুর জিনিস। অভিক বলে দেখ সব এনেছি তো, না আরও কিছু চাই? চাই-বা-না-চাই, জিনিস কিন্তু আসেই।

সুমনা চেয়ে থাকে আনন্দময়ের মুখের দিকে। এতটুকু মাংসপিণ্ড, কী করে একে বড় করে তুলবে? কত অসহায়। একটি মাছি গায়ে বসলেও তাড়াতে

জানে না। ধুকধুক করছে বুকটুকু। পলে পলে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। এই-ই সন্তান! এত কষ্ট করে বাপ-মাকে মানুষ করতে হয়। সমস্ত মনটা বেদনায় টনটন করতে থাকে।

অভিক বলে—সুমনা চল একটু বেড়িয়ে আসি। ঝির কাছে আনন্দময় থাকুক।

সুমনা মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে—তুমি যাও লক্ষীটি ও আর একটু বড় না হলে ওকে নিয়েও যাওয়া যাবে না, রাখাও যাবে না।

অভিকের আর যাবার ইচ্ছা থাকে না।

আনন্দের জ্বর হয়েছে। অভিক ডাকে—সুমনা, 'ও' একটু ঘুমুচ্ছে, তুমি এখন খেয়ে নাও। কাল সারা রাত একটুও ঘুমোও নি।

সুমনা কেঁদে ফেলে।—ওগো না-না-ওর অসুখ না সারলে আমি উঠব না। সুমনাকে উঠানো যায় না।

রেবা ছেলে দেখতে এসে সুমনাকে ধমকে তোলে। বলে—এখন তো খুব প্রাণ, বড় হলে এই ছেলেই হয়ত ফিরেও চাইবে না। বলবে—মা তুমি বড্ড ব্যাক্ ডেটেড্।

অতর্কিতে রেবা সুমনাকে বিষম আঘাত করে। সুমনাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করে। বেদনায় নীল হয়ে যায় সে। বহুদিন পূর্বের এক হৃদয় বিদারক চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভুল, বিষম ভুল করেছে সে। এর কী আর সংশোধন করা যায় না?

অস্ফুট স্বরে সুমনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—বাবা, বাবাগো! *

* সচিত্র শিশির : পৌষ, ১৩৭২

অন্তরালে

অন্ধকার তথনো ঘনিভূত হয়নি। স্পষ্ট দেখাও যায় না। ঘাটে এ সময় কে বসে আছে? আমায় দেখে একখানা সাদা থান এগিয়ে এসে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে—আমাদের দাদা ঠাউর না! পেরনাম হই। গাঁয়ে কবে এইচেন।

থাক্ থাক্। তুমি·········বলতে গিয়ে থেমে যাই। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলি—কালাচাঁদের বাবার কী হয়েছিল?

কী আর অইব বাবু! তেনার পাপের ভোগ শেষ অইছে; ড্যাং ড্যাং কইরা স্বর্গে চইলা গেছেন। পিত্থিমীর দুঃখ ভোগনের লইগা আমরা পাপীরা আছি।

এখানে কী করছিলে?

কী আর করুম। আমার কালার লইগা দুগা মাছ ধরতে আইছিলাম। পোড়ার জলে কি আর মাছ আছে?

এই সন্ধ্যে বেলা তুমি কেন? মাছ ধরতে তো কালাচাঁদ লালচাঁদ ওরাই পারত। শুনেছি তুমি তো মাছ খাওনা।

আ, ছিঃ ছিঃ কি কথা যে কন। অইলামই বা আমরা ছোট লোক। তা বইলা বামুন ভদ্দর পাড়ায় থাইক্যা বিধবা মানুষ মাছ খামু? আমি কি কাঁচা রাঢ়ী। তিনকাল গিয়া এক কালে ঠেকছে এখন করুম অধর্ম?

আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

এক দিন রেবা বললে—দেখ, তোমাদের কালাচাঁদের মার জ্বালায় তো আর পারিনে। রোজ আসবে বাটী হাতে করে মাছ দাও, তরকারী দাও। যদি বলি তরকারী করিনি। বলবে—

সোকত করছেন? তাই দেন বউ ঠাইন। আমার কালা সোকত খুব ভাল খায়, আপনে রান্দেন খুব ভাল। আমার কালার খুব অসুখ। কত অষুধ খাওয়াইলাম! কালার জন্তে একটু লেবু দেন।

বলি তা নিক। তোমারই তো জয়। তোমাকে কত প্রশংসা করে। দিও একটু বেচারিকে ছেলের যখন অসুখ।

স্ত্রী সরোষে বলে, হ্যাঁ তুমিও যেমন। তুমি বুঝি ভেবেছ ও সত্যি ছেলের জন্য-ই নেয়? আসলে তো ও নিজেই মাছ খায়। আবার লোকের কাছে সাধু সাজবার ইচ্ছা আছে। ছেলের অসুখ তো ওর বয়েই গেল। ছেলে বৌকে কবে ভিন্ন করে দিয়েছে।

রেবা একদিন ভাত দিতে দিতে বলে—জানো আজ কালাচাঁদের মার কাছে শুনলাম চচ্চড়ি নাকি কালা শুধু "সাইবডা না চাইটাও খায়।"

আমি কটাক্ষে বলি কথা যে মিথ্যা নয় তাতো আমার পাত দেখেও বোঝ।

তিনি কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিয়ে—আঃ মরন—বলে প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করেন।

হঠাৎ শুনি কালাচাদ নাকি মারা গিয়েছে। আহা! বিধবা মানুষ ঐই এক মাত্র ছেলে। গেলাম একবার। দেখি কালাচাঁদের মা উঠোনময় গড়া-গড়ি দিয়ে ভীষণ কাঁদছে—মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

রেবাকে এসে বলি—ছিঃ রেবা। মানুষকে নিয়ে আর কখনো এমন রঙ্গ ব্যাঙ্গ করো না। দেখ দেখি কালাচাঁদের সত্যি কত অসুখ ছিল। তোমাদের তো বিশ্বাসই হয় না। ভেবেছ মাছ তরকারী নেবার ফাঁকি।

মারা যাবার খবরে রেবার মনটাও নরম হয়েছিল। বললে—কী করে বুঝব বল। সবাই যে ওকে নিয়ে হাসে।

হাসুক। তুমি আর ঐ হাসিতে যোগ দিও না।

তিন-চার দিন পরে দেখি কালাচাঁদের মা আমাদের বাড়ীতে। কি বলব ভেবে পাইনে!

সেই এক গাল হেসে বলে—দুইটা কাঁচাকলা নিতে আইছি দাদা ঠাউর। অবিশ্যি ও করতে অইব। কালা তো দিব্যি সগ্গে চইলা গেছে। আমরা রইছি পিথ্বীতে দুঃখু ভোগনের লইগ্যা। কাঁচাকলা সিদ্ধ বাহারের লাগে। আর এই কয়টা দিন গেলেই শুদ্ধ অমু।

আমারই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কাঁচকলা চাল দিয়েছি। কেবল একটু ঘুমের আমেজ এসেছে। কানে এল, "কনকি বৌঠাইন। লাল আমার নাতি না? ও কী দিয়া ভাত খাইব হেই কথা আমি চিন্তা করুম না। ছেইলারে ভিন্ন কইরা দিছি দেইখ্যা কি অইছে। জল কাট্‌লে দুই খান অয়? আপনেরা জ্ঞানী মানুষ। আপনে গো কি কমু।"

রেবা ঘরে আসতে বলি—লালচাঁদের জন্য মাছ নিতে এসেছিল?

হ্যাঁ, আশ্চর্য। বৌ-এর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া, ছেলে শুদ্ধ ভিন্ন করে দিয়েছে।

অথচ মজা দেখ নাতির জন্যে দোরে দোরে মাছ চেয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষের যে কী হয়!

স্নেহ এমনি জিনিস। বোঝে না বলে ঝগড়া করে তবু মমতাটা কোথায় যাবে।

শুনলাম লালচাঁদের চাকুরী হয়েছে। অর্থাৎ অবিনাশ বাবুর সঙ্গে রাঁচি গিয়েছে। সেখানে তার বাসায় এখন একটু কাজকর্ম করবে পরে তিনি সুবিধা মত কোন চাকুরি দিয়ে দেবেন। শুনে খুশী হই—যাক। না হলে ওদের চলবেই বা কী করে।

আবার দেখি লালাচাঁদের ঠাকুমাকে বঁড়শি হাতে। অবাক হয়ে যাই। বলেই ফেলি—ও কালার মা, নাতি তো চাকুরি পেয়েছে এখন আবার মাছ ধরছ কার জন্যে?

আপনে গো ছিচরণের আশীর্বাদে লালচাঁদের একটু কাম অইছে। পেট তো আছে বাবু খাইতে অয়ই। শাগপাতা যা রান্ধি খাইতে বাহার লাগে। আমার একটা মেকুর আছে। তেইটা মাছ ছাড়া ভাত খাইতে পারে না। অবলা জীব, না খাইয়া থাকব; হেরই লইগাই বস্তি বাইতে আছি। বৌ-ঠাইনরে কইবেন তো আমার রঙ্গির লইগা যেন এট্টু-মাছ আমারে দেয়। তেনার দয়ার শরীর। হাত ঝাড়লেই আমাগো পর্বত পরমান।

আচ্ছা যেও। বলে চলে আসি।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলো এরও পাঁচ সাত দিন পরে। একদিন দুপুরে ওপাড়া থেকে ফেরার সময় কালাচাঁদের বাড়ীর পেছন দিয়ে আসতে শুনি—শাশুড়ী, বৌ তুমুল ঝগড়া চলছে। "নিচ্চয় তুই হিংসা কইরা আমার মাছ মেকুররে দিয়া খাওয়াইছচ। নিজের তো ক্ষেমতা নাই। আমি এই বাড়ী হেই বাড়ী থনে কত কষ্ট কইরা একটু মাছ আনি। আর তা তেনি মেকুররে দিয়া খাওয়ান। তরে দেই না। দিমু ক্যান? তুই আন ক্ষেমতা কইরা। আউজগা তর মাংস আমি খামু হারামজাদি।"

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীটা পেরিয়ে চলে আসি। অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। রেবাকে কিন্তু কিছু বলি না।

* হাওড়া বার্তা: শারদীয়া, ১৩৭০।

অপদার্থ

'কপালে না থাকলে ঘি ঠক ঠকালে হবে কি?' প্রবাদটি বলতেন আমার ঠাকুরমা। সেদিন একথার মানে বুঝিনি, আজ বুঝতে হচ্ছে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়। ঠাকুর মা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমি যে অদূর ভবিষ্যতে একজন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে ছাড়ব না, একথা জোর গলায় প্রচার করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। ম্যাট্রিকের ফল বেরুলে দেখা গেল আমি বিশ টাকা জলপানি পেয়েছি। ঠাকুমা সেদিন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়েছিলেন তাঁর নাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত ভেবে।

মফঃস্বল স্কুলে পাশ করেছি। বাবা আমায় সঙ্গে করে কলকাতায় এনে প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি করে দিলেন। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় থাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে কোঁচার খুটে চোখ মুছে বাড়ী ফিরলেন।

মফঃস্বলের ছেলে কলকাতার চাক চিক্যে কিছুটা মুগ্ধ হলেও সব কিছুই বড় অদ্ভুতমনে হতো, ভাল লাগতো না। সেই আত্মীয়েরছেলে রুণুর সঙ্গে ভাব হল। রুণু সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। আমাকে পড়তে দেখলেই এমন ব্যঙ্গোক্তি করত যাতে পড়াটা একটা অপরাধ বলেই আমার মনে হতো! পরে অবশ্য জেনেছিলাম রুণু আজ কয়েক বছর ধরেই কায়েম হয়ে আছে।

যাই হোক আই. এ পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল থার্ড ডিভিশন। খুবই দমে গেলাম। তবে রক্ষা ঠাকুমা তখন স্বর্গতা, আর বাসায় থাকতে সাহস হলনা, মেসে চলে গেলাম। শেষ রক্ষা হ'ল এম. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেলাম। চাকুরীও একটি ভালই জুটে গেল। পঞ্চ-বার্ষিক স্কীমে। মোটা মাইনে। ঠাকুমার ভবিষ্যবানী সফল হল! হায় ঠাকুমা। তুমি তো আমার এ ঐশ্বর্য দেখলে না!

একদিন দেখি সেক্রেটারী ফিসারীর রিপোর্ট দিচ্ছেন---এত মন মাছ, এত মন বরফ, এত ওয়াগন।

আমি হাঁ করে তাকিয়েই আছি দেখে বল্লেন কী মুস্কিল, আমাদের ফিসারীর রিপোর্ট দিতে হবে না? বলে বিজ্ঞজনোচিত হাসেন।

অফিসের পর বেরিয়ে যাই ফিসারীর খোঁজ নিতে। দেখি মিষ্টার বোসের ফিসারীতে গরু চরছে। আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়ি যে বাড়ি ফিরতে গভীর রাত্রি হয়ে যায়। পরের দিন বোসকে সে কথা জানাতে তিনি অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যান এবং কী এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে এর কয়েক দিন পরেই আমার চাকরি যায়। অপরাধ কী বুঝতেই পারলাম না। কিছুদিন পরে ফুড কমিটিতে আবার চাকরি জুটলো। আবার সেখান থেকেও বিদায় নিতে হল। আজ বুঝতে পারছি ঠাকুমা আমার কী সর্বনাশ করে গেছেন!

নীতি কথা বুড়ী আমার মগজে এমন ভাবে সেঁধিয়েছেন যে, আমার সাধ্য নেই তার ব্যতিক্রম করার। পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়ের এমন একটি গণ্ডী টেনে দিয়েছেন যে, নিজে তো দূরের কথা অপরকে চুরি করতে দেখলেও নিশ্চেষ্ট থাকতে পারিনে। ফলে আমার সহকর্মীদের অসুবিধার জন্যই সঙ্গে সঙ্গে চাকুরি খতম।

ফুড কন্‌ট্রোলার অফিসের চাকরি যাবার পরে আর চাকুরি জুটছে না। আমার মত ভাল ছেলের বিবাহ কার্যটি সমাধা করতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিছু মাত্র বিলম্ব করেন নি। ও কাযটি সমাধা করেছি বহু পূর্বেই। এখন প্রিয়ার সেই মৃণাল বাহুই যেন সাঁড়াশীর আকারে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

আনমনে রাস্তা দিয়ে চলছিলাম, হঠাৎ দেবেন এসে আমার হাত ধরে বলল—কোথায় যাচ্ছিস্?

কোথায় আর যাব। চাকুরি নেই, সেই ধান্দায়ই সারাদিন ঘুরি। তুই এখন কি করছিস?

আমি, আমার সেই মুদী দোকানই অক্ষয় হয়ে থাকুক। আমি আর আর—কিছু চাই না। বলে দেবেন হাত জোড় করে মাথায় তোলে।

মুদীর দোকানে কী এমন লাভ যে, তুই এতে এত খুশী?

সে অনেক কথা, তোরা ভাল ছেলে, তোদের বলতে ভরসা হয় না। তবে আমার মনে হয় যে কোন চাকুরির চেয়ে এটা অনেক ভাল। তোদের তো আরও সুবিধা। দেখিস্‌নি, কোন কোন দোকানের সাইনবোর্ড থাকে, 'হিন্দু পাঁঠার দোকান', 'পাদুকালয়'—এন. সি. ভট্টাচার্য বি. এ। সে দোকানের সম্মানই আলাদা। তোর সাইন বোর্ড যদি দিস 'কে. কে. মুখার্জি, এম. এ.' তখন বিকি-কিনি সাঁ সাঁ করে বেড়ে যাবে। লোকের একটা আদর্শ হবে। তা ছাড়া আরও একটা সিক্রেট আছে, সে সব আস্তে আস্তে ডেকে বলে দেব। হাজার হলেও তুই ছেলেবেলার খেলার সাথী। এই তো বিডন ষ্ট্রীটেই আমার বাড়ি, চলনা যাওয়া যাক্।

'কপালে না থাকলে ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি?' শেষ পর্যন্ত দোকান দিয়েছিলাম। বন্ধুবর কথার খেলাপ করে নি। সিক্রেট বলেছিল, চালে কাঁকর মেশাতে হবে, ময়দায় পাথর কুচি, কালো জিরেতে কয়লার গুঁড়ো, এমন কত কী। কিন্তু কিছুই আমি পারিনি। ঠাকুমার সেই নীতির জঞ্জালই আমার কাল হল। এই নীতির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আমি কী করে এই রাজত্বে বাস করি! এসব পারি তো নি-ই, উপরন্তু বাকী ফেলে বহু টাকা লোকসান দিয়ে দোকান তুলতে হয়েছে। এরপর দীর্ঘ দিন বেকার। কুললক্ষ্মী আমার উপর বিরাগ ছিলেন। এবার গৃহলক্ষ্মীও মুখ ঘোরালেন। তার কোকিল কণ্ঠ আমার কর্ণে ঝা ঝা রবে কাণ ঝালাপালা করতে থাকে। একদিন এ দুঃখের অবসান হয়। একটি স্কুলে টিচারী পেয়ে যাই। অনেক দিন পরে মনে বেশ একটা শান্তি পেলাম। এখানে তো আর কোন ঝামেলা নেই। গৃহিণীকে বলতে তিনি জবাব দেন, হায় কপাল! শেষ পর্যন্ত স্কুল মাষ্টারী! একে কেউ চাকুরি বলে? জান স্কুল মাষ্টারকে কেউ মেয়ে দেয় না?

ওই কাজটি পূর্বেই সমাধা করে ফেলেছি বলে আজ স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু মুস্কিল করেছে ডাইভোর্স বিলটি পাশ করে। বলি সঙ্গে টিউশনি করব! খুব খারাপ হবে না।

হ্যাঁ তুমি করবে সবই। লোকের কাছে পরিচয়ও দেওয়া যাবে না!

বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। আহা! কী দিনই গিয়েছে। একবার সাত পাক ঘুরতে পারলে স্ত্রীকে ধরে বঁটি দিয়ে কাটো না, কারুর 'রা' করার সাধ্য ছিল না। আর আজ চাকরি করব, তাও হাতের তেলোয় প্রাণ নিয়ে। এই বুঝি কোর্টের নোটিশ আসে।

যাই হোক দিন একপ্রকার চলছে। বছর পাঁচেক কেটে গেছে, এখনো মাষ্টারীতে বহাল তবিয়তে আছি। সুখ না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য আছে। নিরুদ্বিগ্ন জীবন। ছাত্রদের মাঝে ভালই থাকি। বাড়ীতে কয়েকটি জীবের আমদানী করেছি। ঠাকুমা বলতেন, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।" আমি তো এ প্রবাদের কিছু লক্ষণ দেখছিনে। অমলার মেজাজ উত্তরোত্তর বাড়ছে। তেমনি আমারটা খাদে নামছে। অনেকটা যেন জাঁতাকলে ইঁদুর পড়ার অবস্থা। অমলা মাঝে মাঝে বলে এই জন্যেই কি এত লেখাপড়া শিখেছিলে!

বলতে ইচ্ছা হয়, শিক্ষকতা করার জন্যে লেখাপড়া দরকার নয় তো কি জুতো ব্রাস করার জন্য লেখাপড়ার দরকার? সামলে নি।

আজ বড় গরম। গ্রীষ্মের রাত্রি গরম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে চল্লিশ টাকা ভাড়ার বাড়িতে হাওয়া আলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে গরমটা অসহ্য মনে হচ্ছে। ঠাকুমা বলতেন, ভগবানের রাজত্বে হাওয়া আলো ধনী দরিদ্র সমান ভাবেই ভোগ করে। সে দিনের ভগবানের বুদ্ধি বোধ হয় কিছু মোটা ছিল। না হলে দরিদ্রকে অবশ্য হাওয়া আলো দিতে যাবেন কেন?

ওগো! ওগো!! শিগ্‌গির ওঠ।

ধরফরিয়ে উঠে বসি। কী হয়েছে?

কম্পিত কণ্ঠে জবাব আসে, চোর, চোর, পাশের বাড়ি চোর ঢুকেছে।

এই কথা! ঘরে চোর ঢুকেছে তাতে তুমি এমন অস্থির হচ্ছ কেন? চোর কি বাইরেই থাকবে?

অমলা হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থেকে ডুকরে ওঠেন।—হা ভগবান! শেষ পর্যন্ত রাত্রি জেগে বুঝি মাথার দোষ হল?

আমি যে সম্পূর্ণ সুস্থ তার প্রমাণ দেবার জন্য অমলার একখানা হাত ধরে বলি—রাত্রি জেগে কেন শরীর খারাপ করছ, শুয়ে পড়।

তিনি ছিটকে দু-হাত সরে বসেন।—উঃ কি সর্বনেশে মানুষ গা!—পাশের বাড়ি চোর এসেছে শুনে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। কাল যদি তোমার বাড়ি ঢোকে?

কী করে বোঝাই যে সেটা একটুও অসম্ভব নয়। মনটা বিষিয়ে ওঠে। উঃ কি বাজে হৈ হৈ না মানুষ করতে পারে! অমলাও ভয় পেয়েছে। হাজার হলেও মেয়ে মানুষ। রাত্রিতে চোর ঘরে ঢুকে কতটুকু কী নিতে পারে? চোরের অগ্রগতির খবর এরা কী করে জানে! যতই ওরা ইংলিশ চ্যানেল পার হোক, আর হিমালয়ে উঠুক। আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র চোর এক কলমের খোঁচায় যে কত লাখ টাকা কামায়, তা স্কুল মাষ্টার-গৃহিণী অমলা জানবে কী করে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে অমলা সখেদে চলে যায়। পাশের বাড়ি তখন গুঞ্জন শুনছি—খুব সময়ে উঠেছিলাম। চোর কিছুই নিতে পারে নি।

চোর আমার মাসতুতো ভাই তো নয়ই—ভায়রা ভাইও নয়। তবু বেচারার জন্য দুঃখই বোধ করি। ওদের বিভাগের উন্নতির খবর কিছুই জানে না তাই অজস্র লাঞ্ছনা জুটতে পারে জেনেও রাত্রিতে এসেছে চুরি করতে। মনে পড়ল ঠাকুমার প্রবাদ—'কপালে না থাকলে ঘি·········।

অপদার্থ আমরা দু-জনেই। *

* রূপলেখা: অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮।

বাধ্য

এ আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কি আশ্চর্য। এটা একটা কঠিন কথা নাকি?

তুই বুঝতে পারছিস না তনিমা, তপুকে রেখে যাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

এইবা তোমার কেমন আব্দার! তপুকে রেখে যেতে পারবে না, সব জায়গায়ই মেয়েকে নিয়ে যাবে এ একটা কথা হল? ও তো বড় হয়েছে, অরুণ-বরুণকে তো আমি এতটুকু সময় থেকে রেখে যাই। যত আদুরেই হোক, তা বলে তাকে শেখাতে হবে না? আচ্ছা আমি বলছি--তপু, অ তপু, এদিকে শোন। বলে উচ্চ কণ্ঠে তনিমা হাক দেয়।

ত্রস্ত পদে একটি ছিপ ছিপে সুন্দরী মেয়ে এসে—আমায় ডাকছ মাসিমা? বলে বেণী দুলিয়ে তনিমার কোল ঘেসে দাড়ায়।

তনিমা বলে—এত ছুটেছিস কেন? কি করছিলি? আমি আর তোর মা ছটায় শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

ঘাড় দুলিয়ে আচ্ছা তোমরা যাও, আমি অরুণ-বরুণকে দেখে রাখব অখন। বলে ছুটে চলে যায়।

তনিমা হাঁ হয়ে মেয়ের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের আড়ালে হলে বলে এ কী করে সম্ভব হল তনু, আমি যাব অথচ তপু যাবে না। শুধু তাই নয় আবার অরুণ-বরুণকেও দেখে রাখবে বললে।

তনিমা গর্বিত ভাবে বলে—শিক্ষা দিতে জানলে এমন হয়! আসল হ'ল শিক্ষা পদ্ধতি, আমার ছেলেদের দেখছ না?

পরের দিন বিকেলে তপু বলে মাসিমা—মেশোমশাই এলে কী খেতে দেবে? দাও না আমি কিছু খাবার করে রাখি।

তনিমা হাঁ হয়ে বলে—তুই খাবার করবি? বলিস কি? তুই যে রান্নাঘরের ছায়াও মাড়াতে চাসনে। কত দিন মাংস বসিয়ে বলেছি তপু একটু নেড়ে চেড়ে দিস, আমি এই কাজটুকু সেরে আসি, তা কখনো মেয়ে রাজি হয় নি।

তুমি চুপ কর তো। বলে তপু রান্না ঘরে ঢোকে। সুন্দর খাবার তৈরী করে

সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। মেশোমশাইয়ের সুখ্যাতি ধরে না—দেখ তপু মা যা খাবার করেছে এ তোমরা করতে পারবে না। তপতি আর দুটি ক্ষীর পুলি মেশোর পাতে আর অনিলের পাতে তুলে দেয়।

অনিল লাল হয়ে ওঠে। অনিমা বলে কিরে অনিল, চুপ করে খেয়েই যাচ্ছিস, কেমন হয়েছে বললি না তো ?

অনিল 'ভাল' বলে খাবার শেষ করে। তপতি বলে, ভাল বললে আরও দিতে হয় তাই না মাসিমা ?

অনিল সভয়ে বলে ওঠে—বাপ! আর একটুও নয়। আমার পেট ভরে গেয়েছে।

তা বলে তো নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না। বলে তপতী আরও দুটি দেয়।

একদিন বিনোদবাবু অফিসে যাবার সময় তপতী এসে জুতো পরিয়ে দেয়, শুধু বিনোদবাবুকে না অনিলকেও। অনিলের কোন বাধাই শোনে না।

অনিমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। মাত্র বিশ পঁচিশ দিন হল তপুর পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। এরি মধ্যে মেয়েটা যেন আমূল বদলে যাচ্ছে, অবশ্যি তনিমার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার গর্ব আছে। কিন্তু এত অল্প দিনে তপতীর এমন অভাবনীয় পরিবর্তন কী করে সম্ভব হল ? ভগবান তার দিকে সুপ্রসন্ন হয়েছেন। অনিমা যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে।

বৈকালিন সাধারণ প্রসাধন শেষ করে তপতী যখন এসে মা মাসির কাছে দাড়াল, তখন অনিমার মনে হল মেয়ে তো তার বেশ সুন্দরী। আশ্চর্য! সে মা হয়েও মেয়ে যে এমন সুন্দর জানত না। হাল্কা নীল রং-এর একখানা শাড়ী আঁটোসাঁটো করে পরেছে। মুখে সামান্য পাউডারের প্রলেপ, চোখে কাজল, একরাশ চুলের এলো খোপা ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সব চেয়ে সুন্দর লাগছে খুশী-খুশী মুখখানা। অনিমা ভাবে মানুষ যখন ভাল হয় তখন কি সব রকমেই হয়। নয়ত এই মেয়েকে একটু সেজে গুজে থাকার জন্য কি কম বকাঝকা করতে হয়েছে ? চুলটা পর্যন্ত বাঁধতে চাইত না। আর আজ একবার বলতেও হয় নি।

তপতী মাসিমার কোল ঘেসে বলে—মাসিমা, আমার একটা কথা রাখবে ?

কী কথা রে তোর ?

আগে বল রাখবে কি-না ? রাখতে তোমাকে হবেই। সে দিন আমরা

সিনেমায় যাই নি, আজ অনিলদা অরুণ-বরুণ আমি যাব। একটা খুব মজার বই হচ্ছে। যাচ্ছি কিন্তু।

অনিমা হেসে ফেলে—খুব তো অনুমতি নিচ্ছিস। ফিরে এসে বললেই পারতিস।

বারে! আমি তো জানিই তুমি কখনো না করবে না। অরুণ-বরুণও এসে দাঁড়ায়। তনিমা দেখে ওদের সাজও হয়ে গিয়েছে। পেছনে অনিল। জ্যাঠাইমার কাছে আসতে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না।

অনুমতি দিতেই হয়।

অনিমা বলে তুই বাপু জাদু জানিস। জানিস তো তপু অত্যন্ত আদুরে মেয়ে। ওর পরে একটি ছেলে মারা গিয়েছে বলে ওকে কেউ কিছু বলে না। তাই ও কারও কথাই শুনতে চায় না। তোর এখানে এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই তপু আশ্চর্য বদলে গিয়েছে। রাত্রি আটটার পরে জেগে থাকতে ওকে কেউ কখনো দেখিনি। পরীক্ষার সময় পর্যন্ত এ অভ্যাস বদলায় নি। ওর বাবা রাগ করতেন। আমি কত বুঝিয়েছি। কিন্তু মেয়ে আটটা বাজতেই ঢুলে পড়তো। এখন সবার সঙ্গেই স্বচ্ছন্দে বসে খায়। ঘুম ওর ত্রিসীমানায় নেই।

ফুটো পাত্রে জল রাখার মতই ছুটিটা শেষ হয়ে এল। তনিমা শুয়ে ছিল, তপতী এসে কাছে বসে বলে, মাসিমা তোমার পাকা চুল তুলে দেব?

তনিমার পাকা চুল তোলার প্রশ্নই ওঠে না। ওর চুলগুলি নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে তপতী বলে—আচ্ছা মাসিমা তুমি আমায় একটুও ভালবাস না?

মাসিমা হেসে জবাব দেন, তুই কিসে প্রমাণ পেলি?

তবে আমি যে চলে যাব তোমার কষ্ট হয় না?

হয়তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন তো তোকে কলেজে পড়তে হবে। এর পরে ভর্তিই হতে পারবিনে।

তা তো হবে। আমি বুঝি আর এখানে পড়তে পারিনে? বলে তপতী অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে।

তুই থাকবি? তোকে ছেড়ে কি তোর বাবা মা থাকতে পারবেন?

কী যে বল তুমি। পড়া শোনার জন্য মানুষ কী না পারে! যেন এক পাকা গিন্নীর জবাব

আচ্ছা দেখি পরামর্শ করে। আমার তো মেয়ে নেই তুই থাকলে আমার তো ভালই লাগে।

দেখা দেখিস কী আছে ? মেশোমশাই বা মা, বাবা, কখনো তোমার উপর কথা বলবেন না। আর আমি কী কখনো তোমার অবাধ্য হয়েছি ? বল, চুপ করে থেক না।

তুই তো খুবই লক্ষ্মী মেয়ে। মাকে ছেড়ে তুই নিজেই থাকতে পারবি না।

ধ্যাৎ। আমি কি এখনো ছোট্ট আছি। তুমি যে যেতে দেবে না তা আমি অরুণ-বরুণকে বলে আসি। বলেই ছুট।

অনিমা সস্নেহ নয়নে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়দিনই বা মেয়েটা এসেছে, এরই মধ্যে সবাইকে মুঠোয় পুরে নিয়েছে। অরুণ বরুণ অনিল তো বটেই, ওর মেশোমশাই পর্যন্ত ওকে না দেখলে অস্থির হয়ে ওঠেন। অনিমা আজ যেন নূতন করে মেয়ে না হবার দুঃখটা অনুভব করে। সত্যি মেয়েরাই ঘরের সৌন্দর্য। ছেলেরা তো সারাদিন বাইরে দামালপনা করেই কাটায়— মেয়েই ডাকের লক্ষ্য। কবি মিথ্যা বলেন নি প্রজাপতি দক্ষের একুশ মেয়ে রাজপুরী আলো করে ঘুরতেন ফিরতেন।

শেষ পর্যন্ত অনিমার একাই ফিরতে হয়। দুঃখ হলেও নিজেই ভাবেন এখানে যখন তপতীর এমন সুন্দর স্বভাব হচ্ছে তখন কিছুদিন থাকলে হয়তো স্বভাবটা আমূল বদলে যাবে।

বছর খানেক বড় আনন্দে বড় সুখে কেটে যায়। তপতী পূজার ছুটিতে গ্রীষ্মের ছুটিতে ২।১ বার মা, বাবার কাছে থাকেনি, মাসিকে এসে বলেছে তোমাদের জন্য বড্ড মন কেমন করে তাই চলে এলাম। অনিমার নিজের সম্বন্ধে একটা মস্ত ধারণা যে সে ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিতে জানে, বশ করতে জানে। কিন্তু এ মেয়েটার কাণ্ড কারখানা যেন তাকেও হারিয়ে দিচ্ছে। এতটা আশাই করা যায় না।

হঠাৎ অনিল দিল্লি বদলী হয়ে যায়। বাড়িটা অনেকখানি খালি হয়ে যায়। ওদের দুষ্টুমির সেই ছিল পালের গোদা। বাড়িটা মিইয়ে পড়ে।

তপতীর ঘরে গিয়ে দেখে, তপতী বই কোলে করে বসে আছে, দৃষ্টি জানালার বাইরে। চোখে জল পড়ছে।

তুই কাঁদছিস ?

তপতী চমকে ওঠে, চোখটা চেপে ধরে বলে, কী যেন একটা পড়ল !—বলে চোখ রগড়াতে থাকে।

আমার কাছে লুকাসনে, বল কাঁদছিলি কেন ? মার জন্য মন কেমন করছে ?

না—গো—না মোটেই কাঁদিনি। তোমার যত কথা! আচ্ছা মাসিমা, চলনা এবার পূজোয় আমরা কোথাও ঘুরে আসি।

কোথায় আবার ঘুরতে যাবি? তুই তো ছুটি হলেই মার কাছে চলে যাবি।

মার কাছে তো প্রতিবারই যাই, চলনা আর কোথাও ঘুরে আসি।

আচ্ছা দেখি। বলে তনিমা চলে যায়।

তনিমা চিন্তিত হয়ে পড়ে। এতদিন পরে মেয়েটার যে কী হল? সেই হাসি নেই, উৎসাহ নেই, ঘরের কোণ হতে বেরুতে চায় না। ভালয় ভালয় মার জিনিস মার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়। কে জানে, আদুরে মেয়ে ভেতরে ভেতরে হয়ত মার জন্য মন কেমন করে। খেয়াল মিটে গেছে, এখন আর ভাল লাগছে না।

একদিন বিকেলে তনিমা ওর ঘরে ঢুকে দেখেন, তপতী অনিলের একখানা ফটো নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে। এমন বিহ্বল হয়ে দেখছে যে তনিমার আগমন টেরই পায়নি। তনিমা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। তাঁর চোখের উপর থেকে যেন একটা কালো পর্দা সরে যায়। চোখে মুখে কৌতুক খেলে যায়। চোখের উপর বহুদিনের বহু ছোট বড় ঘটনা ভেসে ওঠে, আজ সে সব হেঁয়ালী ঘটনার মানে বুঝতে একটুও দেরী হয় না। তাড়াতাড়ি কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসে—

পূজনীয়া

দিদি!

তপু আমায় এমনি মায়ায় বেঁধেছে, ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। কিন্তু তোমার তো ওকে পরের ঘরে পাঠাতেই হবে। তপুকে আমায় দাও। মেয়ে তোমার কিছু অযত্নে থাকবে না। আর অনিলও আমার কিছু খারাপ ছেলে নয়। তুমি রাজি তো? আমি কাকিমা হলেও আমার কথার উপর অনিলের বাবা মা কিছু বলবেন না। আমার আর দেরী সইছে না। চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। তোমরা প্রণাম নাও। ইতি—

প্রণতা—তনিমা।

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে তনিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

* রূপলেখা: কার্ত্তিক, ১৩৬৯।

বেল পাকলে

বর কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল এই সুশ্রী মেয়েটিকে। সাজ পোষাক জমকালো নয়, অতি সাধারণ। বিয়ে-বাড়িতে বেমানান! কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। সাজের দৈন্য চোখেই পড়ে না, বরং এক-নজরে অপূর্ব বলেই মনে হয়।

মেয়েটি খুব যে একটা বরের কাছে ঘেঁসছে তাও নয়। কোথাও দাঁড়াবার ওর উপায় নেই। পুরুত পৈতে চাচ্ছেন: কৈ রে দীপালী: মিন্টু কাঁদছে, দীপু ওকে খাইয়ে দে! বর-যাত্রীদের যেন ঠিকমতো দেখাশোনা হয় দীপু!

এরকম অনেক কথাই বরের কানে গেছে। চরকীর মতো ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছিল দীপালী।

বাসর নীরব হতেই বর জিজ্ঞেস করে—দীপু তোমার বোন?

হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ নীরবতার পরে বলে—কই, তোমায় যখন দেখতে এসেছিলাম তখন তো ওকে দেখিনি!

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধস্বরে জবাব দেয়, ওকে তো দেখতে চাও নি।

ইন্দ্রাণীর স্বরের ক্ষুব্ধতা বুঝে বিমল একটু হেসে অন্য কথা আরম্ভ করে। পরের দিন ভোর হতেই বিমলের যা কিছু প্রয়োজন দীপুই হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। কিন্তু কাজের তাড়ায় দাড়াতে পারে না। বিমলের সময় এসে যায় বৌ নিয়ে বাড়ি যাবার।

যাবার সময় বিমল কি একটা ঠাট্টা করতেই দীপালীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে বিমল: জল তো নয় যেন মুক্তা ঝরছে, একেই বুঝি কবিরা বলেন মুক্ত-ঝরা কান্না। একটু অপ্রস্তুতও হয়, দীপালী ঠাট্টা সইতে পারে না।

বিয়ের ঝামেলা মিটে যায়। ইন্দ্রানীর শশুর বাড়িতে শুধু একটি দেবর আছে, তার ননদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ইন্দ্রাণী প্রায়ই বাপের বাড়ি ঘুরে আসে। বাপের বাড়ি আসার কথা বলতে হয় না, বিমল গরজ করে নিয়ে

আসে। ইন্দ্রাণীর ভাই-বোনদের জন্য এটা সেটা নিয়ে আসে। দীপুর জন্য আসে প্রচুর জিনিস। বলে, পিঠা-পিঠি দুটি বোন। তুমি তো এখন অনেক পেয়েছ, ওকেও কিছু দেওয়া দরকার।

ইন্দু আপত্তি করে না, বরং আনন্দই পায়। ও দাতা বোন গ্রহীতা। পিঠা-পিঠি দুই বোন, ইন্দ্রাণী আর দীপালী দেড় বছরের ছোট বড়। বাপ-মায়ের সাধ ছিল এক সঙ্গেই দুজনের বিয়ে দেওয়া।

কিন্তু বাদ সাধল দীপু। মেয়ের সেই কান্না—আমি আরো পড়বো ; বিয়ে করব না। কী আর করা যায় দীপুকে রাখতেই হল আরো কিছু দিন।

ইন্দুরা এলে বাড়িতে খুব হৈ-চৈ আরম্ভ হয়। দীপুর জন্যে যা জিনিস নিয়ে আসে দীপু কখনো তা নেয় না। বিমল অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। নিরুপায় হয়ে শাশুড়ীকে পর্যন্ত সালিস মানতে হয়। কিন্তু দীপু কিছুতেই কোন উপঢৌকন গ্রহণ করে না।

বিমল দুঃখিত হয়ে বলে—আচ্ছা দীপু, তুমি কেন এসব নাও না ?

আপনার তো দেবার লোক রয়েছে। পরের দয়া আমার সহ্য হয় না।

আহা তুমি কি আমার পর ? তোমায় না দিলে আমার মন ভরে না। আমি তোমায় দয়া করি না, গ্রহণ করে তুমি আমায় ধন্য কর।

ওসব আদিখ্যেতা করবেন না। পরকে শাড়ী কিনে দেবার মত আপনাদের অবস্থা নয়। তা হলে আর শ্বশুরের টাকায় বিয়ের খরচ চালাতেন না।

অনেকে কণ্ঠ গুঞ্জন করে উঠে থামিয়ে দেয় দীপুকে। ছিঃ ছিঃ, নূতন বর তাকে এসব বলা ? কী লজ্জা !

বিমল কিন্তু রাগ করে না বা শ্বশুরবাড়ী আসাও কমিয়ে দেয় না। পরের সপ্তাহে আবার আসে।

এবার আর কিছু দেওয়া নয়, সিনেমায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলে দীপুকে। সময়মত তৈরী হয়ে বিমল ও ইন্দু ডাকতে আসে দীপুকে।

দীপু যাবে না।

ইন্দু হাত ধরে বলে—আয় ভাই আর দেরী করিস না ; টিকিট কাটা হয়ে গেয়েছে যে।

আর কাউকে দিয়ে দাও। সিনেমা আমার ভাল লাগে না।

দীপালী কিছুতেই গেল না।

ইন্দু চটে যায় দীপুর ব্যবহারে। মেয়ের ভারী দেমাক, বিমলের একটু কথা

রাখে না। ইন্দু অনেক পেয়েছে, মন এখন পরিপূর্ণ। তাই বোনকে একটু আধটু দয়া-দাক্ষিণ্য করতে না পেরে ওরও মেজাজ বিগড়ে যায়।

বিমলকে বলে—ওটা অমনি অসভ্য। ওকে আর কখনো কিছু দিও না।

বিমল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। রূপালী পর্দায় হাসি কান্না ওর চোখে ধরা পড়ে না। তাই ইন্দু যখন "ন্যাকামি দেখ" বলে আর একটু ঘন হয়ে বিমলের হাতে চাপ দেয়, তখন বিমল রীতিমত ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে অ্যাঁ, হ্যাঁ বলে ওঠে।

ইন্দুর অভিমান হয়।—তুমি কিছু দেখছ না।

বিমল ইন্দুর গালে টোকা মেরে বলে—তোমায় দেখছি। ইন্দু 'যাও' বলে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে ওঠে।

শনিবার এলেই শান্তিপুর শ্বশুর বাড়ি যাবার জন্যে বিমল তৈরী হয়। ইন্দু গর্ব বোধ করে; তাকে খুশী করার জন্যেই বিমল সপ্তাহের এই ছুটির দিনটিকে একটুকু উপভোগ করে না। এমন কি বন্ধুবান্ধবের বাড়ি পর্যন্ত যায় না, বা কেউ আসতেও চাইলে নিষেধ করে দেয়।

এবার নিয়ে আসে কতগুলি লেবু। দীপুকে বলে, এবার তো আর খাইনে বলতে পারবে না। আমি জানি লেবু তুমি খুব ভালবাস।

আমাকে খাইয়ে আপনার লাভ?

আচ্ছা দীপু, তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়ার সম্পর্ক? কেন তুমি আমার উপর এত চটো?

আমার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমি খুবই অপছন্দ করি। আপনার তো মনোযোগ দেবার লোক রয়েছে।

কি আশ্চর্য শুধু তোমার দিদিকে সব দিলে আমায় স্বার্থপর বলবে না?

আমার বলায় আপনার কী এসে যায়? আমি তো পণ নেবার জন্যও আপনাকে স্বার্থপর বলি!

ও! এই জন্যই আমার উপর তোমার এত রাগ! পণ কি আমি চেয়েছি? মামা চেয়েছেন, আমি কী করতে পারি?

আহা কি মামার অনুগত ভাগ্নে! বিয়ের সময় ছেলেরা বাবার আর মামার বাধ্যই হয়ে থাকে। বলি—এই যে আমার জন্যে এটা সেটা আনছেন, তা মামাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন তো?

বিমল মুখখানা করুণ করে জিজ্ঞেস করে, যে টাকা পণ নেওয়া হয়েছে তা যদি আমি ফিরিয়ে দিই, তবে তোমার রাগ পড়বে তো দীপালী?

কেন? আমরা কি কালীঘাটের কুকুর যে, দিয়ে ফিরিয়ে নিতে যাব? আপনার দাক্ষিণ্যের আমাদের প্রয়োজন নেই।

এরপর আর কথা এগোয় না। পরের সপ্তাহে বিমল আর শান্তিপুর যাবার নামও করে না ; অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে। ইন্দুকে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তোলে। ইন্দুকে বুকে নিয়েও কোথায় যেন এক অতৃপ্তির আগুন দাউ দাউ জ্বলতে থাকে। বিমল আবার যায় শান্তিপুর। এবার আর দীপুকে কিছু বলে না। ইন্দুকে নিয়ে মসগুল থাকে, ইন্দুকে নিয়ে সিনেমায় যায়, আর অলক্ষ্যে কী যেন লক্ষ্য করে। ক্রমেই বিমলের মুখ গোমড়া হয়ে ওঠে। গোমড়া মুখেই বিদায় নিতে হয়।

শাশুড়ী প্রমাদ গোণেন, কী জানি ত্রুটি হয়েছে! বিমল এত বিষণ্ণ কেন? ইন্দুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাসেটা জিজ্ঞেস করেও কোন হদিস না পেয়ে রাগ করতে থাকেন দীপুর উপর। তোর মা কথাবার্তার ছিরি-ছাঁদ নেই! নিশ্চয়ই তোর ব্যবহারে বিমল চটেছে।

দীপু নির্বিকার।

এমন করে বছর চার কেটে যায়। দীপুর পড়া সমাপ্ত হয়েছে। বিমলের আসা অব্যাহতই আছে। দীপুকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু করার উপায় নেই ; তবে শ্বশুরবাড়ি প্রচুর সাহায্য করে, ছুতোয় নাতায় অঢেল উপঢৌকন এসে যায়। তাই বাবা মাও মেয়ের বিয়ে দিয়ে বড় সুখী।

দীপালীর বিয়ের জন্য বাবা উঠে পড়ে লাগেন। অনেক জায়গায়ই বিমলকে সঙ্গে নিয়ে পাত্র দেখতে যান। বিমলের ঠিক পছন্দমত পাত্র আর জোটে না। একটি প্রফেসার পাত্র দেবেনবাবু মনোনিত করেন। বিমলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বিমল বেঁকে বসে। আজকাল প্রফেসারের আর আয় কী। খাটুনীই সার! অন্য পাত্র দেখুন। না হয় আমি দেখছি।

আরেকটি পাত্র খুবই ভাল, ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে বলে সেও বিমল নাকচ করে দেয়। তারপর যে সম্বন্ধটি আসে সেটির যেমন বাড়ির অবস্থা তেমনি চাকুরি, দেখতে শুনতেও চমৎকার। দেবেনবাবু বলেন বিমল এবার আমাকে তোমার প্রশংসা করতেই হবে। সব রকমে চমৎকার একটি সম্বন্ধ পেয়েছি----চল দেখবে।

বিমল কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে চলুন ;দেখা যাক। পাত্র বিমলের পছন্দ হয় না যদিও সব দিক বিবেচনা করে লোকে ভাল সম্বন্ধই বলবে। কিন্তু বিমলকে

ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়। পাত্রের চাউনিটা কেমন যেন বোকা-বোকা। এ ছেলে কোন রকমেই চলতে পারে না।

দীপুকে বলে—দেখো তোমার কী সম্বন্ধ করি।

দীপু জবাব দেয়—এখন রাজপুত্র নেই, মন্ত্রীপুত্র আসবেন বুঝি ?

কী আনব তখনি দেখবে।

দীপুর চোখে মুখে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ খেলে যায়। একটু হেসে বলে—কোন কোন মানুষ খুব পরোপকারী হয়, তাই না জামাইবাবু ? শুধু মানুষ কেন ? কাক তো একটা পাখী, বেল পাকলে কাকের কী ? তবু কাক খুশী হয়।

বিমল নিঃশব্দে রাগ দমন করে উঠে যায়। এই মুখরা মেয়েটার সঙ্গে আর কোন রকমেই এঁটে ওঠা গেল না।

* মহিলা মহল : শারদীয়া, ১৩৬৭।

মিষ্টি আর মুখমিষ্টি

কেবল রুটি আর রুটি খেয়ে পেটে চড়া পরে গেল। যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তার আর কী হবে? মাইনে পেয়ে সাত দিন না যেতেই পকেট গড়ের মাঠ! বহুদিনের সাধনায় যে মাসে নূতন কাপড় কিনে আনতে যাই, দেখি সাটটি গেছে। তবু জিভও তো একটা আছে, তার বায়নাক্কাও আছে। কদিন ধরেই রুটির নামে জিভ শুকিয়ে কাঠ আর মিষ্টির নামে এমনি জল যে ঝরছে সামলানো দায়। একদিন যে করেই হোক মিষ্টি খেতে হবে।

রুমিকে বলি—ছাখ রুমি, চল কোথাও মিষ্টি খেয়ে আসি।

হ্যাঁ, তোমার জন্য সবাই মিষ্টি সাজিয়ে বসে আছে।

পৌরুষে আঘাত লাগে, বলি—তুই কি মনে করিস আমাকে কেউ মিষ্টি খাওয়ায় না!

বেশ তো খেয়ে এসো না! কেমন যেন উপহাসভরা কণ্ঠ।

শুধু আমি খাব না, তোকেও খাওয়াব।

'আপনা খেতে নেই ঠাঁই শঙ্করাকে ডাকে'। তুমিই খেয়ে এসো, আমার দরকার নেই।

তোকেও খাওয়াবই।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে এসপ্লানেডে বন্ধু অলকের বাসায় যাওয়া ঠিক করি। বন্ধুবর হঠাৎ বেশ ফেঁপে উঠেছে। বাসা করেছে বটে কিন্তু আমার আর সেখানে যাওয়াই হয়নি। সেখান থেকে ছোট পিসীর বাসাও বেশী দূরে নয়। ওদের অবস্থাও খুবই ভাল। এক ঢিলে দু'পাখী মারা যাবে। দু' জায়গায়ই ঢু মারা যাবে। রুমিও বুঝবে দাদাকে মিষ্টি খাওয়ানোর লোক আছে।

অলককে ফোন করি। খুশী হয়ে ওঠে অলক।

অনেকটা সময় হাতে করে এসো, হৈ-চৈ করা যাবে। সব দিকে পাকা ব্যবস্থা। রুমিকে বলতে খুব খুশী হয়। কোথাও তো যেতে পায় না। তবুও সন্দেহ ঘোচে না, বলে—দাদা, বাস ভাড়া তো অনেক লাগবে?

বিপন্ন হয়ে পড়ি—তোতে আমাতে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবেখন।

ফারাকটা একটু বেশীই। কোথায় দীনেন্দ্র স্ট্রীট। আর কোথায় এসপ্লানেড। তবু মিষ্টি খাওয়ার আনন্দে দূরত্বটা গ্রাহ্য করি না। বন্ধুর বাড়িখানা চোখে পড়তে এত আনন্দ হয়, প্রায় দৌড়তে থাকি।

রুমি চটে ওঠে—রেস দিচ্ছ নাকি?

ঘাম মুছে কড়া নাড়ি। অলক নিজে দোর খুলে আমাদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসায়। কৌচ-সোফায় সাজানো চমৎকার ঘরখানা। কিন্তু ফ্যানটি খুলতে ভুলে যায়। এদিকে হাঁটার গুঁতোয় আমাদের তখন ঝর্ ঝর্ করে ঘাম ঝরছে। এওকি ওদের চোখে পড়ে না? আর ফ্যান থাকতে তো একখানা হাত পাখা চাওয়া যায় না। অস্বস্তি নিয়েই ওদের আনন্দে যোগ দেই।

বৌটিও বেশ আলাপী, তবে খেয়াল বোধ হয় একটু কম; কেন না ফ্যানটি খোলার কথা তারও মনে হয়নি। শ্রীমতী রান্না ঘরে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রুমির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করি। আগে খবর দেওয়া সব তৈরী তো আছেই; এনে দেবার যা অপেক্ষা। নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসি। শ্রীমতীকে দেখা যায় সুশ্রী হাতে সুদৃশ্য ট্রে নিয়ে। সুন্দর হাতে সুন্দর জিনিস কী অপূর্ব মানিয়েছে!

তিনি নিজের সুঠাম হাতে তুলে দিলেন সবাইকে এক একটি গ্লাস। ভেতরে হলুদ রংয়ের পানীয়। অলকই প্রথম চুমুক দিয়ে আঃ করে আরামসূচক ধ্বনি তোলে। রুমির দিকে চেয়ে দেখি সে খাচ্ছে। আমিও মুখে দি, ওঃ হরি! এ যে বিস্বাদ এতটুকু জল আবার তেমন মিষ্টিও না। এ আবার কি ফ্যাসান কে জানে। হয়ত এটা খেয়ে ক্ষুধাকে শানিয়ে নিতে হয়। বড় লোকের ব্যাপার। চোখ কান বুজে জলটুকু গিলে ফেলি।

অলক হেসে ফেলে—কিরে! অরেঞ্জ স্কোয়াস্ অমন করে গিলে ফেলছিস? গন্ধটা তোর ভাল লাগে না?

হ্যাঁ, ভালই তো খুবই ভাল। বড় তেষ্টা পেয়েছিল তাই অমনি খেয়ে নিলাম।

দেবে আর এক গ্লাস?

না ভাই, আর নয়—বলে পুরনো কথায় চলে আসি। সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করি, শ্রীমতী কখন রান্না ঘরে যায়। সন্ধ্যা উত্‌রে যায়। আর কিছু দেবে বলে মনে হয় না।

সে কি! মোটে সন্ধ্যা, এখনি যাবে মানে?

একটু কাজ আছে ভাই।

বেশ লোক। কতদিন পরে এলে আর এখনি যাওয়া? বাড়িটাও তো দেখলি নে?

উঠে পড়ে বলি—চল. বাড়িটা দেখে যাই, বেশ সাজিয়েছ। যেখানে যা দরকার তা তো আছেই,তা ছাড়া চমৎকার কতগুলি চাইনিস্ ছবি টাঙ্গিয়েছ। এ ছবিগুলির মূল্য তো কম নয়। স্বীকার করতে হবে বন্ধুবরের রুচি আছে। বাড়ি দেখা হলে আমরা যাবার জন্য পা বাড়াই।

অলক দুঃখিত স্বরে বলে—এর মধ্যেই যাবি বলে আমি ভাবতে পারি নে, কতদিন পরে এলি!

যেতে কি আমারই ভাল লাগছে—বলে বেরিয়ে পড়ি। হন্‌হনিয়ে পিসীমার বাসায় উঠি।

কি রে, এতদিনে পিসীর কথা তোদের মনে পড়ল? বলে পিসীমা অভ্যর্থনা করেন।

মনে সব সময়ই পড়ে পিসীমা, সময় করে উঠতে পারি না। তা, তুমি কেমন আছ?

আমি? আর বলিস নে। আমি বড় ঝঞ্চাটে আছি। সুকুর খেয়াল বালীগঞ্জে একটা বাড়ি কিনবে। এদিকে হাতে এত টাকা নেই। কদিন কী মন খারাপ। তারপর এদিক সেদিক হতে যোগাড় করে বাড়িখানা কিনেছে। বাড়িটার সুবিধে ভিতটা ভাল, উপরে আরও তিনতলা তোলা যাবে।

তোমাদের এই বিরাট বাড়ি কী অপরাধ করলো?

পিসীমা ঘন হয়ে বসে ফিসফাস করেন—আসল কথা জানিস, বিপদে পড়ে ভদ্রলোক বাড়ি বিক্রি করছে, তাই জলের দামে দিয়েছে। আর সুকুর সখ অনেক বাড়ি করবে! বলে—মা আজকাল একটা ছেলের রোজগারের চেয়েও বাড়ির রোজগার ভাল। ছেলে মাইনে পেয়ে বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয়। অথচ সামান্য সিঁড়ির নীচটুকুও তুমি ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পার!

তা ঠিক।—আমি ঘাড় নেড়ে সাড়া দিই।

হ্যাঁ রে রুমি, তুইও দাদার সঙ্গে এসে গেছিস? যা তোর বৌদি ঘরেই আছে। আমার দিকে চেয়ে বলে—বোনের বিয়ের কী করলি?

কী আর করব। টাকা কই?

শোন কথা টাকা নেই বলে বোনের বিয়ে দিবি নে, না হয় চাকরিতেই

দে। পড়াতেও তো পারলি নে। আজকাল আবার কত মেয়ে নিজেই বর জোটায়। কী ঘেন্না, মাগো!

প্রসঙ্গ পালটাতে বলে উঠি—বৌদি কোথায়?

পিসীমা হাঁক ছাড়েন—অ বৌমা! দিলীপ রুমি এসেছে, ওদের খাবার দাও।

বৌদি কী যেন চুপি চুপি পিসীমাকে বলেন।

পিসীমা টেনে টেনে হাসতে থাকেন—এই কথা! ডালডা নেই তো কী হয়েছে? মাসের শেষ এখন সব বাড়িরই সব জিনিস বাড়ন্ত—এতে লজ্জার কী আছে? ওরা কি কুটুম এসেছে? তুমি রুটি তরকারী নিয়ে এস।

মাথায় বাজ পড়া যে কী আজ বুঝলাম!

পিসীমা বলেই চলেন—বুঝলি দিলীপ, সুকুমারের ইচ্ছা কলকাতার কাছাকাছি অনেকটা জমি নিয়ে পুকুর বা গাছ ইত্যাদি করে। আমার ভয় করে। টাকা ঢাললেই তো হয় না, গুছিয়ে তোলা চাই, এ সব অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার, দেখা শোনা নিয়মমত না করতে পারলে লাভের গুড় পিঁপড়েই খাবে।

চলি পিসীমা। উঠে দাঁড়াই।

সে কি রে এখনই যাবি?

তুমি তো জান কতটা দূর।

মাসের প্রথম দিকে রুমিকে নিয়ে আর একদিন আসিস। আর বোনের বিয়ের চেষ্টা কর। এসব ধিঙ্গি মেয়ে ঘরে রাখা আমার বাপু ভাল লাগে না!

রাস্তায় এসে রুমিকে বলি—চল বাসে উঠি।

সে কি দাদা! একেবারে উদার হয়ে উঠলে যে।

কোন জবাব না দিয়ে বাসের কড়ির জন্যে পকেটে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়াই, ট্যাক যে গড়ের মাঠ!

চল, আস্তে আস্তে হেঁটেই যাই। গলাটা নিজের কাছে কেমন যেন অপরিচিত অচেনা লাগে। মুখমিষ্টিতে কি মন ভরে?—তাই মুখটা তেতো তেতো লাগে! রুমির দিকে সাহস করে চাইতে পারি না।*

* মহিলা মহল: শারদীয়া, ১৩৬৬।

প্ল্যান

জগদীশ বাবু সব সময়ই গুছিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করার তিনি একেবারেই বিরোধী। তিনি সব সময়েই বলেন দেখ—যখন যা করবে তা প্রথম হতে ভেবে চিন্তে করবে। হঠাৎ কিছু করতে গেলে কখনো সে কাজ ভাল হয় না।

একদিন গৃহিণীকে বলেন—দেখ আগামী রোববার আমার পাঁচজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি, এখনো সাতদিন সময় আছে তুমি ভেবে চিন্তে ওদের কী খাওয়াবে লিষ্ট কর।

সুরমা সম্মতি জানায়। প্রতিদিনই সুরমা বলে—এস, কী রান্না হবে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলি।

রান্না কী করবে না করবে তুমিই লিষ্টি করে রাখ। আমি লিষ্টি পেলেই জিনিসগুলি এনে দেব।

সুরমা লিষ্টি দেখাতে গেলে বলেন—এখনো ঢের দেরী আছে, সময় মত দিও এনে দেব।

শুক্রবার লিষ্টি দিতে গেলে বলে ওঠেন—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কাল এনে দেব।

শনিবার জগদীশ বাবুর চা জলখাবারের পর লিষ্ট দিতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠেন, তোমার কি একটু আক্কেল নেই? সমস্ত দিন খাটুনির পর একটু বিশ্রাম করব না এক্ষুনি বাজারে যাও।

গেলাম আবার ওদের কাছে, কী জানি ওরা আবার ভুলে গেল নাকি, এখন আর লিষ্টি দেখে কী হবে?

তুমি তো একবার দেখলেও না। তারপর হয়ত খুঁত খুঁত করবে। জিনিসগুলি কাল এনে কখন রান্না হবে?

আমি কি এখন রাত্রি ১১টায় জিনিস আনতে যাব? খুব ভোরে পেলেই তো হল।

রোববার ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে জগদীশবাবু বলে ওঠেন—একি! ঘরগুলি দেখি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও কর নি।

পরিষ্কার করব না কেন? কোনটা তোমার অগোছানো রয়েছে শুনি?

ততক্ষণে জগদীশ বাবু টিপয়, আলনা, খাট টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছেন।

সুরমা যত বলে—ওগো এসব করে ঘরে এখন দক্ষযজ্ঞ করে তুলো না। জগদীশ বাবু ভরসা দেন—তোমাকে কিছু করতে হবে না তুমি রান্না ঘরে যাও।

রান্না ঘরে যাব, বাজার কোথায়?

কী আশ্চর্য! বাজার আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। ছানুকে ডাক। ও মাছ মাংসটা নিয়ে আসুক, আর কানুর সঙ্গে নেপাকে পাঠাও, তরকারী টরকারী আনার জন্যে। ব্যস্ হয়ে গেল।

দুধ কে আনবে?

দুধ? দুধের কথা আগে বল্লে না কেন? কানুই যেন আগে দুধটা দিয়ে বাজার আনতে যায়।

কানু পারবে, সুগন্ধী চাল, সোনামুগ ডাল, আলু বখরা, পাটালী এই সব চিনে আনতে? এসব আগে এনে রাখলে কত সুবিধে হতো?

কী আশ্চর্য, না পারার কী আছে? দোকানে গিয়ে পাঁচটা দেখে তার মধ্যে ভালটা আনা, এও যদি না পারে তবে তো চমৎকার।

নেপাকে পাঠাবে আমার কাজ করে দেবে কে?

নেপা কি সারা দিনের জন্য যাচ্ছে? তুমি উনানটাও একদিন একটু ধরিয়ে নিতে পার না?

আর এই যে বাসন পত্র পড়ে রয়েছে?

তোমাদের কোন একটা প্ল্যান নেই, জান আজ বাড়িতে দু'জন লোক খাবে বাসনপত্র ফেলে রাখলে কেন?

সুরমা চটে ওঠে—কাল অত দেরীতে ফিরলে বাসন মাজবে কখন?

আচ্ছা, আচ্ছা হবে। বাজার আনতে আর কত সময় লাগবে?

এদিকে দশটা বাজে ছানু মাছ ও মাংস নিয়ে এসেছে বটে কিন্তু মনে হচ্ছে মাছটা নরম। এখনো কানু নেপা ফেরেনি। সুরমা দেবী ছটফট করতে করতে ঘরে এসে বলেন—আচ্ছা আজ রান্না হবে কখন বল তো?

মাংস বসাও নি?

মসলা কোথায়? তবু যা হোক যেমন আমার ভাগ্য! মসলা পিষে মাংস বেছে বসিয়েছি, মাছ কাটা রয়েছে মাছের মসলা চাই।

জগদীশবাবু রুখে ওঠেন—তোমার ভ্যানর ভ্যানরের জ্বালায় পাগল হয়ে যাব। কোন একটা কাজ গুছিয়ে করতে পার না।

কানু বাজার নিয়ে এসে বলে—মা তোমার গুণধর চাকরের জন্যেই আমার এত দেরী, আসছি বলে হতভাগা কোথায় যে ডুব মারলো তা কে জানে।

এর আধ ঘণ্টা পরে নেপা হাঁপাতে হাঁপাতে আসে। মা দাদাবাবুকে কোথাও পে .... ওমা এই তো দাদাবাবু এসে গেছে। আর আমি দাদাবাবুর জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে না পেয়ে চলে এসেছি।

এই মিথ্যুক! আমি·········

সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে, বন্ধুরা এসে যায়। কি হে আজ তোমাদের ঘর ঝাড়ার দিন নাকি?

জগদীশবাবু ওদের কোথায় বসাবে দিশা পায় না, হাঁক ছাড়ে—ওরে, হতভাগা ন্যাপা ঘরটা কি ঝাট দিবি না এমনি থাকবে? আর ভাই বল কেন, যত সব হতচ্ছাড়া নিয়ে আমার কারবার।

বন্ধুরা বলে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না তুমি বরং চায়ের ব্যবস্থা দেখ।

ঠিক, ঠিক, বলে জগদীশবাবু হাঁক ছাড়েন, ওরে ন্যাপলা চা দে।

ওমা শুধু চা কী হবে। তোর মা কিছু খাবার করে নি? আশ্চর্য। কখানা লুচি বেগুন ভাজা করে দিলেই হয়।

বন্ধুরা বলে থাক এখন আর কিছু খেয়ে ক্ষুধা নষ্ট করে কী হবে।

চা দিয়ে ন্যাপা যায় সিগারেট আনতে, সিগারেট এনেই ছুটতে হয় দেশলাইয়ের জন্য।

ঘণ্টা দুই পরে রান্না ঘরে এসে জগদীশবাবু তোলপাড় শুরু করেন, এখনো রান্না হয়নি। বারটা বাজে! কাজের একটা প্ল্যান না থাকলে কখনো কাজ হয়? আগে ঠিক করে নিতে হয় এই আমি করব। সে অনুসারে কাজ করলে আর গণ্ডগোল হয় না। তা তো বলেও তোমাদের দিয়ে করানো যাবে না।

সুরমা তখন তিনটা উনোন ধরিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে। শ্বাস ফেলার সময় নেই, তিনটে উনোনের যোগান কে দেয়? ন্যাপা তো বাবুদের কাজেই ব্যস্ত। তাই জগদীশবাবুর প্ল্যান করে কাজ করার কথা আর কানে ঢোকে না।

সে দিন বহু কষ্টে নাকের জলে চোখের জলে একাকার করে সুরমা বন্ধু-ভোজন পর্ব শেষ করে।

এরই কয়দিন পরে ছানুর গলা ব্যথা হয়, সঙ্গে জ্বর। সুরমা জগদীশ বাবুর

অফিসে খবর দেন। জগদীশবাবু বিশেষ ব্যস্ত হন না। বিকেলে এসে একবার ছানুকে দেখে চা, জলখাবার খেয়ে উপন্যাস নিয়ে বসেন।

সুরমা অধীর হয়ে বলে—ওগো আবার বই নিয়ে বসছ কেন, ডাক্তার ডাকতে হবে না ?

কী করব ? জ্বর হয়েছে দেখ জ্বরটা কোন দিকে যায়। না সবটাতেই অস্থিরতা। কোন একটা কাজে প্ল্যান নেই।

সন্ধ্যার পরে আবার সুরমা বলে—ওগো জ্বরটা আমার ভাল লাগছে না—তুমি একবার ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

কোন ডাক্তারকে দেখাতে চাও ?

ডাক্তার নন্দীকেই ডাক।

এলোপ্যাথী দেখাবে না হোমিওপ্যাথী দেখাবে ভেবে চিন্তে নাও। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

সুরমা বলেন তুমি নন্দীকেই ডাক।

এত উতলা হবার কী আছে ? চিন্তা করে দ্যাখো কাকে ডাকলে তোমার সুবিধে হয়। ডাক্তার তো সব সময়ই পাওয়া যাবে।

রাত্রি দশটায় সুরমা ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে, তুমি—ডাক্তার ডাকবে, না-কি ?

আজই তো জ্বর হয়েছে এরই মধ্যে ডাক্তার ডাক্তার করে মাথা খেয়ে ফেল্লে, আরো তিনটা দিন দেখ, জ্বর কোন দিকে টার্ণ নেয়।

ওগো তিনটা দিন বাছা আমার থাকবে কিনা সন্দেহ। জ্বর খুব বেশী গাল গলা ফুলে উঠেছে, যাতনায় ছটফট করছে। তুমি যাও এক্ষুনি ডাক্তার নিয়ে এস।

জগদীশবাবু ধমকে ওঠেন। সবটাতে অধৈর্য। একটু জ্বর গলা ব্যথা হয়েছে, আন ডাক্তার। তাও একটা ভেবে চিন্তে ঠিক করা নেই। কোন প্ল্যান নেই। হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে তাই মুখ ফুলেছে। দেখ না কী হয়।

রাত্রি তিনটের সময় বিনা প্ল্যানেই জগদীশ বাবুকে দৌড়াতে হয় ডাক্তারের জন্য। তারপর ঔষধ আনা হাসপাতালে নেওয়া সে অনেক কাজ, অনেক ঝঞ্ঝাট করে ডিপথেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয় ছানুকে।

এক দিন অফিসের সময় জামা গায়ে দিয়ে জগদীশ বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—বোতাম রাখলে কোথায় ? কোন একটা কাজ গুছিয়ে করতে পার না কাজের একটা প্ল্যান না থাকলে…

চেঁচামেচি করছ কেন ? এই যে রেখে গেলাম—বলে সুরমা ছুটে আসে। তাই তো বোতাম যে সত্যি নেই।

জগদীশ বাবু বলেন—তুমি নিশ্চয় বোতাম শুদ্ধ্ ধোপাকে দিয়েছ। তোমার কাণ্ড তো।

সুরমার চোখে আলো জ্বলে ওঠে—তাই তো একটু আগে সে যেন পুরনো শিশি খুঁজতে ন্যাপার আস্তানার কাছে গিয়েছিল তখন নেপা যেন কেমন চমকে উঠেছিল। জগদীশ বাবুকে বলতে তিনি ঘোর আপত্তি করেন। হ্যাঁ তুমি কোথায় রেখেছ না জামা শুদ্ধ্ ধোপাকে দিয়েছ, এখন ন্যাপাকে নিয়ে টানাটানি।

সুরমা ভাবতে থাকে ন্যাপা একটা কারখানায় দুপুরে কাজ করে, কাজেই নিয়ে থাকলে সেখানে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই ওর ঘর পাতি পাতি করে খুঁজতে থাকে। ছেঁড়া অব্যবহার্য ছাতার ভেতর থেকে বোতাম বেরিয়ে পড়ে।

জগদীশ বাবুকে বলতে তিনি লাফিয়ে ওঠেন—বলো কি, এ-তো ভাল কথা নয়। এখন কী করা ?

কিছুই করা নয়। চুপচাপ থাক দেখি ও কী করে। আর আমরাও ভাবতে থাকি কী ভাবে কী করলে সুবিধে হবে। তবে ওকে একটু চোখে চোখে রেখ।

সুরমা ন্যাপা আসতেই চুপে চুপে ন্যাপাকে বলে—তুমি কি ওঁর বোতামটি দেখেছ ? কোথায় যে রাখলাম।

না তো আমি বোতাম দেখিনি। আজ তো জামা ধোপা বাড়ি দিলেন, ভুল হয় নাই তো ?

কী জানি বলে নেপার হাতে পয়সা দিয়ে সুরমা বলে—একটু দই নিয়ে এস তো। অনিচ্ছা সত্বেও নেপা চলে যেতেই সুরমা বোতামটি ছাতার ভিতর থেকে নিয়ে যায়।

রাত্রিতে অবস্থা বুঝে পরের দিন কোন মতে সকালটা কাটিয়ে সেই যে অফিসে যায় ন্যাপা আর ফিরে না।

সুরমা বলে—নেপা পালিয়েছে।

জগদীশ বাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, পালিয়েছে কেন ? তুমি কি কিছু বলেছিলে ? বোতামটা নিয়ে গ্যাছে ? মেয়েমানুষের কাণ্ডই আলাদা। কোন একটা কাজ ভেবে চিন্তে প্ল্যান করে করতে পারে না।

সুরমা বলে ওঠেন—তাতো পারে না, এখন বোতামটি তো গেল ?

আহা-হা আমার বাবার দেওয়া এমন সুন্দর জিনিসটি। বলে হাসি চাপতে মুখ নীচু করে।

হুঁ যাবে বল্লেই যাবে। আমি থানায় জানাব। তারা ঠিক বের করে দেবে। ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ রয়েছে, যাবে কোথায় বাছাধন? এ সব চোর ছ্যাঁচোড় বাড়িতে না থাকাই ভাল বুঝলে? তুমি কিছু ভেব না। এমন প্ল্যান করব বাছাধন টের পাবেন কার সঙ্গে চালাকী।*

* ঘরেবাইরে: মাঘ, ১৩৬৪।

রুচিহীন

আকাশে বাতাসে খুশীর আমেজ আসছে। শিউলীফুল তার সাদা চাদর খানা ভোর বেলা বিছিয়ে দিচ্ছে। পদ্মফুলে গাছ ছেয়ে যাচ্ছে। লাল সালুর কাপড়ে রাস্তায় রাস্তায় আগমনীর বার্তা। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় শারদীয় অর্ঘ্য। কাপড়, বাসন, জামা, ছিট, গহনা কেনার সাদর আমন্ত্রণ। চোখ ঝলসানো মনভুলানো দোকান-পসার। সে কী বাহার! শুধু ছত্রিশ জাতই মিলিত হয়নি ছত্রিশ দেশের ধুতি শাড়ী ছিট পাশাপাশি ঝুলছে। যে দিকে তাকানো যায় চোখ জুড়িয়ে যায়।

ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই মিনতি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। আর মাত্র একমাস বারোদিন পূজার বাকী। আজও এতটুকু নূতন কাপড় এল না। তারপর নন্তু, গোপাল, নেপু, ওদের কখন জামা প্যাণ্ট ফ্রক্ সেলাই হবে? সংসারের সমস্ত কাজ করে কতটুকুই বা সময় হাতে থাকে? তা আবার হাতে সেলাই করা। যে মানুষ! কেনা জামা আনতে যতই বলনা কিছুতেই আনবেনা। মিনতি বহুবার বলে দেখেছে।

পাশের বাড়ির বোস গিন্নীর সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে যায়। তিনি পানের পিক ফেলতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। পিক ফেলে একটু হেসে বলেন, কি হচ্ছে গো! কাল অধীরা মন্দিরার জন্য দুটি ফ্রক এনেছি অবসর পেলে এসে দেখো।

মিনতি জবাব দেয়—হ্যাঁ দেখব বইকি।

মিনতি ফ্রক দেখে বলে খুব ভাল হয়েছে।

বোস গিন্নী বলেন. সস্তাও হয়েছে; আমাদের পরিচিত দোকান তো? এই অধীরারটি নিয়েছে পঁচিশ টাকা বারো আনা, আর মন্দিরারটা সাতাশ টাকা চার আনা।

ওদের ফ্রক তো রোববার আনলেন।

হ্যাঁ, সে দিন সুতির এনেছি। একটা বুঝি চোদ্দ আর একটা ন' টাকা।

মিনতি আর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

বোসেদের বাড়ি থেকে বেরুতেই চাটার্জিদের অন্তুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, বলে —মাসীমা! পূজার কাপড় কিনেছি আসুন দেখবেন। বাড়ি নিয়ে অন্তু দেখাতে থাকে, এই কাতান খানা পঁচাত্তর টাকা নিয়েছে, এ ঢাকাই খানা পঁচাশি, এ দুখানা আমাদের দুবোনের আর মায়ের জন্য এই গরদ পঁচানব্বই টাকায় নিয়েছি, আর এগুলি এমনি ষষ্ঠি সপ্তমীতে পরার জন্য। এই কাতাঙ্গা খানা পঁইত্রিশ টাকা, এই কেরালা খানা তিরিশ টাকা, মাইসোর সিল্কটা পঁচিশ টাকা দিয়ে নিয়েছি।

মিনতি বলে এবার শাড়ীর বাজার কেমন দেখলে ?

ওঃ! ভেরাইটিজ্! আপনি এখনো কিছু কেনেন নি ? মনিদা যেন কেমন গা ছাড়া লোক, এখনো পূজার বাজার না করলে পরে ভীড় বাড়বে, দাম বেড়ে যাবে।

মিনতির মুখ শুকিয়ে ওঠে। আজ চলি, বলে চাটার্জি বাড়ি হতে বেরিয়েই দত্তজার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়। তিনি বলেন—এস পূজোর কাপড় কিছু কেনা হয়েছে দেখবে, এস।

এই মাদ্রাজী খানা নিয়েছি বড় বৌ-এর জন্য। বোম্বে প্রিণ্টখানা মেজ বৌ-এর। আমার জন্যে মহিশূরের শাড়ী কেনা হয়েছে।

শাড়ীগুলি হাতে নিয়ে দেখে। সুন্দর শাড়ী। দাম জিজ্ঞেস করে। পূজোর বাজার কেমন দেখলেন মাসীমা ?

ওঃ! জামা কাপড়ের যা ষ্টক। কত যে রকমারী শাড়ী! মাথা ঠিক করে রাখা যায় না। তোমার কাপড় কেনা হয়েছে ?

না এখনো হয়নি।

ওমা! এর পরে যে দাম বেড়ে যাবে, ভীড় হবে।

মিনতি শুষ্ক কণ্ঠে বলে—একা মানুষ সময় পান না।

তা বলে কি পূজার বাজার দেরী করতে আছে ?

মিনতি আর কোন দিকে না চেয়ে নিজের বাড়ি ঢোকে। এ পাড়ায় অনেক দিন আছে বলে সবার সঙ্গেই চেনাজানা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ ওর শান্ত স্বভাবে সকলেই ওকে একটু স্নেহের চোখে দেখে। তা ছাড়া জিনিস কিনে অপরের মনে মনে ঈর্ষা উদ্রেক করতে না পারলে কেনার সার্থকতাই বা কোথায়!

মনীন্দ্র আসতেই মিনতি রাগে ফেটে পড়ে। আচ্ছা তুমি জামা কাপড় করে আনবে বলতো ? এরপর দাম বেড়ে যাবে না ? সেলাই বা করব কখন ?

হ্যাঁ দাম বাড়বে বললেই হল! পূজা কনসেশন অনেক দোকানেই রিবেট দেবে। তা ছাড়া এখনো তো ভেরাইটিজ্ ওঠেই নি।

তবু মিনতি ঠোঁট ফুলিয়েই জবাব দেয়—ভেরাইটিজ্ ওঠেনি! দত্তরা অনুরা কত শাড়ী কিনেছে।

মনীন্দ্র তাচ্ছিল্য ভরে জবাব দেয়, কিনলেই হল? ওসব বাজে কথা রেখে এখন খেতে দাও দেখি।

মিনতি বুঝতে পারছে কাপড় এখন আসবে না। গরীবের ঘরে বসে থাকার উপায় নাই। সেলাই যখন তখন করা যাবে না; ঝাড়া মোছার দিকেই মিনতি মন দেয়। আনন্দময়ীর আগমনে দুঃখ দৈন্য ঠেলে রেখে এ কদিন ঝকঝকে তকতকে করে তুলতে হবে সব। সারা বছর অভাবের জ্বালায় একদিন একটু ভাল মন্দ খাবার উপায় থাকে না; এ কয়দিন তার ভাণ্ডারে ঘি পর্যন্ত থাকবে। নারকেল দিয়ে ঘি দিয়ে মোচা ঘণ্ট চিংড়ি মাছ ভাতে প্রায় ভুলতেই বসেছে।

কদিন চুপ করে থেকেই মিনতি আবার বলে—দেখ, তুমি যা দেরী করছ এরপর জামা আর হাতে বানানো চলবে না। তুমি তৈরী জামাই এনো।

তা-না-না করে মনীন্দ্র পাশ কাটায়।

একদিন মনীন্দ্র এসেই হাঁক ডাক করে—কইগো ত্যাখো তোমার জামা কাপড়। নেপুর জন্য সিল্কের কাপড়ই আনলাম—কর তোমার আদুরে মেয়ের জামা। একটা জামায় এক গাদা টাকা খরচ।

মিনতি ছুটে জামার কাপড় দেখে কেমন জানি চুপসে যায়। আস্তে আস্তে বলে এটা কি খুব ভাল হবে? এ রকম আনলে কেন, মন্টিদের কী সুন্দর জামার কাপড় এনেছে সে রকম আনলেই পারতে?

মনীন্দ্র খেঁকিয়ে ওঠে—ও রকম আনলে না কেন সে রকম আনলে না কেন? এটায় কী অপরাধ হয়েছে?

মিনতি মলিন মুখে কাপড়গুলি দেখতে থাকে। নেপুর জামার কাপড়টা সিল্ক বটে, কিন্তু কেমন জানি খসখসে। ভাবে থাকগে ভাল করে করলে এই সুন্দর হবে।

অনু আসতেই মিনতি জামার কাপড়গুলি অনুর হাতে দেয়। অনু একবার চোখ বুলিয়েই রেখে দেয়, বলে এটা ইমিটেশন সিল্ক। এগুলি কাচলে ফেঁসে যাবে। সার্টের ছিটগুলিও বড্ড মোটা। আপনি দেখেন নি চমৎকার এক রকম ফ্রকের ছিট বেরিয়েছে? এগারো টাকা গজ? কাপড়গুলি বড় সুন্দর।

মিনতি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

অনু সান্ত্বনা দেয়, যাকগে এগুলি সব সময় পরতে পারবে। আপনি মনিদার সঙ্গে মার্কেটে যান। দেখবেন কত রকম জিনিস। আর পূজোর সময় তো একটা জামায় হবে না।

মিনতি ম্লান মুখে জবাব দেয়—দেখি কী হয়?

কী আর হবে! ভাল জিনিস কি আর আমাদের কেনার উপায় আছে? মিনতি মনে মনে ভাবে।

মিনতির বহু অনুরোধে মনীন্দ্র তাকে দোকানে নিতে রাজী হয়। দোকানে গিয়ে তো মিনতির চক্ষু স্থির। কাপড় আর কাপড়। এক একজন ক্রেতার কাছে পাহাড় জমে উঠছে। তবু পছন্দ হচ্ছে না বলছে, অন্যরকম দেখান। কেউবা পছন্দ হচ্ছেনা বলে অন্য দোকানে যাচ্ছে। মিনতি কাপড় পছন্দ করবে কি। এ-সব দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছে।

মনীন্দ্র তাড়া দেয়, কৈ কাপড় পছন্দ কর।

মিনতি যেখানাই হাতে তুলে নেয় দাম শুনে নাবিয়ে রাখে। বিব্রত হয়ে বলে, তুমি বল কোনটা নেব?

মনীন্দ্র বলে—আবার আমায় কেন?

মিনতি বলে তুমি পছন্দ করে দাও।

ওরই ভেতর কিছুক্ষণ দেখে শুনে মনীন্দ্র একখানা শাড়ী মিনতির হাতে দিলে। মিনতি খুশী হয়। ঠিক আছে। খুবই ভাল হয়েছে। এরকম শাড়ী অনুর একখানা ছিল। বড় সুন্দর কাপড়। এবার আর অপছন্দ করতে পারবে না, কিন্তু দাম আবার খুব বেশী হ'ল নাকি?

মনীন্দ্র বলে আর কী কিনবে?

মিনতি বলে তোমার ধুতি আর টেপুর জন্যে একটি ফ্রকের ছিট্।

মনীন্দ্র একটি ফ্রকের কাপড় নেয়। নিজের একখানা ধুতিও কেনে। ধুতি মিনতির পছন্দ হয় না। কিন্তু মিনতির যেটা পছন্দ সেটা মনীন্দ্র কিছুতেই নেবে না। যাকগে বেটাছেলেরটা আর কেইবা দেখবে?

মিনতি গর্বের সঙ্গে অনুকে ডেকে এনে জামা, কাপড় দেখায়। অনু বলে ওমা এ শাড়ী নিলেন কেন? এতো পুরোনো, 'আউট অব ফ্যাসান' দেখেন নি তিন বছর আগে আমি আট-পৌরে এ রকম শাড়ী পরেছি। ওমা টেপুর বুঝি আবারও ফ্রকের ছিট্ কিনলেন? এ ছিট্ তো কাচলে ন্যাকড়া হয়ে যাবে।

তৈরী ফ্রক কিনলেন না কেন? আজকাল কত সুন্দর ছাট-কাটের তৈরী জামা পাওয়া যায়। আপনি কি তেমন বানাতে পারবেন? আপনার ষষ্ঠির কাপড় কোথায়? একখানা না যদি অষ্টমীতে পরেন?

মিনতি চুপ করেই থাকে। কিইবা জবাব দেবে? কী করে বোঝাবে এ কাপড় কিনতেই তাদের প্রাণান্ত।

লুকিয়ে রাখার উপায় নেই? বোস গিন্নী দত্তজা সকলেই কাপড় দেখে যায় এবং দেখে মুখ বাঁকায়। সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। ভাল ভাল কথা বললেন। ওদের রুচির উপর কটাক্ষ করলেন। ভাল জিনিস কি সকলে কিন্‌তে পারে?

মিনতি গুম হয়ে বসে থাকে।

পাশের ঘরে মনীন্দ্র তখন হিসেব মিলাচ্ছে। না বড্ড বেশী খরচ হয়ে গেল। এস্টিমেটের অনেক উপরে চলে গেছে। জুতোও একজোড়া না কিন্‌লে নয়। ছেলেদের জুতো দরকার। মিনতির না হয় সারিয়ে নিলে এ বছরটা চলে যাবে। এ মাসে অনেক টাকা ধার হয়ে যাবে। তারপর পূজোর ক'দিনের অতিরিক্ত খরচ আছে। বিজয়ার মিষ্টি, কালী পূজোর চাঁদা, এর পর এ্যাডভান্স কেটে নেবার দায়। ঝোঁকের মাথায় এতগুলি কাপড় জামা না কিনলেই হত। *

* ঘরে বাইরে : শারদীয়া, ১৩৬৯।

শুভ-বিবাহ

সমস্ত দিন অসহ্য গরমে আই-ঢাই করে সবেমাত্র গা ধোব বলে বাথরুমে পা বাড়াচ্ছি, এমন সময় সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি আমার ভাসুর পো বিনয়।

কি ব্যাপার? তুই অফিস যাসনি?

না, একটু কাজ আছে। মা আপনাকে নিতে পাঠিয়েছিলেন।

কেনরে?

চলুন না। গেলেই জানতে পারবেন।

আচ্ছা তুই বোস্ আমি চট্ করে গা-টা ধুয়ে নি।

গা ধুতে ধুতে ভাবছিলাম, বিনয়ের মা—আমার পিসতুতো জায়ের কথা। নিরীহ ভাল মানুষ দিদির আমার উপর খুব আস্থা। যে কোন কাজই তিনি আমার পরামর্শ না নিয়ে করেন না। আজ কি ব্যাপার কে জানে?

রাস্তায় যেতে যেতে বিনয়ের কাছে শুনলাম, ওর বড়দা বিয়ে করবে।

অজয় এতদিনে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে? খুবই ভাল কথা। ওর বয়স তো চল্লিশ হল?

হ্যাঁ, তা তো হলই। এতদিন তো বিয়ে করবেই না ঠিক ছিল। এখন রাজী হয়েছে।

তাহলে আর দেরী করিসনে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

সে জন্যই তো আপনাকে নেওয়া।

আমায় দেখেই দিদি এক মুখ হেসে বললেন—অজয় বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। এবার পাত্রী দেখ। কালীঘাটে একটি মেয়ে আছে, তুমি বিনয় ওদের নিয়ে যাও, মেয়েটি নাকি আই. এ. পাশ সুন্দরী।

আমি বিস্মিত হই।

আই. এ. পাশ সুন্দরী মেয়ের চেয়ে তো একটি স্বাস্থ্যবতী খাটিয়ে মেয়েই কি আপনার দরকার নয়?

বলেই ফেলি কথাটা।

দিদি ঘন হয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন—আমি তাই বলেছিলাম, যে আমার অজয় তো মাত্র ম্যাট্রিক পাশ, আর কাজকর্ম জানা মেয়েই আমার দরকার। জানিস তো অজয় মফঃস্বলে কাজ করে। লোক না পেলে সময়ে তো পাতকুঁয়ো থেকে জলও তুলতে হয়। মাইনেও তো বেশী পায় না। কিন্তু ছেলেরা রাজী নয়। বলে আজকাল স্কুল ফাইনাল পাশ ছেলে, বি. এ. এম. এ. পাশ মেয়ে বিয়ে করে তা জান? ভাল পেলে কে মন্দ নেয়?

কথাটা ভাববার মত। ভাল পেলে কে মন্দ নেয়? কিন্তু ভাল কি পারিপার্শ্বিকের উর্ধ্বে? শীতের দিনে গরম কাপড় খুবই ভাল। গরমের দিনে তার মূল্য কোথায়? ফ্যান একটা শীতে কি একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়? যে সাপের বিষে অনিবার্য মৃত্যু আনে, অবস্থা বিশেষে তাই কি ওষুধ হয় না! কথায় বলে ঘট বুঝে ফুল চাই। কিন্তু সে কথা এদের বলে লাভ নেই। দিদিকে বলি—আপনিও চলুন না মেয়ে দেখে আসবেন।

দূর পাগল! আমি কি বেরুই। আর তোদের এ সব আমি বুঝিও না। ওরা ছেলে মানুষ। ওদের উপর আমি ভরসা করতে পারিনে। তুই দেখলে আমি নিশ্চিন্ত।

মেয়েটি ভালই। রং ফর্সা। ওদের বাচালতায় সবটার জবাব দেয়নি বটে, তবু বিনয় ওরা খুসি হয়েছিল, তবে ওদের আপত্তি ওই তিরিশ বছর বয়সটা।

আমি হতবাক। পাত্রীর ত্রিশ বছর তো কী হয়েছে? আমাদের অজয়েরও তো চল্লিশ হল, এর কমে মানাবে কেন?

বিনয় আপত্তি করে, আপনি বুঝছেন না। ছেলেদের কথা আলাদা। একটা ত্রিশ বছরের মেয়ে একেবারেই বুড়ী নয় কি? তাকে আমি বৌদি বলে ভাবতেই পারিনে।

দিদিকে জিজ্ঞেস করি—আপনারও কি এই মত?

কী জানি বাপু! আমি অত বুঝিনা। আমাদের সময় তো ১২/১৩ বছরেই ঘাঁতকে উঠত। তোমরা যা ঠিক করবে আমি তাতেই খুশী।

বিনয় কিছুতেই এ সম্বন্ধে রাজী হল না, তাই চুপ করে থাকতেই হল।

কয়েকদিন পরেই আবার দিদির ডাক এল। দিদি বললেন, যাও লক্ষীটি, আমার আর দেরী করতে ভাল লাগছে না।

কিন্তু আমায় কেন সাক্ষী গোপাল পাঠান?

অজয় নিজে দেখবে না। তুমি না দেখলে আমি ভরসা পাইনে।

আচ্ছা আপনি এই পাগলামি করছেন কেন? জানাশোনা কোন একটি মেয়ে আমুন না।

হা কপাল! সে কথা আর বল কেন? নন্দার ছোট বোনটিকে আমার বড় ভাল লাগে, কি লক্ষ্মী মেয়ে, সমস্ত দিন কাজ আর কাজ। ভাইবোন তো আটটি, মা তো আঁতুড়েই আছে। তা ছেলেরা বলে এ আবার সম্বন্ধ নাকি? মেয়ে ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। কী করি বল? আমরা সেকেলে মানুষ। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাই কী করে।

এ মেয়েটিকে ভালই লাগলো। পরিবারটি খুবই ভদ্র। মেয়েটির বিশাল চোখ, দুটি ভীত হরিণের মতই ত্রস্ত, শঙ্কিত। সে কিছু দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, এ শুধু হাস্যকর প্রহসন। বিনা পণে শুধু রূপ গুণ যাচাই করে কেউ ঘরে তুলবে না। বাবা মা দারিদ্র্যের জন্য আর একবার ধিকৃত হবেন।

বিনয়ের বন্ধু যখন জিজ্ঞেস করলো—আপনার হবি কী, তখন স্থান কাল ভুলে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একটা কসে চড় দিই। বড় বড় কথার গদ আউড়ে গেলেই হল? হবি কাদের জন্য? প্রাণ রাখতে যাদের প্রাণান্ত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, সংসারের অজস্র চাহিদা মিটিয়ে শ্রান্ত শরীর এতটুকু বিশ্রাম পায় না। এর ভেতর হবির স্থান কোথায়? আমার ভ্রূকুটি দেখেই হোক বা যে জন্যই হোক ওরা আর প্রশ্ন করলে না।

মেয়ের মা হাত দুটি ধরে আমায় বললেন, কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার মেয়েটিকে নিয়ে আপনারা অসুখী হবেন না এটুকু আমি জোর করেই বলতে পারি।

দিদিকে সব বললাম, বিনয় ওদের পছন্দ হয়নি। মেয়ে তেমন স্মার্ট নয়, আর কিছু পণ না দিলে বৌভাতের খরচই বা চলবে কেন?

আমি যুক্তি দেখাই—বৌভাত উঠেই গেছে। আজকাল বৌ মিষ্টি করে। তা তোদের ক্ষমতা না হয় নিমন্ত্রণ করবিনে। তা বলে মেয়েদের পীড়ন করবি?

দিদিও ছেলেদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, এ তুমি কী বলছ? বৌভাতের খরচ তো মেয়ে বাড়ি থেকেই চিরকাল দেয়।

নাকে কানে খৎ দিয়ে চলে এসেছি, বিয়ের ব্যাপারে আর আমি নেই।

দিদি খবর পাঠান অজয়ের বিয়ে। আমাকে যেতেই হবে। ভেবেছিলাম যাব না। আবার ভাবি বিয়ের ব্যাপার, পাঁচ দিক ভেবে চিন্তে করাই উচিত।

খেয়ে এলাম অজয়ের বিয়েতে। হ্যাঁ বৌ ফর্সাই হয়েছে। দুদিকের চোয়াল বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে। চোখের কোলে গাঢ় কালি। নাকটি খাটো। স্কুল ফাইনাল পাশ। বয়স যথেষ্ট হয়েছে মনে হল।

বিনয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—মেয়ে অত্যন্ত স্মার্ট, চমৎকার ব্যাডমিন্টন খেলে, ক্রিকেট খেলা যা বোঝে অনেক ছেলেও তা জানে না।

সর্বতোভাবেই ওদের পছন্দ হয়েছে। হলেই ভাল। মাস ছয়েক পরে একদিন গিয়ে দেখি, দিদি জ্বরে কুঁই কুঁই করছেন। ঘরদোর অত্যন্ত নোংরা। আমাকে দেখে বললেন খুব সময়ে এসেছ, আমায় কিছু খেতে দাও তো, খিদে পেয়েছে। দিদিকে খাইয়ে ঘরদোর কিছু পরিষ্কার করে জানি আজ ৭/৮ দিন দিদির জ্বর। ছেলেমেয়েরা কোন রকমে ডাল ভাত ফুটিয়ে খেয়ে স্কুল কলেজ করছে।

এ সময় অনীতাকে আসতে লিখলেই পারতেন। বউমার কথা বলছ? সে অজয়ের কাছেই থাকতে চায় না। বলে ওই পাড়াগাঁ আমার ভাল লাগে না। একটা সিনেমা নেই, কোন আনন্দ নেই সে জায়গায় আবার মানুষ থাকে? আজ দুমাস তো বাপের বাড়ি আছে। কাল অনেক বলে কয়ে বাপের বাড়ি থেকে আনিয়েছি।

কোথায়? দেখছি না তো?

দেখবে কোথেকে? আজ তোরে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে। এসে তো ভাত ফুটিও পাবে না।

আমার আর কিছু বলার প্রবৃত্তি হয় না। যতটুকু সাধ্য করে দিয়ে বিমর্ষ মনে চলে আসি।

দিন দুই পরে আবার যেতেই হয় দিদিকে দেখতে। সে দিন দেখি দিদি কোনমতে রান্না ঘরে এসে রুটি সেঁকছেন।

জ্বর ছেড়েছে?

হ্যাঁ, আজ ভাল আছি।

অনীতা কোথায়?

আজ ওর স্পোর্ট আছে। ফিরতে দেরী হবে বলেই গিয়েছে। তাই দুখানা রুটি করে আমি খেয়ে নেব ভাবছি। কাল ভাত দেবে।

দিদিকে সরিয়ে রুটি দুখানা তৈরী করে খাইয়ে আসি।

দিদি চুপি চুপি বলেন—বৌমার এখানে থাকতে বড় অসুবিধা হয়।

এ কথায় আর জবাব দেই না।

বছর দুই পরে পেটে একটা ব্যথা হওয়ায় হাসপাতালে গিয়েছি। যে নার্সটি আমার শুশ্রূষা করছিল তাকে যেন বড় পরিচিত মনে হয়। কে তাও ঠিক মনে করতে পারছিনে। কথায় কথায় জানতে পাই এই অজয়ের বৌ। অজয়ের কাছ থেকে চলে এসেছে। এখন শ্বশুর ঘর করার তার ইচ্ছে নেই। নার্সিং করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠি। আমার পরিচয় যদি জেনে ফেলে! নার্সিং করা আজ পেশা হলেও তা বলে শাশুড়ীকে নার্সিং! ছিঃ।*

* ঘরে বাইরে: শারদীয়া, ১৩৭০।

সমবেদনার বিপদ

সীমাকে ধমকে উঠি—তোর আর বুদ্ধি হল না। এতটুকু মানুষের মন-মেজাজ বুঝে চলতে পারিস নে। এখন বড় হয়েছিস, কোন কথায় মানুষ খুশী হয়, কোন কথায় দুঃখ পায় সেটুকুও যদি বুঝে চলতে না পারিস!

মুখখানা মলিন করে সীমা জবাব দেয়—আমি তো কোন অন্যায় বলিনি মা। লিলি বলছিল, স্কুলে পড়ানোর দোষেই ও ইংরেজীতে ফেল করেছে। আমি বলছি তা কেন? তুই তো ইংরেজীতে সব সময়ই কাঁচা। টীচাররা কতবার সাবধান করে দিয়েছেন। তার বোঝাবুঝির কী আছে মা!

তবু বিরক্তি কমে না, বলি—থাম বাপু। কেবল আজেবাজে কথা নিয়ে মানুষের সঙ্গে লাগা।

সীমা মুখ ভার করে চলে যায়।

বিধাতা হয় তো একটু হাসেন।

সেদিন ননদের বাড়ি বেড়াতে যাই। পূজোর বাজার সম্বন্ধে কথা ওঠে। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠি—ঠাকুরঝি যে পূজোয় অনেক শাড়ী কিনে ফেলেছ! চকিতে ঠাকুরঝির মুখ হাঁড়ি হয়ে ওঠে।

কোথায় কত শাড়ী দেখছো? পূজোর দিনে এ ক'খানা কাপড় না কিনলে মান থাকে! তাও তো কিছুই কেনা হয়নি। বাছাদের কি পছন্দ মত কাপড় দিতে পেরেছি, না দুখানার জায়গায় তিনখানা তিন পূজোর দিন পরার শাড়ী দিতে পেরেছি? বলে তিনি চোখে আঁচল তোলেন।

আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখি। তাড়াতাড়ি বলে উঠি—সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। আমি তা বলিনি, আমি বলতে···

থাক ভাই, আর ঢাকতে হবে না! কী বলেছ তা আমি ভালই বুঝি। তবে দুঃখ হয় এই ভেবে যে এমনি ত বাছাদের কিছুই দিতে পারিনে, তার উপর তোমাদের এই দেখেই ভিরমি যাওয়া।

জুৎসই একটা কথাও খুঁজে পাইনে। সব যেন ডেলা পাকিয়ে জগাখিচুড়ি হয়ে আছে। হঠাৎ একটু আলো দেখতে পাই। লীনার পড়া সম্বন্ধে ঔৎসুক্য

প্রকাশ করি। মেঘ কিছুটা পাতলা হয়ে আসে। আর বেশি ভরসা পাইনে। মামুলী ভদ্রতা সেরে কেটে পড়ি।

বিজয়ার প্রণাম সারতে বড় জায়ের বাড়ি যাই। একথা সে কথার পর অবধারিত পুজোর বাজারের কথা ওঠে। কিন্তু এবার আর আমি ঠকতে রাজী নই। অত্যন্ত সাবধানে বলি—তাই তো দিদি যে এবার জামা কাপড় বিশেষ কিছুই কিনতে পারেননি দেখছি। এরপর আবার সীমা ওদের জামা দিয়েছেন।

হঠাৎ যেন ঘরের ভিতর বোমা ফাটে। দিদি চীৎকার করে ওঠেন—তার মানে? জামা কাপড় বিশেষ কিনি নি মানে? তুমি কী বলতে চাও? আমার মত মানুষ আর কত জামা কাপড় কিনবে? এই কিনতেই আমি হিম-সিম খাচ্ছি। ওই শুনতেই তোমার ভাসুর হাজার টাকা পান। এ রাজবাড়ীর খরচ আমি যে ভাবে কুলোই তা আমিই জানি। তোমরা তো মজা দেখবেই। কথায় বলে না—'কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ' আমার হয়েছে তাই। কোন কাজ করেও সুনাম সুযশ নেই এমনি অদৃষ্ট।

এ তুবড়ি এখন আমি থামাই কী করে? ভগবান! কার মুখ দেখে যে আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

বি. এস.সি. পরীক্ষার ফল বেরোয়। ফল দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। লীনার রোল নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না।

ভাসুরঝিটি অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে। ভাল কথা। আমরা ধরে নিয়েছিলাম মীরা হয়ত পাশ করে যাবে। তাই ফল দেখে খুশীই হ'লাম। খেটে খুটে মেয়েটা ফল ভালই করেছে। লীনাটাই যে ডুবালো। এ মেয়ের জন্য ওর মায়ের গর্বের সীমা পরিসীমা নেই। আহা দিদি হয় তো কেঁদেই খুন হচ্ছেন।

হন্ত দন্ত হয়ে ছুটি ননদের বাড়ি।

গিয়ে দেখি, দিদি বসে শেলাই করছেন। দেখে আমার শোক আরও উথলে ওঠে; বেচারী মনটাকে শান্ত করতে শেলাই নিয়ে বসেছে। আগতপ্রায় চোখের জলকে ঠেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলি, লীনা কোথায়? কী করে এমন কাণ্ড হল? আহা বেচারী!

গম্ভীর ভাবে ঠাকুরঝি বলে ওঠেন, তুমি এমন আহা উহু করছ কেন? তোমরা কী ভাব বল তো? পরীক্ষা দিলেই যদি মানুষ কেবল পাশ করবে তা হলে তো ফেল কথাটাই থাকত না।

গাছ থেকে পড়ি। আত্ম সমর্থনের চেষ্টা করি, হ্যাঁ পাশ ফেল আছে বই কি। কিন্তু সকলের জন্য তো সব নয়। আমাদের লীনা পাশই করবে।

ঠাকুরঝির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে, এ তোমাদের অন্যায় আবদার। লীনা এ পর্যন্ত ফেল করেনি বলে কখনো ফেল করবে না তা হয় না! এ পর্যন্ত প্রতি বছর পাশ করে ও অন্যায় করে ফেলেছে। তোমাদের আচরণে তাই মনে হচ্ছে। তিনি দম নিয়ে আবার বলতে থাকেন—সবাই যেন আকাশ থেকে পড়েছে—লীনা কেন পাশ করেনি? কোথায় তোমরা ওকে সান্ত্বনা দেবে, তা নয় তোমাদের হা হুতোশ্বির জ্বালায় মেয়েটা আমার আধখানা হয়ে গেল।

ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। হেঁ হেঁ গোছের হাসি দিয়ে লীনাকে আগামী-বারের জন্য প্রস্তুত হতে বলে সরে পড়ি।

জায়ের বাসায় তো যেতেই হয়। এবার প্রথমেই বলি, যাক মীরা অনার্স তো রেখেছে তবে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, এই যা দুঃখের (খুব দুঃখের আর বলি না)! দিদি তেড়ে আসেন, পাশ করেছে মানে? একি একটা পাশ করা? আমি সেই থেকে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছি। ভগবান একি করলে? এর চেয়ে মীরা ফেল করলে আমি খুসী হতাম বেশী। বলে তিনি ডুকরে ওঠেন।

আমি ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে থাকি। বলি, আমরাও তো তাই ভাবছি; মীরাকে দিয়ে আমাদের কত আশা…

কথার মাঝখানেই দিদি বলে ওঠেন—হ্যাঁ আশা ভরসা সবই বুঝি বোন। এটা তোমাদের তামাসা দেখা। না হলে এ পাশের কথা শুনে আর ছুটে আসতে না।

যথাসাধ্য করুণ মুখে বলি—যা দিন কাল তাতে পাশ করাই তো এক দায়। তবু তো আমাদের মীরা পাশ করেছে। (মনে মনে ভাবি, মীরা এত ভাল ছাত্রী কবে হল?)

দিদি আরো তেতে ওঠেন—থাম, থাম। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিওনা। একে আমি পাশ বলি না।

তবু হাল ছাড়িনে, বলি—মীরার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন।

দেখেছি, যে আমার মুখ পুড়িয়েছে তার মুখের দিকে না চাইলে আর কার মুখের দিকে চাইব!

ভাগ্যিস সীমা সঙ্গে নেই। রাস্তার মুখ দেখার জন্য আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।*

* ষষ্ঠমধু: পৌষ, ১৩৬৭।

স্বপ্ন না সত্যি

বাঃ! বেশ সুন্দর গন্ধ তো! কিসের গন্ধ? অগুরু, চন্দন। প্রাণমন যে মাতিয়ে তুলছে, সুন্দর একটা বাজনা না? ওমা, কত আলো! আরে! আরে! এযে স্বর্গে এসে গেলাম, জয় পুণ্যের জয়। এতদিনের দুঃখ কষ্ট সার্থক হল। মা বলতেন সৎপথে থাকিস, কাউকে দুঃখ দিসনে, খেটে খাস, ভগবান সন্তুষ্ট থাকবেন। মার কথায় অমি অবাধ্য হইনি তাই, তাই বোধ হয় আমার দুঃখে ভগবানের টনক নড়েছে। আমায় চিরশান্তিময় চিরআনন্দধাম স্বর্গে এনেছেন।

মনটা খুশীর আমেজে হালকা মেঘের মত ভেসে বেড়াল। স্বর্গে আসা কি যার তার কাজ! 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলেনা'। মর্তে অশেষ দুর্গতি ভুগেছি বলেই না আজ আমার এ সৌভাগ্য। ঐ পারিজাত ফুটে রয়েছে। ঐ যে মন্দাকিনী কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে। নূপুরের শব্দ আসছে না? মেনকা রম্ভা বোধহয় নাচছে। দেখতে হয় কোন দিকে।

আরে! নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের পক্ষ বিদীর্ণ করে এখানে এমন মর্মান্তিক কাঁদছে কে? স্বর্গেও কান্না? এই মশাই, কাঁদছেন কেন? 'স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি ধান ভানে' জানতাম, কিন্তু স্বর্গে গিয়েও কেউ কাঁদে এমন কথা তো শুনিনি। আঃ মলো! কান্না যে বেড়েই চলেছে। এই ব্যাটার জন্য ইন্দ্রদেব না চটে উঠে আমায় শুদ্ধ্ মর্তে পাঠিয়ে দেন! মানেমানে সরে পড়তে পারলে বাঁচি। বিরস কণ্ঠে বলি, 'স্বভাব যায় না ম'লে'। আরে মশাই স্বর্গে এসেও কাঁদছেন কেন? এটা কি কান্নার জায়গা? এখানে তো আর বলতে পারবেন না, 'ভাঁড়ারে মা ভবানী'; ক্ষুধায় কাঁদি।

গুরু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এল—স্বর্গে আছি বলেই তো কাঁদছি, আজ যদি মর্তেই থাকতুম মাথা ঠুকে তোমাদের ঘিলু বার করতুম না!

আঁতকে উঠি। অতর্কিতে একটু সরে যাই, আচ্ছা গোঁয়ার লোক যা হোক। চেনা নেই, জানা নেই তিনি এলেন ঘিলু বের করতে।

আবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে বলতে থাকেন—মূর্খের দল, এতটুকু গড়বার ক্ষমতা রাখ না, কেবল ভেদবুদ্ধি, কেবল দলাদলি। আজও তোমরা ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছ ; আজও ভাবো রাম মরেছে তো আমার কী ? তোমরা মরবে না তো মরবে কে ? মূর্খের দল ! রাম আর তুমি অবিচ্ছেদ্য, মানুষ না বাঁচলে ভগবানও বাঁচতে পারেন না, তা জান ? তোমাদের অবস্থা হয়েছে ইঁদুর আর ভেকের মত। ভেক জলে ডুবতে অভ্যস্ত, ইঁদুর জলে ডুবতে পারে না তো ভেকের কী ? তাই সে মহানন্দে ইঁদুরের লেজে নিজের পা বেঁধে পুকুরে ডুবতে থাকে, আর ইঁদুর যতই যাতনায় দাপাদাপি করতে থাকে ভেকের ততই আনন্দ, মুখে সান্ত্বনা—আমি তো ·আছি ভয় কী বন্ধু ? শেষে মৃত ইন্দুর ভেসে ওঠার দরুন বাজপাখীর খোরাক হল। তোমাদেরও তাই হবে। আজ একমাত্র বাঁচার উপায় একতা ও পরস্পরের সহযোগিতা।

বারবার মূর্খ বলায় আঁতে লাগলো। বলেই ফেললাম—একদিন গোল্ডমেডেল নিয়েই এস. এস.সি পাশ করেছিলাম মশাই। নেহাৎ দুর্ভাগ্য বশতঃ একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়েই মর্ত্যেও যত দুর্গতি ভুগেছি ; আজ আপনিও মূর্খ বলে গাল দিতে পারলেন।

সহানুভূতির স্বরে ভদ্রলোক বললেন—কেউ ঠকিয়েছে বুঝি ?

হ্যাঁ। ঠকিয়েছে বৈকি ! আদর্শই আমার কাল হল। গোল্ডমেডেল নিয়ে এম. এস-সি পাশ করেছিলাম। স্বাধীন দেশের মন্ত্রী হতেই বা আমার বাধা ছিল কি ? সে সব চেষ্টাই করলাম না। তিনি বললেন—পরের গোলামী করোনা ব্যবসা কর। বাঙ্গালীর ব্যবসা না করেই এই দুরবস্থা। সমস্ত বাংলা দেশের যা কিছু দোকান পাট অন্যে জাঁকিয়ে বসেছে, আর বাঙ্গালী হন্যে হয়ে কেরানী-গিরির জন্য ঘুরছে ; আর লক্ষ লক্ষ বেকার ভুগছে। তখন বয়স অল্প, তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেগে গেলাম ব্যবসায়ে।

মন দিয়েই কথাগুলি শুনছিলেন ভদ্রলোক। এখন বলে ওঠেন—ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে না বুঝি ?

কী করে উন্নতি করবো ? শুধু ব্যবসা করতে বললেও না হয় এক রকম হত। তিনি বললেন সৎ থেকে ব্যবসা কর, বিলাসিতা বর্জন কর, বাঙ্গালী জাত-ভাইদের ভাত দাও, দেশ কাল না বুঝে কেবল গোঁয়ার্তুমি করলে চলবে কেন ? ব্যবসা করতে গেলে একটু আধটু হেরফের করতেই হয়। তারপর কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে বা টিউবওয়েল বসালেই তো পাপ খণ্ডন করা যায়। বিলাসিতা বর্জন কর। বিলাসিতা বর্জন করলে আমাকে মানবে কে ? আমি যদি দামী স্যুট টাই পরে যাই তবেই আমার খাতির। আর জাত ভাইদের ভাত দাও—

যেন মুখের কথা! বাঙ্গালীর উপর পরিশ্রমের ভার দিলে সে ব্যবসায় গনেশ ওল্টাবেই।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। বলতে লজ্জা করছে না? সমস্ত জীবন দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে যে শিক্ষা তোমাদের দিয়েছিলাম, আজ ঘোর দুর্দিনে তোমরা তা ভুলে বসে আছ? কত আশা, কত স্বপ্ন ছিল তোমরা বড় হবে, পৃথিবী জুড়ে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করবে। বড় হবে, বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখ নাম দূর হবে। তার এই পরিণতি! আমার যে হাত পা বাঁধা। অমি যদি একবার যেতে পারতাম, তবে কী আর কারো রক্ষা ছিল! খুব না ঘটা করে আমার শতবার্ষিকী পালন করছ, ষ্ট্যাচু বসিয়েছ? আমার আদর্শ-চ্যুত হয়ে তোমরা কী শ্রদ্ধা জানাতে এসেছ?

সভয়ে জিভ কেটে বলে উঠি—আপনি, আপনি স্যার পি. সি. রায়?

মেয়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ধূপধুনোর গন্ধে ঘর 'ম-ম' করছে।*

*বষ্টিমধু: শ্রাবণ (প্রফুল্ল শতবার্ষিকী), ১৩৬৮।

মামী শাশুড়ী

তাপসী আড়মোড়া ভেঙ্গে শুয়েই থাকে। হাতের কাছেই একখানা মাসিক পত্রিকা। সেখানা তুলতে গিয়েও রেখে দেয়। সুখের আবেশে ঝিমুনি আসে। দুটি মাসে তার জীবনের কী বিরাট পরিবর্তন। দুটি মাস যেন দুটি দিন বলে মনে হয়। বিয়ে তো সবারই হয়, তার মত সুখী কে? বিয়ের পরই স্বামীর কর্মক্ষেত্র দিল্লীতে চলে এসেছে। পাছে তার মন খারাপ হয় সে জন্য নরেনের ব্যাকুলতার অন্ত নেই। প্রতিদিনই এখানে সেখানে বেড়ানো, সিনেমা চলছেই। বাজারে যাবার সময় কয়েকবার জিজ্ঞেস করবে, তুমি কী খাবে? কিছু না বললেই বাবুর অভিমান। জীবন যে এত আনন্দের এত সুখের তা কিছুদিন পূর্বেও তাপসী জানতো না।

সদরে কড়া নড়ে ওঠে। তাপসী ধড়মড়িয়ে ওঠে। বেশবাস ঠিক করে নেয় কিন্তু এখন কড়া নাড়বে কে? কানাই এখন কখনই ফেরেনি। ওরা একবার আড্ডা দিতে বেরুতে পারলে এত শীগগির কখনো ফেরে? এই দুপুর বেলাটাই ওদের ছুটি। দেশ থেকে শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই চাকরটি দিয়েছিলেন, কারণ নূতন বৌ, ও সব সময় কাছে থাকবে। তা কানাই চতুর আছে বলতে হবে, এরই মধ্যে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে দিব্যি দুপুরবেলা চলে যায়। তবে কে কড়া নাড়ে? নরেনের কড়া নাড়া এরই মধ্যে চেনা হয়ে গেছে; আর সে এলে কানাইকে ডাকে।

দরজা খুলে দিতেই এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখতে পায়। তাঁরা মধুর কণ্ঠে বলে ওঠেন—নরেন তো বাসায় নেই; তুমি তো মা আমাদের চিনবে না! আমরা তোমার মামাশ্বশুর ও মামীশাশুড়ী। এই বলে ওঁরা নিজেরাই ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেন। মহিলাটি একখানা একশত টাকার নোট তাপসীর হাতে দিয়ে বলেন—বিয়েতে তো আমরা আসতে পারিনি, তোমায় আশীর্বাদ করাও হয়নি। এ দিয়ে তোমার পছন্দ মত কিছু কিনে নিও।

তাপসী লজ্জিত হয়ে এতক্ষণে ওদের পায়ের ধুলো নেয়। মামী একশত টাকার নোট উপহার দেন, তাঁর উপর ভক্তিটা কিছু বেশীই হয়।

ভদ্রলোক থাক্-থাক্ করে ওঠেন। নরেন এখনো এল না কেন বল তো? আমি ফোন করে বলে দিয়েছি যে বেলা দুটো নাগাদ আমরা তোমার বাসায় যাচ্ছি। তখন বললে হ্যাঁ, যান, যান। আমিও যেতে চেষ্টা করব। অবশ্যি ওর সঙ্গে দেখা না করে আমরা যাবনা। মামীমা বলেন, তুমি বুঝি ঘুমিয়ে ছিলে?

তাপসী জবাব দেয় ঘুম তার হয়ে গিয়েছে। মনে মনে নরেনের মুণ্ডপাত করে, আচ্ছা বেআক্কেলে লোক! মামা মামীর কথা আমাকে তো একবার বলতে হয়। কি বেকুবটাই আমাকে বানালে!

ভদ্রলোক বলেন—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমরা এখন যাচ্ছি না। নরেন এলে তার সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

তাপসী একবার ভাবে, জিজ্ঞেস করবে আপনারা কোথায় থাকেন? আবার তক্ষুনি মনে হয় একথা জিজ্ঞেস করলে এঁরা ভাববেন আমরা কোথায় আছি তাও নরেন জানায় নি। এ পরিস্থিতিতে এঁদের কথা শুনে যাওয়াই ভাল।

মামী জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ বৌমা, তোমার বাবা কী গহনা দিলেন? নরেনদের বাড়ী থেকেই বা কী দিয়েছে, আমি তো কিছুই দেখিনি।

ভদ্রলোক বলেন—মেয়েদের গয়না আমি দেখে কী করবো! আমায় বরং একটা কাগজটাগজ দিয়ে যাও।

তাপসী মামীকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে।

তারপর বাক্স খুলে দেখাতে থাকে, এই হীরের কণ্ঠিটা ঠাকুমা দিয়েছেন, আর আর এই জড়োয়া-চুড়টা বড়দি···

আর বলার সুযোগ হল না। মামা পেছন দিক দিয়ে এসে তাপসীর মুখে রুমাল বেঁধে, কাপড় দিয়ে হাত পা বেঁধে বাক্স থেকে সব ক'খানা গহনা নিয়ে উধাও হলেন। মামী সাহায্য করে পিছু নিলেন।

আরও অনেক পরে কানাই এসে অবস্থা দেখে হাঁক ডাক আরম্ভ করলে। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এল, কিন্তু কোথায় পাবে মামা মামীকে? নরেনকে ফোন করা হল। নরেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। সবাই জটলা করছিল কী করে ঠিকানা পেল, নরেনের নামই বা জানলো কী করে। এমন অভিনব চুরি তারা জীবনে শোনেনি।

নরেন চুল টেনে বললে, আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। কাল এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসে বলেন তার ব্যাগটা চুরি গিয়েছে যদি তাকে পাঁচটা টাকা

দিই তবে কাল টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন। সঙ্গে মহিলা দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে তক্ষুনি তাঁকে টাকা দিই। ভদ্রলোক অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নয়নের ঠিকানা নিয়ে নেয়। আজ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ কাজ তাদেরই। শুনে সবাই 'থ' বনে যায়। এতক্ষণে তাপসীর আঁচলের একশত টাকার নোটটির কথা মনে পড়ে। দেখে মামা মামী সেটিও নিয়ে যেতে ভোলেন নি।*

* বন্টিমধু: চৈত্র, ১৩৮৭।

পরাজিতা

মেদিনীপুর সহরটাতেই একটা 'সাড়া' পড়ে গেল। ছোট্ট সহর, সামান্য আলোড়নে সমস্ত সহরটাই তোলপাড় হয়। সবার মুখেই এক কথা—জেলার গৃহিণীকে দেখেছ? পথে ঘাটে একই আলোচনা, জেলার গৃহিণী ইন্দ্রাণী রায়কে নিয়ে। চাঞ্চল্যটা হাই সোসাইটিতেই তোলপাড় করে। কত জেলারই তো এল, গেল। এ জেলারকে নিয়েই বা কে মাথা ঘামাচ্ছে, কিন্তু তার গৃহিণীটিকে যে একবার দেখেছে তার আর ভোলার উপায় নেই।

চক্রবর্ত্তী বলছিল লাহিড়ীকে, একবার মহিলার সঙ্গে আলাপ করে এসো। এমন জ্ঞানী মহিলা তুমি কমই দেখেছ—এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

লাহিড়ী একটু বক্র হাসি হেসে বলেন—হঁ্যা হঁ্যা, তোমাদের তো আবার মেয়েদের উপর একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব।

চক্রবর্ত্তী জবাব দেয়, বেশ তুমি দেখে এসো, যদি আমি একটুও অতিরঞ্জিত বলে থাকি তখন বিদ্রূপ করো।

আচ্ছা আচ্ছা, আজই বিকেলে গিয়ে তোমাদের অষ্টম আশ্চর্য দেখে আসব। মিসেস লাহিড়ীকে বলেন, চল আজ এমন এক জায়গায় তোমায় নিয়ে যাব যেখানে গেলে তোমার রূপের গর্ব খর্ব হবে।

এটা লাহিড়ীর গর্বের তামাসা। লাহিড়ীর দৃঢ় ধারণা তার স্ত্রীর মত সুশ্রী সুগৃহিণী খুবই বিরল।

ফেরার পথে লাহিড়ীর মুখে আর 'রা' নেই, মহা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। লাহিড়ী বলেন, সত্যি চক্রবর্ত্তী তুমি ঠিকই বলেছিলে, মহিলা উচ্চশিক্ষিতা তো বটেই, মনে হয় ওদেশও ঘুরে এসেছেন। দেখলাম তো সে সম্বন্ধে ওঁর কত জ্ঞান। এমন রূপও মানুষের হয়?

নীরেনকে দিলীপ বলে, তুই কী ছেলে রে? একদিন মিসেস রায়ের সঙ্গে আলাপ করে এলি নে?

আরে রেখে দাও তোমার মিসেস রায়। আমার মিসেস নিয়েই আমি হাবু-ডুবু খাচ্ছি।

বিয়ে যেন আর কেউ করে না! না হয় শান্তাকে নিয়েই একবার দেখে আয়। শান্তা মিসেস রায়ের কাছে অনেক কিছু শিখে আসতে পারবে।

নীরেন বলে উঠে—পরের বৌ এর সঙ্গে আলাপ করে তোমরা এত কী আনন্দ পাও বল তো? আর শান্তা তার কাছে কিছু শিখতে পারবে বলছ? তিনি যদি শান্তার কাছে স্বামী-সেবা শেখেন তবে ধন্য হবেন। বলে রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকে।

দিলীপ তবু বলে, একবার দেখেই আয় না।

সেদিনই নীরেন শান্তাকে নিয়ে মিসেস রায়ের বাসায় যেতে যেতে বলে—দেখো মিসেস রায়কে দেখে আবার না তোমায় ভুলে যাই।

স্বামী গর্বে গর্বিতা শান্তা এমন অসম্ভব কথা শুনে কৌতুকে হেসে ওঠে।

প্রৌঢ় রামতনু বাবু ব্যাচিলার মানুষ। ছোট্ট বাংলোখানায় নিরিবিলিতে থাকেন। এক কালে স্বদেশী করে জেল খেটেছেন। বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, নেতাদের কাজ তাঁর ভাল লাগে না, তাই নিজে কোন বিরাট পদ অলংকৃত করেননি।

সেদিন দেবেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, আপনি এখনো একবার জেলারের বাসায় গেলেন না?

রামতনু জবাব দেন—যাব একদিন।

যাব নয়, আজই আমার সঙ্গে চলুন, আপনাকে একটি অপূর্ব জিনিস দেখিয়ে আনবো।

রামতনু বাবু হেসে ওঠেন। বলেন—আমি দেখছি আপনাকে নিরাশ করব। অজস্র মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে আজ আর মানুষ সম্বন্ধে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি না, তা ছাড়া আপনাদের ভাল আর আমার ভাল এক নাও হতে পারে।

দেবেনবাবু বলেন—বেশ তো আপনি একবার আসুন না!

না, যেতে আপত্তি কি? চলুন আজই ঘুরে আসি। মিসেস রায় সবার বাসায়ই আসেন। এসেই হয়তো কারো শুকনো কাপড় ঘরে তোলেন। কারো ধুলো মাথা ছেলেকে পরিষ্কার করেন। কারও বাসায় গিয়ে হয় তো লুচি ভাজতেই বসে গেলেন। সবাই অবাক, মহিলা কি একটু বিশ্রামও করতে জানেন না! লোকের বাড়ি এসেও কাজ! এমন গুণ নেই যা তাঁর নেই।

বরুণ কুমারের আর এ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীকে দেখা হয়ে ওঠে নি। কারণ অনুপা

নাম্নী এক তরুণীকে আবিষ্কার করে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কোথা দিয়ে ভোর হয়, আর কোথা দিয়ে সন্ধ্যা আসে, বরুণের কিছুই খেয়াল থাকে না।

অনুপা বলে—চল একদিন মিসেস রায়কে দেখে আসি।

বরুণ জবাব দেয়—নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

চলই না একবার দেখে আসি, কি নিয়ে মানুষ এত হৈ চৈ করছে!

এ আর দেখতে হবে নাকি? মানুষের নিছক ছ্যাবলামো ছাড়া আর কী?

তবু অনুপার অনুরোধে যেতেই হয়।

কিছুদিন বাদে মহিলাদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা যায়। চারপাশে কেমন একটা গুঞ্জন উঠতে থাকে, ছেলেরা মিসেস রায়ের কাছ হতে যেমন আদর যত্ন পায়, মেয়েরা নাকি তার কিছুই পায় না, বরং একটা অবজ্ঞা অনাদরের আভাসই পায়। শুনে স্বামীরা স্ত্রীদের মুখে হাত চাপা দেয়। ছিঃ ছিঃ, এমন একজন অনিন্দনীয় মহিলার বিরুদ্ধেও তোমাদের কথা। একেই বলে ঈর্ষা। আর যেন দ্বিতীয়বার এমন হীন মনের পরিচয় দিও না।

জেলারের বাসায় বহু রকম খেলার জিনিস আছে। কেউ খেলে, কেউ গ্রামোফোন বাজায়, কেউ রেডিও খোলে, কেউ বা মিসেস রায়ের সঙ্গে গল্প করে, সকলেই বিভোর।

দু বন্ধুর গল্প হচ্ছিল। পরিণামদর্শী গুপ্ত চক্রবর্ত্তীকে বলে— আমার মনে হয় মিসেস রায় একটু পুরুষ ঘেঁষা মানুষ।

আর যাবে কোথায়! এ যেন মৌচাকে ঢিল ছোড়া। সবাই গুপ্তকে এক ঘরে করে ছাড়লে, অর্থাৎ তার বাড়ি আর কোন বাঙ্গালী যেত না বা গুপ্তও কোন বাড়ি ঢুকতে পেত না। শুধু মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালতেই বাকী, তার এমন দুর্গতি করে ছাড়লে।

মিসেস লাহিড়ী বলে—একি আজ তো আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, এখন চল্লে কোথায়?

লাহিড়ী রুক্ষ স্বরে জবাব দেয়—কোথায় আবার যাব? যাচ্ছি জেলে, ওসব নিমন্ত্রণ আমার পোষাবে না। যেতে হয় তুমি যেও।

স্বামী চলে যেতে মিসেস লাহিড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তার এমন সুখের সংসারে 'চীর' ধরল কেন? কোন রন্ধ্র পথে শনি প্রবেশ করল? মিসেস রায়ের শুধু নিজের স্বামীটি ছাড়া আর সবার উপর এমন নেকনজর কেন?

কে দেবে তার কথার জবাব?

শাস্তা ঘর আর বার করছে। মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছে নীরেন এখনো ফেরেনি। সেই সকালে জেলে গিয়েছে, বলেছে—ছুটির দিন একটু ঘুরে আসি। এখন বেলা তিনটেতেও ঘোরা হল না। মাত্র ছ'টি মাস বিয়ে হয়েছে, এতদিন তো অফিস ছাড়া একটি ঘণ্টার জন্যও কোথা যেতে চাইত না, জেলারই বা কেমন মানুষ! রাজ্যের লোক এসে তার স্ত্রীর কাছে ভীড় করে, সে কী করে সহ্য করে? বেচারী! মুখখানা সব সময় বিষণ্ণ। মুখে আগুন অমন মেয়েমানুষের। গুণী তিনি। হ্যাঁ গুণী বটে, নয়ত এতগুলি মানুষকে এক করে ধূলো পড়া দিয়ে রাখছে? শাস্তার শূন্য পেট ও শূন্য মন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। হঠাৎ ১২ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি কবিতা আবিষ্কার করে! মিসেস রায়ের উদ্দেশ্যে লেখা। বিয়ে করে ফেলেছে বলে আক্ষেপও আছে।

রামতনু বাবু আজকাল জেলেই আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর তো আর সংসারে পথ চেয়ে বসে থাকার কেউ নেই। তবে এতদিন যে বিরাট মানব-গোষ্ঠির অন্তর্গত তিনি ছিলেন, তাদের সুখ দুঃখ যে ভাবে তাঁকে আকুল করত, এখন যেন তা একজনের মধ্যে এনেই স্থির হচ্ছে। নিন্দুকেরা বলে, এখন তিনি দিবা-স্বপ্নেই বিভোর।

মিসেস রায়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজটুকু করতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। অতি আনন্দেই আছেন—জেলে তো বহুবারেই তাকে যেতে হয়েছে, সেই জেলই যে এমন রমণীয় তা কে জানত?

অনুপা চোখের জল মুছে ফেলে। না সে কাঁদবে না।

কান্না তো দুর্বলের জন্য। তাকে ভগবান বাঁচিয়েছেন। ভালই হল, বিয়ের আগেই বরুণের এ দুর্বল মনের পরিচয় পেয়ে। আশ্চর্য! যে মানুষ একদিন অনুপাকে না দেখলে দুনিয়া অন্ধকার দেখতো তার আজ সাতদিনের ভিতরও পাত্তা নেই।

উঃ তবু পোড়া মন বোঝে না। আবার ওরই জন্য সমস্ত প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

জেলার সাহেব অতি সুশ্রী ছ'ফিট লম্বা চওড়া একটি যুবককে নিয়ে এসে বলেন—এই যে আমাদের নূতন ডেপুটি সুদর্শন বাবু এসেছেন।

ইন্দ্রাণী নমস্কার করতে ভুলে যায়। চেয়ে থাকে অপলক চোখে। কী অপূর্ব সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল চোখ, ব্যাক্তিত্বে পরিপূর্ণ চেহারা। ইন্দ্রাণী রায়ের মত সুচতুরা সুন্দরী মেয়েও যেন থমকে থাকে। সুদর্শন বাবুই বলে ওঠেন—আপনি তো

অতি পরিচিতা, যদিও চাক্ষুষ নয়, তবুও স্বনামধন্যা ব্যক্তি কি কখনো অপরিচিতা থাকে? বলে হা হা করে হেসে ওঠেন।

ইন্দ্রাণী এতক্ষণে একটু সামলে নিয়ে বলে—কী যে বলেন? বসুন, চা আনছি।

নিজের হাতে চা নিয়ে ইন্দ্রাণী যখন ঘরে ঢুকল তখন একটা আনন্দের হিল্লোলে সে পরিপূর্ণা।

সুদর্শন এখন একাই এসেছে জেনে ইন্দ্রাণী বলে ওঠে—আপনি তা হলে আর আলাদা ব্যবস্থা করবেন না। মেয়েরা না আসা পর্যন্ত আমাদের এখানেই খাবেন।

আপনারা থাকতে অসুবিধা যে হবে না সে তো জানা কথা। আজ এখানেই খাব। তা বলে রীতা যে আমায় অকর্মণ্য ভাববে তা হতে দিচ্ছিনে।

মুহূর্তের জন্য একটা কালো ছায়া ইন্দ্রাণীর মুখে ভেসে যায়। বলে—একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন না কেন?

অসুবিধা ছিল, মাস কয়েক পরে আসবে। আমার মার শরীরটা ভাল নেই।

ইন্দ্রাণী মুখ নীচু করে একটা ক্রূর হাসি গোপন করে। ভাবখানা পরে আর এসেছে!

জেলে কী যেন এক বিপর্যয় ঘটে যায়। লাহিড়ী এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, ইন্দ্রাণীর পাত্তা পায় না। চক্রবর্তী হাজার ডেকে সাড়া পায় না। নীরেন দিলীপ সকলেই মুখ চুণ করে জেলারের বাড়ি ঘুর ঘুর করে। রামতনু বাবু বহুবার ভেবেছেন আর জেলে যাবেন না। তবু যেতেই হয়। গিয়ে সুখ নাই তবু!

সকলের চেয়ে অসুখী ইন্দ্রাণী নিজে। সুদর্শন আসে, নিমন্ত্রণ খায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাস খেলে, গল্প করে, ইন্দ্রাণী যা করতে বলে তা করে। মাঝে মাঝে বেড়াতেও যায়। সুদর্শনের বাসায় ইন্দ্রাণী জলযোগ করে, তবু এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান থেকেই যায়। ইন্দ্রাণীর প্রাণে সুখ নাই।

অনেকদিন গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়। বাড়ি নিঝুম। হঠাৎ ঘড়ির ঢং ঢং শুনে সুদর্শন উঠে দাঁড়ায়—ইস্ অনেক রাত হয়ে গেছে, গল্প করতে বসলে আর খেয়াল থাকে না। লজ্জিত হয়ে সিড়ি দিয়ে তর তর করে নামতে নামতে বলে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—শুয়ে পড়ব? ঘুমুব! ঘুম যে কেড়ে নিয়েছ। মনে মনে বিড় বিড় করে ইন্দ্রাণী। এমন প্রাণবন্ত মানুষ ইন্দ্রাণী দেখে নি। এ আলো। অন্ধকারের

সাধ্য কি এর কাছে ঘেসে! আজ কতদিন এসেছে। আঙুল গোণে, তা প্রায় ছয় মাস হতে চললো। ইন্দ্রাণী কী এক অসহ্য জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

দুপুরে একখানা বই হাতে নিয়ে বিশ্রাম করছিল ইন্দ্রাণী। আয়নায় দেহের কতকাংশ দেখা যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। বইএর পাতা আর খোলা হয় না। বৌদি শীগ্‌গীর মিষ্টি বের করুন—বলতে বলতে সুদর্শন আসে। পেছনে কালো, বিশাল দেহের অধিকারিণী এক মহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে ধপাস্ করে বসে পড়ে।—জুলুম দেখুন, এতদূর থেকে এলাম এখন বিশ্রাম করব, স্নান করব, না আগে বৌদিকে দেখবে চলো। যেন আপনি এক্ষুণি কোথায় চলে যাবেন।

ইন্দ্রাণীর গালে কে যেন কষে চড় দেয়। সমস্ত মুখ কালো হয়ে যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী! হা ভগবান! রীতা একটু সুন্দরী হলে কী ক্ষতি ছিল! কতদিন ভেবেছে রীতা না জানি কী অসম্ভব সুন্দরী। যে মেয়ে ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য ম্লান করে দিতে পারে তার রূপ তো সোজা নয়। সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলে বলত চমৎকার! এ শুনে ইন্দ্রাণীর মন এমনি টন্‌-টনিয়ে উঠত যে আর কিছু বলত না।

সুদর্শন কৌতুকে বলেই চলেছে—অবাক করে দেব বলেই আসার খবর কিছু জানাই নি। কৈ বৌদি মিষ্টি বের করুন।

ইন্দ্রাণীর দেহটা কেঁপে দুমড়ে ওঠে। সুদর্শন চেঁচিয়ে ওঠে—বৌদির ফিট হয়েছে, জল দাও, হাওয়া কর। চারিদিকের লোকজন ছুটে আসে।*

* মহিলা: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭।

যুগধর্ম

দীপঙ্কর রায় ধার্মিক মানুষ। এই কলি যুগেও তিনি যথাসাধ্য ধর্ম বজায় রেখেই চলেন। আহ্নিক না করে জল স্পর্শ করেন না। রামায়ণ, মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ—ছেলে মেয়েদের জিদ করে এই সব ধর্মগ্রন্থ পড়িয়েছেন। কারু কোন সাতে-পাঁচে নেই, লোকের দুঃখ দেখলে গলে যান। তবু, সব সময় ঈশ্বর আরাধনা করলে গৃহীর পেট ভরে না, তাই জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছেন টিচারী। যাতে অনাবশ্যক উত্তেজনা নেই, প্রলোভন নেই। তা ছাড়া জীবিকার ভিতর দিয়েও কিছু সমাজ সেবা হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য মন খারাপ হয়ে যায়। যখন দু-পাঁচ মিনিট লেটের জন্য হেডমাষ্টারমশাই কৈফিয়ৎ তলব করেন। আরে বাপু, ঘড়ি দেখবি, না আমার কাজ দেখবি! সবাই বলে দীপঙ্কর স্যারের মত স্যার হয় না।

ইদানীং একটু বিপদে পড়েছেন কন্যা শুক্তিকে নিয়ে। শুক্তি প্রায়ই দাপাদাপি করে এ শাড়ী পরে বেরোন যায় না, ভাল কাপড় কিনে দাও। তারপর সুধীরের কলেজের খরচও সোজা নয়। তবু রক্ষা যে ভগবান তাকে মাত্র দুটি পুত্র কন্যাই দিয়েছেন। না হলে যে কী উপায় হত!

সাবিত্রী তেলের বাটী নিয়ে ঘরে ঢোকে। কি গো স্নানের বেলা হল না?

হ্যাঁ দাও, এই তামাকটুকু খেয়ে নি, শুক্তির জুতো এ-মাসে না কিনলে চলবে না?

না গো না, মেয়ে প্রতিদিন গন-গন করে। টিউশনিটা ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

দীপঙ্কর রায় হুঁকায় ঘন ঘন কয়েকটি টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—টিউশনি তো ছাড়িনি তবে টাকা আর নেব না। কেন জান? একদিন ছাত্রীর বাইরের ঘরে ঢুকে শুনি—টিউটার ছাড়িয়ে দাও, টিউটারকে টাকা দেবার জন্য তুমি অধর্ম করে মানুষকে পীড়ন করবে এ আমার সহ্য হয় না।

কী করব বল—সৎভাবে কি এযুগে বাঁচার উপায় আছে! এখন টিউটার ছাড়িয়ে দেওয়ার মানে সুলেখা ফেল করবে। আর ম্যাট্রিক ফেল মেয়ে এযুগে অঙ্গহীনের মতই অচল।

আর শোনার প্রবৃত্তি হয়নি। সুলেখাকে ডেকে পড়িয়ে আসি। তবে টাকা আর আমি নেব না। অধর্মের টাকা নিতে পারব না।

সুলেখার তো গতি করলে তোমার মেয়ের কী গতি করবে?—সাবিত্রী বলে।

দেখি ভগবানের কী ইচ্ছা! তুমি তো জান মেয়েকে আমি পড়াতে চাইনি। বিয়ে দিয়ে দেবই ঠিক করেছি। কিন্তু যেখানেই যাই সবারই এক কথা, ওমা! পনের-ষোল বছরের মেয়ের আবার বিয়ে কি? এত ছোট ছেলে কোথায় পাবেন? হায়রে যুগ! পনের-ষোল বছরের মেয়ে নাকি একেবারেই ছেলে মানুষ! তা হবেই বা না কেন? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের আগে তো আর এখন বিয়ের বয়স হয় না!

তা বলে দীপঙ্কর বাবু ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নি। শুক্তিকে প্রথমে দিয়েছিলেন মহাকালী পাঠশালায়, যাতে করে দেবদ্বিজে ভক্তি হয়, পূজা আচ্চাগুলি শেখে। বাড়িতেও শিব পূজা করান, স্তোত্র-পাঠ, নিত্যকর্মপদ্ধতি পাঠ করান। সাবিত্রীর প্রতি কড়া হুকুম প্রাতঃস্নান করে স্তব-স্তুতি পড়লে তবে খেতে দেবে। তারপর মহা-পুরুষদের জীবনী রামায়ণ মহাভারত নিজে যত্ন করে পড়ান ও বুঝিয়ে দেন।

সাবিত্রীকে নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়নি দীপঙ্কর রায়কে, কেননা সাবিত্রী জাত-গৃহিণী। এক ধরণের মেয়ে থাকে যারা মা হয়ে গৃহিণী হয়েই জন্মায়। সকলে তাদের নিয়ে সুখী হয়। তারা পাঁচ জনের ভিতর বিলিয়ে দেয় নিজেকে। সংসারের সব কিছু কাজ ক'রে সাবিত্রীর সময় হয় না বাইরে যাবার। কবে এক জোড়া স্যাণ্ডেল কিনেছিলেন, আজো টিঁকে আছে।

দু'এক খানা ভাল শাড়ীও দিলে তা বাক্সেই ভাঁজ করা থাকে। ইদানীং শুক্তি পরে স্কুলে যায়। পূর্বাবস্থা বজায় রাখা আজ-কাল কঠিন হয়ে পড়েছে। শুক্তি, সুধীর ওরা যেন এ অবস্থায় সুখী নয়। বাবাকে নিয়ে প্রায়ই ভাইবোনে হাসাহাসি করে। একটু আধটু দীপঙ্কর রায়ের কানে যায়। চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এরা এযুগের ছেলে মেয়ে। সব কিছু ভেঙ্গে ফেলাই যেন এযুগের ধর্ম। স্কুলেও দেখেন তো, ছাত্রছাত্রীরা নিঃসঙ্কোচে টিচারদের নিয়ে রঙ্গ ব্যাঙ্গ করে—তাঁদের যুগে যা কল্পনারও অতীত ছিল। এতেই নাকি শিক্ষা ভাল হয়। ভয় করলে নাকি শিক্ষা হয় না।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে শুক্তি। দীপঙ্কর রায় উঠে পড়ে লাগেন বিয়ের জন্য। মেয়ে বলে আমি আই. এ. পড়ব। সুধীর বলে নিশ্চয়ই পড়বে। সম্বন্ধ ঠিক

হোক, তখন তো বিয়ে দেবে। আত্মীয় স্বজনেরও এই মত। মেয়ে বসিয়ে রাখবে কেন?

দীপঙ্কর রায় অসহায়ের মন সাবিত্রীর মুখের দিকে চান। না, সেখান থেকে হতাশ হতে হয়। সাবিত্রীও বলে—পাশ করেছে, কলেজে পড়বে না? আর দু একটা পাশ করলে ভাল পাত্র পাবে। দীপঙ্কর রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাথা চুলকোয়। নাঃ তার কথা কেউ ভাবছে না। সুধীর এম. এস-সি. পড়ছে, মেয়ে আই. এ পড়লে এত খরচ কী করে চলবে? তারপর বিয়েতে তো সেই একগাদা টাকা খরচা করতেই হবে। বাধ্য হয়েই আরও দু একটা টিউশনি বাড়িয়ে দিতে হয়। শুক্তি কলেজে ভর্তি হয়।

দীপঙ্কর রায় এবার আদা-নুন খেয়ে লেগে যান বিয়ের চেষ্টায়, এখন বিয়ে দিতে না পারলে আবার বায়না ধরবে বি. এ পড়ার। এমনিতেই মেয়ের যা নবাবী। তা ছাড়া শুক্তির মতিগতিও দীপঙ্করের বিশেষ ভাল লাগে না। তারপর কবে একদিন কাকে বিয়ে করে বসবে তার ঠিক কি? কোন কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া তো এযুগের ছেলে মেয়ের ধর্ম নয়।

বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার লোক তিনি নন। এযুগের আদর্শ পাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা চাটার্ড একাউণ্টেণ্ট্ পাত্রের দিকে নজর দেন নি। একটি সিনিয়র ক্লার্ক পাত্র যোগাড় করেছেন। ছেলেটি ভাল। শিক্ষিত বিনয়ী। পরিবারটিও দীপঙ্কর বাবুর ভালই লাগে। ঠিক এমনিটিই তিনি চেয়েছিলেন।

শুক্তিকে দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে। কাজেই বিয়ের তোড়জোড় লেগে যায়। অম্লান বদনেই সাবিত্রী গায়ের গহনা ক'খানা খুলে দেয়, তবু যদি মেয়েটা ভাল ঘরে-বরে পড়ে।

কোন গোলযোগ হয়নি। নির্বিঘ্নে শুভকাজ সমাধা হওয়ায় দীপঙ্কর বাবুর বুক থেকে যেন এক পাষাণ নেমে যায়। আর চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। তাঁর প্ল্যান মতই জীবনখানা তিনি গুছিয়ে এনেছেন। কিছু ধার হয়েছে। তা হোক। ধার দেনা কারই বা না থাকে! এখন সুধীরকে বিয়ে দিয়ে একটি বৌমা নিয়ে আসবেন। মেয়েটা চলে যেতে বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

প্রায় বছর ঘুরে আসে। এর ভিতর শুক্তিকে কয়েকবার এনেছেন, কিন্তু মেয়েটা এসেই শ্বশুর বাড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। তাই রাগ করে দীপঙ্কর বাবু আর মেয়ের খোঁজ করেননি।

একদিন স্কুল থেকে এসে দেখেন শুক্তি এসেছে। মেয়েকে দেখে খুশী হয়ে

জিজ্ঞেস করেন, তোকে কে নিয়ে এসেছে রে। আমি ভাবছিলাম যাব; সুধীরের তো নূতন চাকরী—ছুটি নেই।

শুক্তি গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আমি একাই এসেছি।

তার মানে?

ওদের সঙ্গে আমার বনবে না। যত সব রাবিশ। আজকালের দিনে মাথায় কাপড় টেনে চলতে হবে। এঁটো মানতে হবে। একা বেরুতে পারব না।

একা বেরিয়ে তুমি কোন রাজকার্য উদ্ধার করবে শুনি? ওরা তো কোন খারাপ কথা বলেনি। কী অন্যায়! তুমি কোথা হতে মেম সাহেব এসেছ যে এঁটো মানতে পারবে না। শীগ্‌গীর চল তোকে এক্ষুনি আমি মাপ চেয়ে রেখে আসব। সুখময়কে বলে এসেছিস!

শুক্তি গর্জে ওঠে, না—তাকে আবার বলব কি? সে কি জানে না ভেবেছ? তার সমর্থন পেয়েই তো শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এত স্পর্ধা। সেও বলে, "মা যখন পছন্দ করেন না তখন নাই বা একা বেরুলে। গুরুজনের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি?"

ঠিকই তো বলেছে। জামাই আমার সোনার জামাই। কুটুমও খুবই ভাল। আমার মেয়ে হয়ে তুই শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এলি? ভেবেছিস এখানে খুব থাকবি? ওরে মূর্খ, মেয়েমানুষের শশুর বাড়ীর মত জায়গা আর কোথাও নেই। সেখানেই তোর স্বর্গ। এখানে তোর সম্মান কী? তা ছাড়া আমরা না হয় মায়ার বশে তোকে এখন রাখলাম, তা বলে সুধীরও রাখবে এমন কী নিশ্চয়তা আছে? এসব অবান্তর বলে লাভ নেই। তুই শীগ্‌গীর চল তোকে না রেখে এসে আমি জলস্পর্শ করব না।

যাবার জন্য আমি আসিনি। অসম্ভব দৃঢ়তার সহিত জবাব দেয় শুক্তি। তুমি অযথা বিরক্ত করলে যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাবো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কিছুতেই আমাকে শশুর বাড়ী পাঠাতে পারবে না। দাদার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমি কারো ঘরেই থাকবো না। শুধু এখন ক'টা দিন একটু চুপ করে থাকতে দাও।

দীপঙ্কর রায় অসহায় ভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তা বলে সময় বসে থাকে না, আপন নিয়মে এগিয়ে চলে। দিন মাস ক্ষয়ে ক্ষয়ে বছর এগিয়ে আসে, আবার চলে যায়।

শুক্তির ডাইভোর্স হয়ে গিয়েছে। বাবা মার হাজার নিষেধেও ও নিবৃত্ত হয় নি। দীপঙ্কর রায় মরমে মরে আছেন।

এর উপর শুক্তি এসে একদিন মড়ার উপর 'খাঁড়ার ঘা' দিয়ে বলে মা আমি আবার বিয়ে করব।

সাবিত্রী গাছ থেকে পড়ে। তুই বলিস কী শুক্তি? তোর মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না মাগো!

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শুক্তি বলে, চুপ কর। ঢং করো না, ঘেন্না ছিঃ ছিঃ-র কী হয়েছে? রামায়ণ পড়নি? কুন্তী দ্রৌপদীর কথা? তোমাদের ধর্মগ্রন্থেই তো আছে বাপু। বাবা তো রাত দিন রামায়ণ মহাভারত নিয়েই আছেন। আমি অশাস্ত্রীয় কী করেছি?

অনুনয় বিনয় বাধা নিষেধ কিছুতেই ফল হলো না। শুক্তি একটি ছেলের সহিত রেজেষ্টারী বিয়ে সেরেই ফেলে।

দীপঙ্কর রায় মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। নাঃ, এ মেয়ের কথা ভেবে আর আয়ুক্ষয় করবেন না। এবার সুধীরের জন্য একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন, বৌটি এলেই আবার নূতন উদ্যমে সংসার পাতবেন। ভুলে যাবেন সব দুঃখ। আশায় বুক বেঁধে সুধীরকে জানাতেই সে বলে, তা হয় না বাবা, আমি নীতাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

নীতা! নীতা কে?

বাঃ নীতাকে চেন না? পরেশদার বৌ।

তুই তাকে বিয়ে করবি? ওরে কুষ্মাণ্ড। সে তোর জ্যাঠতুতো বিধবা ভাজ নয়? বড় ভ্রাতৃবধূ মাতৃসমা। তোরা হলি কী বল তো?

কী আবার হয়েছি? বিধবা বিয়ে তো শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্রই আইন করে গিয়েছেন। আর মৃত দাদার বৌ বিয়ে করলে আমাদের বাড়ীতেই রইল। এতে অন্যায় তো কিছু নেই অশাস্ত্রীয়ও তো কিছু করছি না। তুমিই না আমাদের রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছ? কেন রামায়ণে পড়নি বালী মারা যেতে সুগ্রীব বড় ভ্রাতৃবধূ তারাকে বিয়ে করে। এতো তোমাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে।

দীপঙ্কর রায় কপালে করাঘাত করেন, হা ভগবান! এই রামায়ণ মহাভারত পড়ানোর ফল। যুগধর্মে বিকৃত দিকটাই ওদের নজরে গিয়েছে। আমার ভাগ্যে সবই উল্টো বুঝলি রাম হয়ে গেল!*

* মহিলা: মাঘ, ১৩৬৭।

কালের হাওয়া

অনাদিবাবুর থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে অপর্ণার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আস্তে চা-এর কাপটি নামিয়ে মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করে—পোচ-না-ওমলেট ?

আমার মাথা আর মুণ্ডু ! দরকার নেই, আমার কিছু দরকার নেই।

অপর্ণা আর একটু সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে এসে বলে—রাগ করে না-খেয়ে থাকলে কিছু সুবিধে হবে ?

বেরিয়ে যাও। আমার কাছে কেউ এসো না। গর্জে ওঠেন অনাদিবাবু।

এবার অপর্ণা ধমকে ওঠে—পাগলামী রাখ। সম্বন্ধ সম্বন্ধ করে তুমি যে মেয়েদেরও হারিয়ে দিলে। ব্যস্ত হলে কী হবে ? বিয়ের ফুল ফুটবে, তবেই তো বিয়ে হবে ! চেষ্টা তো কম করছ না।

সহানুভূতির ছোঁয়ায় অনাদিবাবু যেন ভেঙ্গে পড়েন।—তুমি বলছ পর্ণা, আমি পাগলামী করছি। আচ্ছা বল, এতে কী করে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে ? একটি মাত্র মেয়ে আমার, সুশ্রী, সুগায়িকা গ্রাজুয়েট। শুধু রংটা একটু চাপা, তা বলে মেয়ের আমার বিয়ে হবে না ? কাল ভাগুরের ওরা কী জবাব দিয়েছে জান ? "বারো হাজার টাকা নগদ হলেও এ কালো মেয়ে বৌ করা চলে না। মেয়ে কারো পছন্দ হয় নি, তবে পনের হাজার নগদ দিলে আপনার সন্মানার্থে এদের আমি মত করাব।" এরপরও তুমি বলছ আমি ক্ষেপবো না ? কী এমন ছেলে ? বাংলা দেশে কটি মেয়ে গৌরবর্ণ ? যেখানেই যাও গৌরবর্ণ চাই। ছেলের বিদ্যে তো আই. এস-সি। তবু যা হোক চাকরীটা ভাল করে, বাড়ীর অবস্থা ভাল। তা এই যদি ভালর নমুনা হয় তবে অমন ভালর ক্ষুরে আমার দণ্ডবৎ।

অনাদিবাবু পাইচারি করতে করতে বলতে থাকেন, জান পর্ণা, এ যুগটাই যেন একটা সমস্যার যুগ। এ যুগে কিছুই সহজলভ্য নয়। স্বাভাবিক বলে কিছু নেই। সবই অস্বাভাবিক। খালি ষ্ট্রাগল, তবে তোমায় বলে রাখছি, মেয়ের বিয়ে আমি দেবই।

কী আশ্চর্য ! মেয়ের বিয়ে দেবে না কেন ? দু'দিন আগে আর পরে।

বেশ নিশ্চিন্তে আগে—পরে বলছ! আর কবে বিয়ে দেব বল তো? বিশ বাইশ বছরের আগে এখন বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। তারপর খোঁজখুঁজিতে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশের কোঠায়। পূর্বে মেয়ে বয়স্থা হলে বাপ বলতো—কাল ভোরে যার মুখ প্রথম দেখব তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব। এখন আমি যদি তা বলিও, যাকে প্রথম দেখব—কিন্তু সে মেয়ে নেবে কেন? এ যে যাচাইয়ের যুগ। এ যুগে কারো কথায় কেউ কিছু করে না।

স্বয়ম্বরেও সেই সমস্যা। মেয়ের হয়ত মনে ধরল, যখন মালা দিতে গেল তখন দেখা গেল ছেলের মনে ধরল না—গলাটি সরিয়ে নিলে। কী বিভ্রাট!

অপর্ণা কাপ-ডিস রেখে দিয়ে এসে বলে—সে তো খুবই সত্যি কথা।

ভেবে দেখ পূর্বে কুষ্টি মিলানোর ঝামেলা ছিল, এখন তা ছেড়েছি। জাতি বিচার ছেড়ে দিয়েছি। অন্য প্রদেশে বিয়ে দিতে আপত্তি করি না, তবু আমার মেয়ের একটা ভাল বিয়ে হবে না? কেন? কেন হবে না? মেয়ে আমার কোন গুণে খাটো বলতে পারে?

অফিস হতে এসে অনাদিবাবু হাঁক দেন, কিগো খেতে টেতে দেবে না?

অপর্ণা বলে, তোমাকে যে আজ বেশ খুশীখুশী দেখা যায়। ভাল খবর আছে মনে হচ্ছে!

অনাদিবাবু বলেন—ভেবে দেখলাম, বিশেষ করে বিশ্বম্ভরদা বললেন যে, মেয়েকে উপস্থিত একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দাও। তিনি বললেন "পয়সা খরচা করে মেয়ের বিয়ে দেবে—তারপর হয় তো মেয়ে নিয়ে কত ভোগান্তি হবে। তার চেয়ে মেয়েকে চাকরীতে দিয়ে দাও। মেয়েও সুখে থাকবে, তুমিও দুটো পয়সার মুখ দেখবে।

অপর্ণা মুহ্যমান অবস্থায়ই জিজ্ঞেস করলে—মেয়ে চাকরী করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে?

এখন তো চাকরী করুক, নিত্যি নতুন শাড়ী পরবে, গহনা বানাবে, সিনেমায় যাবে। তারপর যখন বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে তখন ক্লান্তি আসবে। ছেলেদেরও চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরে ঘুম ভাঙ্গে; তখন শ্রান্তি বোধ করে। ইচ্ছা হয় ঘর বাঁধার। তখন পাত্র জোটা কিছুটা সহজ হবে। নাকটানও দুজনের কমে যাবে। তবে কথা কী জান? কাদা-মাটি ছাড়া তো ছাঁচ তৈরী হয় না। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বয়স তখন স্বভাব বদলানোর বাইরে। কাজেই একে অপরের ইচ্ছায় চলা সম্ভব নয়।

কিছুদিন পরে তপতীর কাকা ওকে দিল্লী নিয়ে যেতে চাইছেন। তিনি বলেন বিয়ে-বিয়ে করে তোমরা মেয়েটার মাথাই বিগড়ে দেবে। আমার কাছে কিছুদিন থাক।

হুঃ, এখন চারিদিক থেকে সম্বন্ধ আসছে, এ সময় তোমার মেয়ে দিল্লী গিয়ে রাজা হবে। বলে অনাদিবাবু সিগারেট ধরান। তখনি ঘরে ঢোকে অনিল।

বিয়ে তো ক'বছর ধরেই তোমরা দিচ্ছ। আমার কাছে দু'মাস থেকে এলে লগ্ন ফুরিয়ে যাবে না।

বেশ তোমরা যা ভাল বোঝ কর। মেয়ের বিয়ের ফুল না ফুটলে আমি কি করতে পারি?

মাস দুই পরে তপতী এসে বলে, মা আমরা তোমাদের প্রণাম করতে এলাম। মা চেয়ে দেখেন মোটা বেঁটে এক ভদ্রলোক তপতীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করছে।

মা কেমন যেন হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

তপতী বলে, রাগ করোনা মা, তোমাদের অনুমতি নিতে পারিনি বটে, কিন্তু ইনি আমাদের স্বজাতি।

অপর্ণা অনাদিবাবুর ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। অনাদিবাবু এসেই খুঁটিয়ে জামাই-এর পরিচয় নিতে থাকেন।

হাঁক ডাক করে জামাই মেয়েকে ভাল ভাবে জলযোগ করিয়ে বেড়াতে পাঠিয়ে গান ধরেন, ওগো গিন্নী—গো—ও। অপর্ণা ঘরে ঢুকতে লাফিয়ে ওঠেন, ঘুরপাক খেয়ে নাচেন আর বলেন বাজী মাৎ, বাজী মাৎ।

অপর্ণা বলে জামাই বুঝি খুব পছন্দ হয়েছে?

দূর বোকা পছন্দ কিগো? এই তো তোমার বালীর ছেলে। তোমার মনে নেই—সেই যে বালী থেকে সম্বন্ধ এল, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। বাবা দশ হাজার টাকা নগদ আর চল্লিশ ভরি সোনা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম ক্যাশ দশ হাজারই দেব তবে সোনাটা ত্রিশ ভরি করুন। ভদ্রলোক চটে লাল, বলে এ কি মাছ তরকারী দাম করছেন? ছেলেটি আমার উপযুক্ত। আপনার মেয়েও ফর্সা নয়, এর কমে আপনি কী করে আশা করেন? আজ তিন বছর পরে, তপতী কী করে এ ছেলে শুধু হাতে যোগাড় করলে? ছেলে তো দেখছি খাটো। তপতীর যে বেঁটের উপর বিষম ঘৃণা ছিল। কী করে এ সম্ভব হ'ল?

অপর্ণা বলে—হ্যাঁ, তপতী বলছিল এর বাবার খুব টাকার খাঁকতি, তাই টাকার জন্যে কোন মেয়েকে ধরে আনবে ভেবেই নাকি আরো তাড়াতাড়ি রেজেষ্টারী বিয়ে করেছে।

অনাদিবাবু বলেন, কিন্তু বেঁটে যে! মেয়ে রাজী হল?

অপর্ণা জবাব দেয়, হলোই বা বেঁটে! ওকেই ওর ভাল লেগেছে। এই তো কালের হাওয়া!*

মহিলা: আষাঢ়, ১৩৬৮।

রথ ভাবে আমি দেব

সুরেশ্বর বাবু আরাম কেদারায় বসে আজ নিমীলিত নেত্রে গড়গড়া টানছিলেন। খোশবায়ে ঘরখানা ভরে উঠেছে। গৃহিণী স্নানের তাড়া দিয়ে গিয়েছেন। আবার এলেন, হ্যাঁ গা! আজ কি স্নান-টান করবে না?

সুরেশ্বর বাবু হুকোয় সুখটান দিয়ে বলেন, যাচ্ছি গো যাচ্ছি। কাল দীননাথ বাবুর চিঠি পেয়ে মনটা বড় হাল্কা লাগছে। তুমি তো আমায় ভড়কে দিয়েছিলে, পাঁচ হাজার কেউ দেবে না। এখন? তোমার বুদ্ধি শুনে তখন দেবেন বাবুর মেয়েটি আনলেই হয়েছিল আর কি।

বিমলা দেবী মুখ ঝামটা দেন, বাজে বকো না। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত দেবেন বাবুর মেয়েকে আনলে? মেয়েটি দেখতে সুশ্রী, গান জানত ভাল, বাপও শেষ পর্যন্ত তিন হাজারে উঠেছিল। এমেয়ে দেখতে কেমন সত্য করে বল তো? গান বাজনা ভাল জানে তো? খোকার একটিই সখ যে মেয়ে গ্রাজুয়েট হবে। এ মেয়ে কী পাশ?

পাশ ধুয়ে কি জল খাবে? বলি বউমাকে তো চাকরী করতে পাঠাচ্ছ না, তবে এত পাশ-পাশ বাই কেন? বি. এ. পাশ মেয়ে হলে এত টাকা দেবে কেন? মেয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত তো ওই হেঁসেলই আগলাবে।

টাকার এত খাঁকতি কেন? তোমার অভাব কিসের?

সুরেশ্বর বাবু হেসে ওঠেন। বললেন—চমৎকার বুদ্ধি! পয়সা কখনও বেশী হয়? পয়সা তো তোমাদের কামাতে হয় না—তার মূল্য তোমরা বুঝবে কী? ছেলের বিয়ে দেব গাঁটের কড়ি খরচ করে? কেন? আমার কি কন্যাদায়? তা ছাড়া উপযুক্ত ছেলে—দেবে না কেন?

বিমলা দেবী বলেন—দেবে ভাল। এখন স্নান করতে যাও দেখি।

খেতে বসে সুরেশ্বর বাবু বলেন—কৃষ্ণনগরে এসে নৃপেনের চিঠি লেখাটা বড্ড কমে গিয়েছে, হয় তো কাজের চাপ বেশী পড়েছে!

বিমলা দেবী মাছ দিতে দিতে বলেন—কৃষ্ণনগর ওর মোটেই ভাল লাগে না। তপুর কাছে আছে, এই যা। তপু নৃপেনকে পেয়ে বেঁচে গিয়েছে। লিখেছে

নৃপেনের এখন কৃষ্ণনগরে মন বসেছে, তবে অফিসে বড্ড কাজ পড়েছে—বাড়ীতে খুবই কম থাকে।

হ্যাগা, পাঁচ হাজার টাকা তো দেবে বলছ, ফার্নিচার কিছু দেবে না ?

সুরেশ্বর বাবু মিটি মিটি হাসেন, জবাব দেন, তোমার কী মনে হয় ?

বিমলা দেবী বলেন, তুমি কি আর এমনি ছেড়েছ ?

জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে কোথায় সব রাখা হবে, কোথায় থাকবে ড্রেসিং টেবিল এই সব। বুড়োবুড়ী যেন স্নান করা খাওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে। কি এক আনন্দের আবেশে তারা মসগুল। ঘুরে ফিরে দু'জনের চোখে চোখ পড়লেই হেসে ওঠেন। আবার আরম্ভ হয় সেই বিয়ের কথা। সুরেশ্বর বাবু বলেন, আচ্ছা আর দেরী কেন ? ওরা যখন রাজী হয়েছে তখন দিন ঠিক করে ফেলা দরকার, কী বল ?

বিমলা দেবী বলেন, খোকার তো যা বি. এ পাশের পণ ! শেষ পর্যন্ত এ মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে হয় !

চাইবে না মানে ? সুরেশ্বর বাবু ঝাঁজিয়ে ওঠেন। আমার হুকুম, বিয়ে করবে। তুমিই ছেলের মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছ। বৌ আনবে বি. এ পাশ ! আমি কালই টেলিগ্রাম করছি নৃপেনকে, দেখি না এসে পারে কেমন ?

টেলিগ্রাম পেয়েই নৃপেন হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে আসে। মা বিয়ের সম্বন্ধের কথা বলতেই বলে ওঠে—এই ব্যাপার ? এজন্য ডেকেছ ? আমি ভাবলাম না জানি কী ! আমি এখন নূতন জায়গায় বদলী হয়েছি, কত কাজ কত দায়িত্ব ! এখন এসব রাখ। বিয়ে তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আজই আমাকে যেতে হবে। বলে সে দিনই আবার চলে যায় কৃষ্ণনগরে।

বাপ খুশীই হন। বললেন—দেখেছ, কেমন কাজের দায়িত্ব এসে গিয়েছে ? কাজ করছে এখন করতে দাও। তপুকে লিখে দাও ও যেন সময়মত আস্তে আস্তে বিয়ের সম্বন্ধে কথা বলে। এদিকে আমরা সব ঠিকঠাক করি।

যা ভাল বোঝ কর। তবে একেবারে ভুলে যেও না যে ও আজকালকার ছেলে। পড়াশুনার দিকে এদের যা ঝোঁক।

আরে ওসব ভয় করলে চলে ? চাপ দিয়ে রাজী করাতে হবে। সুরেশ্বর বাবুর দেরী আর সয় না। অনেক খরচ করে ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন বেশ দু'পয়সা পেয়ে-থুয়ে বৌ আনতে পারেন, তবেই না ? সুরেশ্বর বাবু বলেন, আগামী রবিবারেই মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে আসি কেমন ?

বিমলা দেবী আঁৎকে উঠে বলেন—ওগো, খোকাকে একবার জিজ্ঞেস করে নাও, আমার ভয় লাগে। শেষে যদি ছেলে হাঙ্গামা করে!

সুরেশ্বর বাবু গর্জে ওঠেন—কি! ছেলের বিয়ে দেব—তাতে তার অনুমতি নিতে হবে?

তা নেবে কেন? শেষে একটা—কেলেঙ্কারি হলে খুব ভাল হবে?

কেলেঙ্কারী করলেই হবে? তাহলে তাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব। আমার কথার উপর কথা?

বিমলা দেবীও রুখে ওঠেন—ওসব আস্ফালন রেখে দাও। ত্যাজ্যপুত্র করবে তো ছেলের বয়েই গেছে। আজকালকার ছেলে মেয়েরা আলাদা থাকতেই তো চায়। বুড়ো বয়সে তুমিই নাতি-পুতির জন্য শুকিয়ে মরবে!

রাগে গরগর করতে করতে সুরেশ্বর বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিমলা দেবী বুঝিয়ে সুঝিয়ে খোকার মত করার জন্যে তপতীকে চিঠি দেন।

চিঠি পেয়ে তপতী নৃপেনকে বলে—দেখ নীপু! তোকে একটা কথা বলব। বাবা তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন, এ…………

আঃ! তোমরা কী আরম্ভ করেছ দিদি?

লক্ষ্মী ভাইটি, মা বাবার মনে কষ্ট দিসনে…………

আমি চললাম।

আরে শোন, শোন। এই যে আমাদের দু'খানা বাড়ীর পরেই পরেশ বাবুর বাসায় তার ভাগ্নি বেড়াতে এসেছে—ঐ মেয়েটির সঙ্গেই বাবা ঠিক করেছেন।

চৌকাট পর্যন্ত গিয়েও নৃপেন আবার ফিরে এলো। তপতী ভরসা পেয়ে বলে—চলনা মেয়েটিকে আমরা দেখে আসি। মেয়েদের দেখতে হয় যে তাদের লক্ষ্মীশ্রী আছে কিনা। পটে আঁকা বিবি, ডিগ্রী, এসব নিয়ে আমাদের কী হবে?

আচ্ছা দিদি! তোমাদের কথার উপর কখনও কথা বলেছি?

তপতীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এমন এক কথায় যে ভাইকে রাজী করাতে পারবে তা ও কল্পনাই করেনি। মুখে বলে, সে তো ঠিকই, তবু বিয়ের ব্যাপার, একবার দেখা ভাল।

ওসব রাখ। তোমাদের দেখায় হবে না, আবার আমি দেখব? তার চেয়ে চল দিদি, একটা ভাল বই এসেছে। চল দু'জনে দেখে আসি।

পরের দিন নৃপেন বলে—দিদি সন্দেশটা নাও আর সিঁদুর আছে কালীমার—তুমি পর।

সে কি রে, তুই আবার কালীবাড়ী কখন গেলি। তোর তো এসব ঠাকুর দেবতার ওপর যা ভক্তি।

লজ্জিতভাবে নৃপেন জবাব দেয়—ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একটা ভোগ দিয়ে তোমার জন্য একটু প্রসাদ নিয়ে যাই।

ওমা! কি লক্ষ্মী ভাই আমার!

*   *   *   *

ফুল শয্যার দিন সব ঝামেলা মিটিয়ে তপতী এসে বাবা-মার কাছে বসে বলে যে কষ্টে ওকে বিয়েতে মত করিয়েছি সে আমি জানি। আর কেউ হলে পারতই না।

সুরেশ্বর বাবু বলেন—হুঁঃ, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। একবার জোর করে বিয়ে দিলে ফেলবে কোথায়? ওসব অনেক দেখা আছে আমার।

বিমলাদেবী বলেন—আমি জানতাম—খোকা কখনো আমাদের মনে দুঃখ দেবে না। তবু আগে বলে নেওয়া ভাল—বলেই বলতে বলেছি!

নৃপেন সে সময়েই প্রীতিকে বলছে, আমি আর একটু হলে এ বিয়ের কথা নাকচ করেই দিতাম; কিন্তু যখন শুনলাম দু'খানা বাড়ীর পরে, তখনি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। মা বলেন—ওর এখন চাকুরীতে খুব মন। কৃষ্ণনগর ছেড়ে আসতেই চায় না। মন যে কোথায় তা মা বুঝবেন কী? কেউ কিন্তু কিছু বোঝে নি।

প্রীতি বলে—ভাগ্যে স্কুল-ফাইনাল দিয়ে মামাবাড়ী গিয়েছিলাম, নয়তো মহাশয়ের বি.এ. পাশের ধনুক ভাঙ্গা পণ ভাঙত কে?

পণ ভাঙবে কেন? তুমি তো বিয়ে পাশ হয়েই গেলে? আনন্দে কৌতুকে দুজনেই হেসে ওঠে।

মহিলা: কার্তিক, ১৩৬৮।

নিরবকাশ

ওগো শুনছো! মিষ্টার দে যে এখানকার হাসপাতালের সর্জেন হয়ে এসেছেন?

তাই নাকি? খুব ভাল কথা। আমাদের একটা বেড়াবার জায়গা হ'ল। ডাক্তার দে কবে ও'দেশ থেকে ফিরলেন? মা এসেছেন? বৌ'কে তো সেই বিয়ের সময় ছাড়া দেখিনি।

কী করে দেখবে? তার পরই তো আমরা আসানসোল চলে আসি। তু'টি মেয়ে হয়েছে। মাসিমা আসেন নি।

আসতে পারি?

ওমা! এই যে এসে গেছেন। আপনাদের কথাই হচ্ছিল! বসুন, বসুন, একা কেন? মিসেস দে-কে নিয়ে এলেই তো পারতেন।

আমাদের কথা-ও তাহলে বলেন! তা হলে তো নিজেকে ভাগ্যবানই মনে হচ্ছে। কলকাতা থেকে এসে আসানসোল বড় ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। অবিশ্যি ডাক্তার দে-র আর সময় কোথায়? আজ ছুটি ছিল তাই এলাম। কন্যাও ছাড়লে না। নিয়ে এলাম।

মেয়েটিকে আদর করে বলি—কী নাম তোমার?

নমিতা।

বাঃ বেশ নাম তো। মাথা আঁচড়াও নি কেন? লজেন্স খেয়েছিলে বুঝি দুষ্টু মেয়ে? মুখ ধোও নি যে?

কে ধুয়ে দেবে? মা তো ঘুমিয়ে আছেন। বললাম, চল বেড়িয়ে আসি। জবাবে তিনি নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা চলে এলুম।

বেশ করেছেন। আপনি তো দেখছি একটুও বদলান নি। আমরা তো ভেবেই অস্থির। লণ্ডন-ফেরত এত বড় ডাক্তারের বাড়ি যেতে দারোয়ানের ধাক্কা না খাই।

ডাক্তার জিভ কাটেন—ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! জানেন তো কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। আর আমি ক'বছর ওদেশে থেকেই মানুষ হব! হা ভগবান!

বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠি। আচ্ছা রগড়ে মানুষ! নমিতাকে ডেকে বলি—নমিতা, এস চুল বেঁধে দিই।

এখন বাঁধি না তো। কলকাতায় ঠাকুমা রোজ বেঁধে দিতেন। ঠাকুমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়।

প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যে আমি উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার বাবু বললেন—কোথায় চললেন?

একটু চা করে আনি।

হ্যাঁ আসুন। আর সেই সঙ্গে আপনার চিড়ে ভাজাটা করুন। অনেক দিন খাইনি।

বেশ লোক। শুধু চিড়ে ভাজা খাবেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার চিড়ে ভাজার স্পেশালিটি আছে। এত সুন্দর আমি আর কারো হাতে খাইনি।

খেতে খেতে ডাঃ দে আবার উচ্ছলিত হয়ে ওঠেন, বলেন—বাড়ির মেয়েরা রান্না ঘরে না গেলে রান্নার শ্রী খোলে না, মেয়েদেরও শ্রী খোলে না। আমার মা কী খাওয়ানটাই খাওয়ান! মা-ই আমাকে পেটুক বানিয়েছেন।

একদিন আমি ও অমিয়া ডাক্তার দে'র বাড়ি যাই। কড়া নাড়তে ঝি বলল, মা ঘুমুচ্ছেন। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি, অসময়ে এসে পড়লাম—মহিলা ঘুমুচ্ছেন। ঝি'কে বলি, থাক একটু পরে ডেকো। এর মধ্যে দেখি মহিলা এসে গেছেন। চোখ-মুখ ঘুমের ঘোরে ফুলে গেছে। চুলগুলি রুক্ষ অবিন্যস্ত। একখানা দামী শাড়ী পরা, তাতে মাঝে মাঝে নোংরা লেগে আছে। হাই তুলতে তুলতে বলেন—আসুন, উনি অনেক দিনই বলেছেন আপনাদের ওখানে যাবার কথা। কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারলে তো যাব। আমার কাজ কাউকে বোঝানোর নয়। আমার নিজের লোকই বোঝে না—তা আপনারা।

অপ্রস্তুত হয়ে বলি—হ্যাঁ, সে তো বটেই। সংসারের দেখা-শোনা, আপনি হলেন কর্ত্রী, কর্ত্রীর কি কাজ না থেকে পারে?

মিসেস দে একগাল হেসে বলেন—বলুন, আপনারাই বলুন। কিন্তু আমাদের বাড়ির কাউকে সে কথা বোঝান দিকি? সন্ধ্যেবেলা চুল বাঁধা হয়নি দেখলে আমার শাশুড়ী মহা অসন্তুষ্ট। অথচ আপনারাই বলুন—সময় না পেলে চুল বাঁধব কখন? হ্যাঁ গা নন্দার মা, এই যে লোকজন এয়েছে, এঁদের যে জলখাবার

দিতে হবে তা তোমাদের হুঁস আছে? না তাও আমাকেই বলে দিতে হবে? আশ্চর্য! দেখছেন তো আমার লোকজন? প্রতিটি জিনিসে আমার নজর দেওয়া চাই, তা না হলেই কেলেঙ্কারী।

কি রকম যেন অস্বস্তি লাগে আমার! আমি তাড়াতাড়ি বলি—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা এখন যাই।

যাবেন কি? বসুন। আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না, কিন্তু লোকজন এলে একটু কথা বলে বাঁচি।

আরও কিছু সময় বসে মিসেস দে'র দুঃখের কাহিনী শুনতেই হয়।

আর একদিন। বৈকালিন চা-এর ব্যবস্থা করছি, হঠাৎ দের গলা—দেখুন আমরা পালিয়ে এলুম।

আমি অমিয়ার উপর চায়ের ভার দিয়ে বলি—আসুন, পালিয়েছেন যখন, তখন অপরাধ নিশ্চয় গুরুতর।

মিষ্টার দে হা হা করে হেসে ওঠেন, আপনাদের কাছে কোনটা লঘু কোনটা গুরু বোঝা মুস্কিল। নমিতা একটা কাপ ভেঙ্গেছে, মিছামিছি মেয়েটাকে গাল মন্দ করবে, তাই ওকে নিয়ে চলে এলুম। ভাবলাম এই সঙ্গে মুখ বদলানোও হবে। মিষ্টার রায়ও নিশ্চয় এখনি আসবেন?

হ্যাঁ এখুনি আসবেন। কী খাবেন বলুন?

না, আজ আর কিছু বলব না। যা অভিরুচি তাই দিন। নয় তো রায় আমাকে পেটুকই বলবে। আপনারা যে আর যান না? আমার স্ত্রী একদিন এলে পরে যদি যাবেন ভেবে থাকেন, তবে আর কোন দিনই যেতে হবে না।

লজ্জিত হয়ে বলি—না—না, তা কেন, নিশ্চয়ই যাব। আপনার হাস-পাতালের খবর কী? এখন জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালই লাগছে। আজকাল কলকাতা যা ঘিঞ্জি। সেখানে এমনি দমবন্ধ হয়ে আসে। এই রকম আরও খানিকক্ষণ গল্প করে দে বিদায় নেয়।

অমিয়াকে বলি—ডাক্তার বাবু যখন বলে গেলেন তখন আর একদিন না যাওয়া ভাল দেখায় না।

অমিয়া তক্ষুনি জবাব দেয়—চলুন না, যেতে আপত্তি কী? বড়লোক গৃহিনীর কাজের হিসাব শোনা যাবে।

তুমি ভুল করছ অমিয়া, বড়লোক গৃহিণী বলে নয়। এ এক ধরণের লোক।

আমরা যেতেই মিসেস দে বিছানা থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠলেন, বললেন—

এসেছেন, বেশ করেছেন। আমিও ভাবি যাব। তা আর সময় ক'রেই উঠতে পারিনে।

আমাদের বসিয়ে বলতে থাকেন—দেখুন, অদৃষ্টে সুখ না থাকলে কেউ কাউকে সুখ দিতে পারে? আমার বাপের বাড়ির সকলে বলে, ওমা! তোর আবার চিন্তা, তুই তো পায়ের উপর পা তুলে বসে আছিস। এদিকে দেখুন আমার অবস্থা। আজ দু দিন হল ঝি-টা আসছে না, মাথাটা কী হয়ে আছে। সকালে চাকর এসে বলে, কী রাঁধবো? তরকারীটা আপনি কুটে দেবেন? বুঝুন অবস্থা। আমার যদি কুটনো পর্যন্ত নিজের হাতে কুটে দিতে হয় তবে এই চার-চারটে লোক রেখে আমার সুখ কী?

হরে এসে জানায় নমিতার টিচার এসেছে।

মিসেস দে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—টিচার এসেছে তো আমি কী করব? নমিতাকে ডেকে দাওনা! যত সব লক্ষ্মীছাড়া!

নমিতা টিচারের কাছে পড়ে? আমি জিজ্ঞাসা করি।

হ্যাঁ, পড়ে মানে একটু বই নিয়ে বসানোর চেষ্টা করা হয়। আর বলেন কেন? এই টিচার, বাড়ির কর্তা, দুটি মেয়ে আর চারটি চাকর আমার মাথাটা গরম করে দিলে। তার উপর কত অনুযোগ! তুমি একদিনও বেরুলে না, গাড়ী কিনছি, দেখব তখন কি করে না বেরোও! বললেই কি হয়, বলুন? সময় চাই না? এর উপর গাড়ী কিনলে কী করে যে ম্যানেজ করব ভেবে পাইনে।

অমিয়ার অবস্থা কাহিল। আমি যথাসাধ্য করুণ মুখে বলি—সে তো সত্যি। দেখা শোনার ব্যবস্থাই হল আগে।

মিসেস দে আমার কথা লুফে নেন, বলুন—আপনি বলুন! খাটিয়ের মাইনে পাঁচ টাকা, আর খাটানোর মাইনে পঞ্চাশ টাকা। ঠিক নয়?

নিশ্চয়।

অথচ এই সোজা কথাটা আমাদের বাড়ির কেউ বুঝবে না! শাশুড়ী তো আমাকে চর্কি ঘোরান। খালি বলেন—মা, তুমি একটু ফিট্‌ফাট্ থাক। আচ্ছা দেখুন তো! ফিট্‌ফাট্ থাকতে কি আমারই ইচ্ছা করে না? কিন্তু আমি পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে?

এই দেখ! ওরে রামা! বলি তোদের আক্কেলটা কী? এই যে এঁরা এয়েছেন, মিষ্টি আনতে যেতে হবে যে সে জ্ঞান আছে? কী সব চাকর-বাকর

বাপু। এদিকে দেখুন সেই কলকাতা থেকে পুরানো লোক বলে এদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তা আমার পুরানো লোক নূতন লোক সবাই এক।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বলি—রোজ রোজ মিষ্টি কেন? এলেই যে খেতে হবে—এ কী কথা?

বাঃ! খাবেন না কেন? আমি আমার বাড়িতে কেউ এলে একটু জলখাবারও দিতে পারব না চাকরদের ভয়ে? ওদের বড্ড বাড় বেড়েছে। আজ একটা হেস্ত-নেস্ত না করলে চলবে না।

এর পর ওঠা মুস্কিল। বসতে হয়, জলখাবার না আসা পর্যন্ত!

কয়েক দিন পরে অমিয়া বলে—ডাক্তার বাবুর মা আসার কথা ছিল; চলুন দেখে আসি। উনি তো আর সময় পাবেন না।

আর কিছুর জন্যে যেতে চাও না তো?

অমিয়া হেসে ওঠে, তা মন্দ কী? বৈকালিন ভ্রমণ ও জলযোগ দুটোই সেরে আসা যাবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেরটা জমাই থাকবে, লাভ তো আপনারই।

মিষ্টির উপর অমিয়ার একটু দুর্বলতা আছে। এ নিয়ে সুযোগ পেলে আমরা ওকে চিমটি কাটতে ছাড়িনে। ও দেখছি এখন জবাব দিতে শিখে গেছে।

ডাক্তার দে'র বাসায় যেতেই মা বেরিয়ে এসে বলেন—ওমা! কতদিন পরে দেখা। এস, এস, আমি খোকার কাছে শুনে আজই যাব ভাবছিলাম।

আপনি এসেছেন, আমাদেরই তো আগে এসে দেখা করা উচিত!

একি আইনের কথা মা? কথা হল হৃদয়ের। তা তোমরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসনি কেন?

ওরা এখন খেলছে।

নমিতা অমিতা এসে বলে—দিদিভাই, সেই গল্পটা বলবে না?

হ্যাঁরে বলব। তোদের এই পিসীমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

হ্যাঁ—অ্যা—বলে লাফাতে লাফাতে ওরা চলে যায়। নমিতার চুল আজ পরিপাটি করে বাঁধা। অমিতার চুলে রীবন বাঁধা। সুন্দর দুটি জামা পরা। ঘর দোরের চেহারাই আলাদা। প্রতিটি জিনিস ঝাড়া মোছা ঝক্ ঝক্ করছে। মাসীমার বয়স হলেও বেশ সুন্দরী। ধব্‌ধবে একখানা শান্তিপুরী শাড়ী পরনে, চুল বাঁধা ছিমছাম মানুষটি।

মিসেস দে এসে ঘরে ঢোকেন, ও! আপনারা এসেছেন?

মাসীমার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বলেন—গা-টা ধুয়ে এসে বস।

মিসেস দে জোর দিয়ে বলে ওঠেন—যাব, যাব। আর পারিনে বাপু। সেই তিনটে বাজতে না বাজতে শীগ্‌গির ওঠ, চুল বেঁধে দেব। চুল বাঁধা হল তো গা ধুয়ে এস। গা ধোয়া কি ফুরিয়ে যাবে? রান্না ঘরে গিয়েছিলাম—ওগুলি কী করছে দেখতে। দেখি বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। বললাম—খাবার আনতে হবে না? বললে গিন্নীমা খাবার করেছেন। আপনি বুঝি দুপুরে শোননি? এতও পারেন বাপু? নিজেই যদি সব করবেন তবে ওদের রেখেছেন কেন?

মাসীমা জবাব দেন—শোব না কেন? ওরা আছে বলে কি আমার ছেলে বৌকে আমি একটু খাবার তৈরী করে খাওয়াবো না?

কী জানি বাপু, নিজের হাতে না করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়, আমি তো বুঝি না। অমিতার দেখি জামা ছাড়ানো হয়েছে, ও খাবে না?

ওর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তুমি গা ধুয়ে এলেই আমরা চা খাব।

আপনারা খান। আমি পরে খাব। বৌ-মানুষ সেজে গুজে বসে থাকলেই হবে? সংসার দেখতে হবে না?

মাসীমা যেন রাগ চাপতেই রান্না ঘরে চলে গেলেন। দু হাতে আমাদের জন্য চপ, ফুলকপির সিঙ্গাড়া নিয়ে এলেন। বললেন, দেখ তো কেমন হয়েছে?

চমৎকার। আপনি এখনো এত খাটতে পারেন? কিন্তু আপনাদেরটা কোথায়? আমি বলি।

এই যে আনছি! অনিচ্ছা সহকারে মিসেস দে বাথরুমে ঢোকেন।

মাসীমাও আমাদের সঙ্গে খেতে খেতে গল্প করেন। বধূ ফিরে আসতে বলেন, তুমি একটু গল্প কর মা, সন্ধ্যে হল, আমি আহ্নিকটা সেরে আসি।

আমরাও উঠব বলতেই মিসেস দে বলেন—সে কি কথা? আমার সঙ্গে তো কথাই হল না। শাশুড়ী চলে যেতে বলে, মা এখানে বেশী দিন থাকলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। মানুষ পারে এত কাজ করতে? কেবল এটা কর, সেটা কর। ও আমি পারব না। কী লজ্জার কথা! বলে কী জানেন? এখানে ওর সঙ্গী সাথী কেউ নেই। ও হাসপাতাল থেকে আসবার আগেই গা ধুয়ে ফেলবে। তারপর ও এলে চা খেয়ে কোন দিন হয় তো বেড়াতে গেলে। নয় তো ঘরে বসেই গল্প করবে। ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা বলুন তো? আমি ঘরের বৌ না? আমি যাব সেজে গুজে স্বামীর মন ভোলাতে?

কী জবাব দেব ভেবে পাইনে, উঠে দাঁড়াই।

ও কি। উঠলেন কেন? বসুন না আর একটু।

না। এখন যাই, রাত্রি হয়ে গেল, আমাদের আবার রান্না-বান্না আছে তো!

ওমা! রান্না আপনারা নিজেরা করেন?

বিষম চিন্তিত দেখায় মিসেস দে'কে।

হঠাৎ কী একটা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা, আপনাদের কাজ করার লোক ক'জন?

আমি জবাব দেবার আগেই অমিয়া বলে ওঠে, আমাদের শুধু একটা ঠিকে ঝি আছে।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিসেস দে বলে ওঠেন, অ! তা-ই বলুন। লোকের ঝঞ্ঝাট নেই বলেই আপনারা এত সময় পান।

আমরা আর কথা না বলে রাস্তায় পা বাড়াই। *

* মহিলা: পৌষ, ১৩৬৮।

বিড়ম্বনা

ঘুম ভাঙতেই মনীন্দ্রের মনে পড়ে আজ ছুটি। উঃ! কী করে সমস্তটা দিন কাটবে? বিরক্তিভরে একটা হাই তুলে পাশ-বালিশটাকে জড়িয়ে ঘুমের উপক্রম করতেই চার নম্বরের ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার জুড়ে দেয়। ঘুমের বারোটা বেজে গেল। দুত্তোর! বলে মনীন্দ্র উঠে বসে।

মায়া কেবল মাত্র ব্রাসে পেষ্ট নিচ্ছিল, সেভাবেই এসে বলে—ওমা, বোধনবাবুর এরই মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল? কান্না কেন মাণিক! আজ তো বাবাই আছেন।

বুক জুড়িয়ে গেল! বাবা আছেন! এখন এই ছুটির দিনে তাথৈ তাথৈ নৃত্য কর। চতুর্থ নম্বরের ছেলের নাম হল বোধন। মায়ার সখেরও বলিহারি। ছুটির দিন কোথায় মানুষ একটু আরাম করে চা খায়! মায়াকে বলে, চা করবে—চা?

মায়া ঝংকার দিয়ে ওঠে—ছুটির দিনে সাত সকালে চা কিসের?

একটা মতলব খেলে যায়। বলে—একটু শীগ্‌গির চা দাও, এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।

কোথায়? কোন্ চুলোয় শুনি? অন্য দিন তো টিকিটিও দেখবার জো নেই। আজ ছুটির দিন কত কাজ জমে আছে, সে সব কে করবে? কাজের নামে ঢের অকাজ দেখেছি। এখন এসব ছাড়ো। সরিতের জন্য ডাক্তার খানায় যেতে হবে, নবীনের সার্ট-প্যান্ট চাই, কাল ওর জন্ম দিন। মদন বায়না ধরেছে আজ ওকে মাসীর বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। আর ফিরবার সময় অমনি সন্ধের শো'র সিনেমার টিকেট নিয়ে এসো।

মনীন্দ্র চায়ের আশা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিতে দিতে বলে, সরিতের কথা ডাক্তারকে কী বলতে হবে বল তো! এরপরে আর ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না।

মায়া গালে হাত দিয়ে বলে—তার মানে? এই যে সেদিন বললে আটটার আগে ডাক্তার নীচে নামে না।

মনীন্দ্রের জবাব—আমার কি একটা কাজ? বেরিয়ে পড়ি। এক এক করে সেরে আসব।

পেছনে কলকণ্ঠের গুঞ্জন তখনো চলতেই থাকে। মনীন্দ্র বেহালার বাসে উঠে পড়ে। কণ্ডাক্টার টিকিট চাইতে খেয়াল হল, তাই তো, এ বাসে কোথায় চলেছে? যাকগে, বেহালার বাস যখন বেহালায়ই যাওয়া যাক—পঁচিশ নয়া পয়সা বাড়িয়ে দিলে কণ্ডাক্টারের দিকে। পাশের ভদ্রলোক বলে ওঠে—কোথায় চললেন? মনীন্দ্র দেখে অফিসের তারকবাবু।

বললে—এদিকে যাব। আপনি কোথায়?

আমি তো বেহালায় থাকি। চলুন আমার ওখানে।

মনীন্দ্র আপত্তি না করে তারকবাবুর বাসায় যায়। অফিস-সংক্রান্ত কথা দু'চারটে বলে তারকবাবু ভেতরে যান চা'য়ের ফরমাস করতে।

একটু পরে একটি বছর দশেকের মেয়ে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢোকে। তারকবাবুও পেছনে আসেন। মনীন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে চা নেয়। মেয়েটি তার প্রত্যাশিত আদর না পেয়ে বিস্মিত হয়। তার ছোট্ট জীবনে সে এমন মানুষ দেখেনি। সে গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে অথচ এ ভদ্রলোক তার কিছু জানতেই চাইলে না! মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে যায়।

তারকবাবু চায়ে চুমুক দেন আর কাগজের দিকে চোখ বুলোচ্ছিলেন। তিনি বলে ওঠেন—আজকের কাগজ দেখেছেন? বলে জোরে পড়তে থাকেন, একটি মহিলা ও শিশু পাঁচিল চাপা পড়ে। এক ভদ্রলোক তাদের উদ্ধার করতে গেলে আরও পাঁচিল ভেঙ্গে ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে, ভদ্রলোক তক্ষুনি মারা যায়। মহিলা ও শিশুটিকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। দেখুন কাণ্ড! পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনটাই গেল।

মনীন্দ্র যেন আরও অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

তারকবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কী ভাবছেন?

মনীন্দ্র জবাব দেয়, না—কী ভাববো! পরোপকার করব ভাবলেই কি আর করা যায়? মুহূর্তের উত্তেজনায় প্রাণ দেওয়া কিছু নয়।

তারকবাবু সোজা হয়ে বসে বলেন—বলেন কী? প্রাণ দেওয়ার চেয়ে আর বেশী কী দেওয়া যায়? মরার বাড়া তো গাল নাই!

মনীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে—মরার বাড়াও গাল আছে তারকবাবু। মুহূর্তের উত্তেজনায় একটা কাজ করে মরে গেলে তো সেখানেই সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু

ধরুন, কেউ যদি বেঁচে থেকে উপকার করতে গিয়ে উপকারও করতে পারেনা শুধু গ্লানিই ভোগ করে—সে কি আরও ভয়াবহ নয় ?

তারকবাবু বলেন—কী জানি, আপনার হেঁয়ালী ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলতে চান ?

মনীন্দ্র ম্লান হাসে। বলে—সব ঘটনাই নিয়মমাফিক হয় না। কত জায়গায় যে জট পাকানো থাকে তা কি মানুষ ধারণাও করতে পারে ?

একটা গল্প শুনবেন ?

নিশ্চই ! বলুন।

শুনুন, একটি কিশোর গাঁয়ে থেকে কলকাতা যায় পড়তে। গাঁয়ে হাইস্কুল ছিল না, আর কলকাতায় তার দিদির শ্বশুড় বাড়ি। মস্ত বড়লোক দিদি। শ্বশুর বেঁচে নেই। শাশুড়ী তার দু' ছেলে বৌ ছানাপোনা নিয়ে সংসার করেন। দিদি বড়বৌ বটে, কিন্তু তার কোন 'রা' করার উপায় নেই। ভগ্নীপতি ও তার ভাই অত্যন্ত রাশভারী। কিশোরের নাম ধরুন মাণিক। ভগ্নীপতি আর তার ভাইকে দেখে মানিকের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। বিশেষ বিশেষ সন্ধেবেলা দু' ভাই যেন কোথায় বেরিয়ে যায়, অনেক রাত্রি করে ফিরে এসে দিদিদের মারধোর করতে থাকে। মাণিক ভয়ে ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। দিদিকে কিছু বলতে সাহস হয় না। ছোটদি (ছোট জা) অবশ্যি এমনিতে অনেক গল্প করেন। কিন্তু এসব তো আর তাকে জিজ্ঞেস করা করা যায় না, শাশুড়ী কিন্তু মাণিককে একেবারেই দেখতে পারতো না। কেবলই এটা সেটা কাজের ফরমাস করতো। স্কুলের দেরী হবে বললেও রেহাই মিলতো না। সেজন্যে অনেকদিন তাকে না খেয়েই স্কুলে চলে যেতে হত। ফিরে এসেও হয় তো দেখে তার ভাত নেই। শাশুড়ীকে কিছু বলার সাহস দিদির ছিল না। ছোটদি চুপি চুপি কখনো দুটি মুড়ি বা এটুকু সেকুটু দিত। ফলে এই শত্রুপুরীতে ছোটদি'ই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। শাশুড়ী কোনও প্রকারে দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকত না। ছোটদি'র একটি ছেলে ছিল, তাকে মাণিক বড়ই ভালবাসত।

ক্রমে ছোটদি'র উপর অত্যাচারের মাত্রা খুব বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে ছোটদা যেন তার নাম নিয়েও কি বলেন আর ছোটদি'কে মারেন।

একদিন মাণিক বলে—ছোটদি, আমি এখানে থাকবনা ; আমার জন্য ওরা তোমাকে মারে।

ছোটদি চোখ মুছে বলে—দূর বোকা! এখান থেকে গেলে তোর পড়াশুনা হবে কী করে, কোনরকমে পাশটা করে চলে যা।

মাণিক প্রতিবাদ করে—তোমাকে যে ওরা কষ্ট দেয়?

না রে! ওসব আমার অভ্যেস আছে! তুই আগে পাশ করে নে, তারপর মস্ত চাকরী করে আমায় নিয়ে যাস্। পারবি নে আমায় খাওয়াতে?

ভবিষ্যতের স্বপ্নে উজ্জ্বল বালক কিছুমাত্র চিন্তা না করে জবাব দেয়—খু-উ-ব পারব। তারপর বলে—তুমি বাপের বাড়ি যাও না কেন? তোমার ভাই আছে?

ছোটদি ম্লান হাসে। না-রে, আমার কেউ নেই, ছোট বেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছি। মামা-মামীর কাছে মানুষ হয়েছি। তাঁরা বিয়ে দিয়ে দায় সেরেছেন। কখনো খোঁজ নেন না। ছোট ভাই তো আমার সামনেই রয়েছে।

এমনি করেই দিন কাটে। এ ভাবেই ক্লাস টেনএ উঠেছে মাণিক। ছোটদির ছেলেটার পাঁচ' দিন খুব জ্বর। একটা ডাক্তার পর্যন্ত দেখানো হয়নি। সে দিন রাত্রিতে ছোটদা আসতেই ছোটদি পা জড়িয়ে ধরে বলে—ওগো, খোকার বড় জ্বর, ডাক্তার আনো। কেন তোর পীরিতের লোক ডাক্তার আনতে পারে না? বলে এক লাথিতে ছোটদিকে ফেলে, ছেলেটার পা ধরে এক আছাড়, এক আছারেই ছেলে খতম। সেই মুহূর্তেই মাতালের মাতলামি ছুটে যায়, দৌড়ে পালায়। বড় ভাই মদ নিয়মিতই খেত, তবে সে মাতলামি করত কম দিনই, এখন হাতকড়া পড়ার ভয়ে সব অস্থির হয়ে ওঠে। অসুখে মৃত এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ছেলেটার সৎকার করে। ভয়ে কেউ কাঁদতে পারে না, মাণিক আর ছোটদির দিকে চাইতে পারে না।

ছোটদি বলে, মাণিক আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারিস ভাই? আমি যে এ বাড়িতে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

মাণিক বলে—তুমি চল আমার সঙ্গে।

পারবি? আমায় সত্যি নিয়ে যেতে পারবি? বলে ছোটদি উঠে দাঁড়ায়।

অপরিণামদর্শী মাণিক শোকবিহ্বলা ছোটদিকে নিয়ে মহাবিক্রমে নিজেদের বাড়ি চলে আসে। ওর মা এভাবে কাউকে না জানিয়ে চলে আসার জন্য রাগ করেন। জয়ন্তীর মনের অবস্থা বুঝে একখানা চিঠি মেয়েকে তক্ষুনি লিখে দেন এবং জয়ন্তীকে দু'দিন রেখে একটু শান্ত করে আবার শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু জয়ন্তীর শাশুড়ী জয়ন্তীকে গ্রহণ করলেন না, বলেন—এই সর্বনাশা বৌ' এর জন্য আমার সব গেল, আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। এই বৌ আবার কোন লজ্জায় ফিরে এসেছে ? একে নিয়ে আমি চৌদ্দ পুরুষকে নরকগামী করতে পারব না।

মায়ের কথা ছোটদা'ও সমর্থন করলে।

এই কয়েকটা দিনে মাণিক অনেকখানি বড় হয়ে যায়। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে যায়। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, এতদিনের পরিচিত দুনিয়া চোখের সামনে থেকে সরে যায়। ছোটদি'কে নিয়ে আসে আবার বাড়িতে। এখানেও বহু লাঞ্ছনা অপমান তার ছোটদি'র ভাগ্যে জোটে। উপায়হীন মাণিক আপ্রাণ পরিশ্রম করে একটা কারখানায় কাজ জুটিয়ে নেয়। এবার ছোটদি'কে একখানা ঘর ভাড়া করে এনে তোলে। ছোটদি বলেন—তুমি মায়ের কাছে যাও ভাই, আমি একাই থাকতে পারব। এদিকে মা ভাই-রাও ছোটদি'কে ঘর ভাড়া করে রাখার জন্য খুবই বকাবকি করে। অন্য ভাড়াটেরাও ছোটদি'কে রাখতে রাজী হয় না। তারা মাণিককে ডেকে বলে—ছিঃ, ছিঃ, ভাই-বোন পরিচয় দিয়ে ভদ্র পাড়ায় এসব কেলেঙ্কারী করতে সাহস পান কী করে ?

আবার নূতন আশ্রয়ের সন্ধান করতে হয়। এক বৃদ্ধার বাড়ীতে একখানা ঘর পায়। ক'দিন যেতেই আবার নানা কথা আরম্ভ হয়। আবার একদিন ছোটদি তাঁর শ্বশুর বাড়ি যেতে চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামী বাড়িতেই ঢুকতেই দেন না, অকথ্য গালাগাল করে তাড়িয়ে দেন।

ছোটদি বলে—আর তো সহ্য হয় না ভাই। তুমি বিয়ে কর তাহলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। মাণিকও তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই সহজেই সে রাজী হল। মাকে গিয়ে বলল—আমি বিয়ে করব।

মা যুক্ত করে ললাট স্পর্শ করেন, ঠাকুর! ঠাকুর! এতদিনে ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে। মা তাড়াহুড়ো করে ছেলের বিয়ে দেন।

বিয়ের পর মাণিক নিশ্চিন্তে ছোটদি'র কাছে যায়, বৌকে দেখিয়ে আনে। ক'দিন পরেই হল আর এক সমস্যা। বৌ কিছুতেই ছোটদির বাড়ি যেতে দিতে চায় না, আর যাওয়ার সময়ও পায় না। এদিকে একদিন না গেলে ছোটদি কেঁদে-কেটে খুন হয়।

ছোটদি বলে—মাণিক তুমি অনীতাকে এখানে নিয়ে এস। আমি তোমাদের

নিয়ে সংসার করে সাধ মিটাই। আমার সংসার করা তো শেষই হয়ে গিয়েছে। মাণিক অকূলে কূল পায়। ছোটদি নূতন উৎসহে সংসার আরম্ভ করেন। অনীতাকে পুতুলের মত সাজায়। নড়ে বসতে দেয় না, সংসার-বঞ্চিতা সন্তান-হারা সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেয় মাণিক আর অনীতার উপর। কিন্তু বিধাতা যার উপর বিমুখ তার কী সুখ হয়?

অনীতাকে শাশুড়ী ভাল ভাবেই দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। অনীতা সন্দেহ করতে আরম্ভ করল। ছোটদি'কে একটু হাসতে দেখলে বা মাণিককে ছোটদি'র সঙ্গে কথা বলতে দেখলে ও রেগে আগুন হয়ে যেত। সন্দেহ-বিষে সংসারে আগুন জ্বলে উঠল। সে উত্তাপে সব ঝলসে যেতে থাকে। অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে ওঠে যে ছোটদি একদিন কাপড়ের খুট গলায় বেঁধে তার সাধের সংসার থেকে বিদায় নেয়।

তারকবাবু বলে ওঠে—এতদিনে তবে মাণিক শাপ-মুক্ত হল?

শাপমুক্ত? কিসের শাপমুক্ত? ছোটদি'র আকস্মিক আত্মহত্যাতে মাণিক অত্যন্ত আঘাত পায়। তার কেবলই মনে হতে থাকে, যাকে সে আশ্রয় দেবে বলে ভরসা দিয়েছিল তাকে সে দিতে পারেনি। আশ্রয়ের নামে অজস্র লাঞ্ছনা গঞ্জনাই শুধু তাকে দেওয়া হল। অনীতা খুব খুশী। তাতে মাণিকের আরও কষ্ট হয়। অনীতাকে দেখলেই মনে হয়, এই ছোটদি'র হত্যাকারিণী। ফলে সে আর সহজ ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। স্ত্রীও তাকে প্রায় নজরবন্দী করে ফেলেছে।

ভালবাসা-হীন দুর্বিসহ জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে মাণিক। সমস্ত জীবন-টাই তার অভিশপ্ত। বলে অস্থির ভাবে মাথার চুল টানতে টানতে মনীন্দ্র উঠে দাঁড়ায়। চলি বলে এক ঝাট্‌কায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারকবাবু তার গতিপথের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন, মাণিকই কি মনীন্দ্র? *

* মহিলা: পৌষ, ১৩৬৯।

অমৃতের পরশ

যতীন বলে—প্রেমকে অনেকটা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যে প্রেম তা সমুদ্রের মতই গভীর, বিরাট মহান, তার তরঙ্গে সব কিছু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর প্রেমকে বিয়ের গণ্ডীতে টেনে আনলেই তা ডোবার জল হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার ভেতর কোন আলোড়ন, চাঞ্চল্য বা আবেগ থাকে না, সময় সময় পচন পর্যন্ত ধরে। তাই বলছি প্রেম জিনিসটা দূর থেকেই ভাল। কাছে গেলে সমুদ্রের মতই চুবানী খেতে হয়।

জয়ন্ত প্রতিবাদ করে—তোমার এ কথা আমি মানতে পারিনে। প্রেম সব সময়ই অবিনশ্বর। বিয়ের বাইরে যে প্রেম তা খোলা আকাশের নীচে বলে সকলে দেখতে পায়, জানতে পারে। আমরা বলি, আহা! অমুক অমুককে ভালবেসে জীবনটাই নষ্ট করে দিলে। কেউ দেয় নষ্ট করে, কেউ মহৎ কিছু করে জীবনের ব্যথা ভুলতে চায়। কেউ বা প্রেমাস্পদের আদর্শে জীবন অতিবাহিত করে ধন্য হয়।

তর্কটা মুখরোচক, তাই জমে ওঠে। আড্ডায় সকলেই যোগ দেয়।

দেবেশ বলে—জয়ন্তকে আমি সমর্থন করি। প্রেম সত্যি অবিনশ্বর। প্রেমের কখনো লয় ক্ষয় নেই। বিয়ে করে তাকে চার দেয়ালে বন্দী করলেও সেখানে সে নিজে পুড়ে পুড়ে ধূপের মতই নিঃশেষ হয়ে সুগন্ধ ছড়ায়। তবে তা তো আর দশজনের চোখে পড়ে না, তাই সে কথা তেমন কেউ জানতেও পারে না। বিয়ে করা অর্থই প্রেমাস্পদকে পাওয়া নয়। যে ক্ষেত্রে পায় সে ক্ষেত্রে নির্ধন হয়ে যায়। অর্থাৎ দু'জনের ভেতরই দুজনে লীন হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক তখন তাদের কাছে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আর যে ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদ বা প্রেমিকাকে পায় না সে ক্ষেত্রে চলতে থাকে একের জন্য অপরের তপস্যা। তপস্যা অবশ্যি মেয়েরাই করে। ছেলেরা হয়ে পড়ে উদাসীন।

নন্দ বলে—আমার মনে হয় প্রেম বলে কোন কিছু নেই। ও একটা আলেয়ার আলো, মানুষ অযথা ওর পেছনে ঘুরে মরে, আপন রঙ্গে রাঙ্গিয়ে

মহৎ করে, বিরাট করে। অথবা বলতে পার প্রেম হল ভূতের ভয়, তখন মানুষ কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কী করে আর কী যে করে না—বলা মুস্কিল। হাঁপানী রোগী দেখেছ? সে এক উৎকট ব্যাধি। রোগী মুহুর্মুহু খাবি খায়, সে কষ্ট শত্রুও দেখতে পারে না, কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে কী বলে জান? হাঁপানি নাকি কোন ব্যাধি নয়। এলার্জি থেকে এমন হয়। প্রেমও তেমনি, ওটা একটা ধোঁয়া।

জয়ন্ত বলে—ধোঁয়াই বল আর আলেয়াই বল, প্রেম যার জীবনে আসে নি সে বড় দুর্ভাগা, সে যে কত বড় জিনিস থেকে বঞ্চিত তা বলার নয়। প্রেমের স্পর্শে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।

তাই নাকি? সকলে সমস্বরে বলে ওঠে। তাহলে নিশ্চয়ই তোমার জীবনে তার স্পর্শ ঘটেছে! বল, জয়ন্ত বল, বল এ জিনিসের সন্ধান। নয় তো কেন তুমি ব্যাচিলার? তোমার ব্যার্থপ্রেমের কাহিনী শোনার জন্য আমরা সবাই উন্মুখ।

জয়ন্ত কেমন যেন উন্মনা হয়ে বলতে থাকে—এই বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার রাস্তাতেই ঘটেছিল সেই অঘটন। বিবেকানন্দ রোড্ দিয়ে হেঁটে এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি, পাশ থেকে একটি মধুর সঙ্গীত যেন বেজে উঠল, 'সিমলা ষ্ট্রিটটা কোথায় বলতে পারেন?'

যেন এক ওস্তাদ সেতারী সেতার ঝঙ্কার দিয়ে আকাশ বাতাস সুরে সুরে ছেয়ে ফেললে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কথা মনে হল। কপালকুণ্ডলা পথের সন্ধান দিয়েছিল নবকুমারকে। বিংশ শতাব্দীর কপালকুণ্ডলা পথের সন্ধান চাইছে নবকুমারের কাছে। একবার মনে হল তাকে সিমলা ষ্ট্রিট হাত ধরে নিয়ে যাই। কিন্তু সভ্য মানুষ আমরা, তা আর সম্ভব হল না। আমি ঠিকানা বলে দিয়ে একটু এগুতেই ধন্যবাদ দিয়ে দাঁড়ি টেনে দিলে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত আকাশ বাতাসের চেহারাই পাল্টে গেল। সব কিছুই যেন ছবির মত মনে হতে থাকে। যে ভাইটার দুষ্টামীতে অস্থির হয়ে তাকে মারধোর করতাম, সেদিন তার দুষ্টামীও মধুর বলে মনে হল। এক পিসীমা ছিলেন বড় খিটখিটে, সে দিন যেচে তার সঙ্গেও খানিকটা গল্প করতে ভাল লাগলো। সবকিছু বড় মধুর, বড় সুন্দর মনে হল। আপশোষ হতে লাগল বাসাটা কেন দেখে এলাম না।

পরের দিন ভোরে উঠেই ছুটলাম সিমলা ষ্ট্রিট। সিমলা ষ্ট্রিটে গেলেই বা

একে পাব কোথায় ? তবু মন মানে না, সকাল বিকাল ঘুরে বেড়াই এই রাস্তায় রাস্তায়। কেমন যেন নেশা চেপে যায়। একে আমায় পেতেই হবে। মেডিক্যাল কলেজ থার্ড ইয়ারের ছাত্র আমি, পড়াশুনা মোটেই ভাল লাগতো না। নেহাৎ বাবার পীড়াপীড়িতে নামকোয়াস্তে পড়ছিলাম। এখন সব মাথায় উঠল। কোথায় পাই সিমলা স্ট্রিটের অধিবাসিনীকে। সিমলা স্ট্রিট হয়ে উঠল আমার তীর্থস্থান।

এমনি করে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। মন মেজাজ তিরিক্ষি। কেউ কাছে ঘেসতে ভয় পায়। যে দুষ্টু বন্ধুদের সঙ্গে মিশে জাহান্নামে যাচ্ছিলাম, তাদের সংসর্গ এখন বিষের মত লাগে। এক বন্ধু বললে, দার্জিলিং যাবে ?

কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাব ? আমায় যে খুঁজতে হবে। আবার ভাবলাম দেবতাত্মা হিমালয় হয়ত আমার মনে শান্তি দিতে পারবে। আমি রাজি হলাম।

সেখানে গিয়ে ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তায় শুনলাম সেই কণ্ঠস্বর। ভয় হবার নয়। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াই। দেখি এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে-ই এগিয়ে আসছে। আমি হাত তুলে নমস্কার করতেই সে থমকে দাঁড়ায়। প্রতি নমস্কার না করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—হয় তো মনে করতে চেষ্টা করে কোথায় দেখেছে আমাকে।

আমি তার সে ভাবটা বুঝতে পেরে নিজে থেকেই আলাপ জমাতে চেষ্টা করলাম। চিনতে পারছেন না আমাকে, সেই সিমলা স্ট্রিটের খবর জানতে চেয়ে ছিলেন বিবেকানন্দ রোডের কাছে।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

মীনাক্ষী ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। কলকাতায় এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ইনি হলেন শ্রী—

জয়ন্ত রায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মিঃ রায়।

যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল।

ওর বাবা মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আজ বিকালে এসে আমাদের ওখানে চা খেয়ো, কেমন ?

চায়ের আসরে পেলাম পরিচয়। ওরা দার্জিলিং-এ থাকে। ছুটিতে কলকাতায় দিদির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। এখন ডিগ্রী কোর্সে পড়ছে।

ওর বাবাকে বেশ সজ্জন বলেই মনে হল। আমায় আবার নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তো পা বাড়িয়েই ছিলাম। ক'টা দিন অফুরন্ত আনন্দের ভেতর কেটে গেল। ফেরার দিন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। মীনার সঙ্গে অলিখিত চুক্তি করে চলে আসি কলকাতায়।

কলকাতা এসে আমি নূতন মানুষ হয়ে গেলাম। বাজে সংসর্গ একেবারে ছেড়ে দিলাম। কলেজে বছর বছর ফেল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন প্রফেসাররা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমি হলাম ফার্ষ্ট বয়। রাত দিন কেবল মনে হত মীনাকে কি করে সুখী করব, কি করে মীনার যোগ্য হব। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মীনাকে মামুলী দু'একখানা চিঠি লিখতাম। লোকের কাছে তা মামুলী হলেও আমার কাছে রূপে রসে ভরা, তার প্রতিটি শব্দ অর্থবহ, আনন্দদায়ক।

পরীক্ষা দিয়ে গেলাম দার্জিলিং। পরীক্ষা খুবই ভাল হয়েছিল, তাই মনে প্রচুর আনন্দ ছিল। ভুবনবাবুর ইচ্ছে যে আমি লণ্ডনে যাই। মীনারও তাই ইচ্ছে। আমি বলি, তবে তুমিও চল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ভুবনবাবু আমার শিক্ষা শেষ না হতে বিয়ে দিয়ে কেরিয়ারটা নষ্ট করতে চান না। তাঁর ইচ্ছা যে আমি লণ্ডন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে ওকে বিয়ে করি। যদিও তার দেরী আছে, তবু আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত রাজী হই। মীনাকে যে আমি সত্যি পেতে পারি—এ সৌভাগ্য আমার আশাতীত। বড় তো আমাকে হতেই হবে, নয় তো মীনাকে পাব কী করে ?

পরীক্ষার রেজাল্ট্ বেরুলে দেখা গেল, আমি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। ভাল রেজাল্ট করব ধরে নিয়েছিলাম, তবু এতটা আশা করিনি। বাবা মা এত খুশী হয়েছেন যে এখন আমি যা বলব তারা তাই করবেন। আমাকে নিয়ে তাঁরা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। কী করে যে আমার এমন পরিবর্তন হল তার হদিস কিন্তু ওঁরা তখনো পান নি।

এবার লণ্ডন যাবার আগ্রহ আরো চাড়া দিলে। ষ্টেট্স্ স্কলারসিপ পেতে অসুবিধা হল না। মীনার বাবা মীনাকে নিয়ে বোম্বে এলেন আমায় সী-অফ্ করতে। আমি ভেঙ্গে পড়িনি। মীনাকে একটু আড়ালে বলি, দুটো বছর ধৈর্য ধরে থাক। আমি পাশ করে আসছি।

মীনা উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয়, দুটো বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আমি ওর হাতখানা তুলে নিয়ে একটু চাপ দিয়েই জাহাজে উঠি। ওখানেও গিয়ে পড়াশুনায় খুব ব্যস্ত থাকি। ওরই মধ্যে মীনাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখি। মীনাও লিখতো। শেষের দিকে আর মীনার চিঠি পাইনে। বড় অস্বস্তি ভোগ করি। থাকতে না পেরে ভুবনবাবুর কাছে মীনার কথা জানতে চাই। ভুবন বাবু জবাব দেন, মীনা এম. এস-সি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাই তিনি সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে। পড়ছে বলে দু'লাইন লিখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? প্রচণ্ড অভিমানে আমি চিঠি দেবনা ভেবেও না দিয়ে পারি না। তবু মীনা নিরুত্তর।

আমি আরো খেটে তাড়াতাড়ি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই। দু'বছরের কোর্স দেড় বছরে শেষ করি। দেশটা দেখার জন্যও সময় নষ্ট করিনা—ভাবি, মীনাকে নিয়ে গিয়ে দেখব।

ভুবনবাবুকে ফেরার তারিখ জানিয়ে 'তার' করে নিশ্চিন্ত হই। বোম্বে এসে মীনাকে না দেখে ভড়কে যাই। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আমাকে রিসিভ করতে মীনা আসবেই। কিন্তু এলনা।

এ পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চোখ বুঁজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে।

নন্দ বলে, আসবে কোথা থেকে? আর একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এই তো? তা তুমি যখন বলেছিলে চিঠি লেখে না, আমি তখুনি বুঝেছি।

জয়ন্ত ম্লান হাসে। বলে, বন্ধু, কিছুই বোঝনি। বোঝা এত সহজ নয়। না জেনে এমনি করে কারো সম্বন্ধে রিমার্ক পাস করো না। সে ছিল না, আসবে কোথা থেকে?

ছিল না মানে! সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত বলে, অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়েই তাকে যেতে হয়েছে পরলোকে। মাত্র দু'দিনের জ্বরে সে মারা যায়। বিদেশে এই মর্মান্তিক খবর ভুবনবাবু আমাকে জানান নি।

যতীন বলে—তখন তুমি কী করলে?

কী আর করব? কিছুদিন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম। মোটেই বেরুতাম না। তারপর মনে হ'ল যে যম আমার মীনাকে ছিনিয়ে নিয়েছে—তার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। তাই চিকিৎসা করে বেড়াই। একটি রুগী আমার কাছে একটি

চ্যালেঞ্জ। তাকে সারিয়ে না তোলা পর্যন্ত আমার রাত দিন জ্ঞান থাকে না। বিশেষ বড়লোক না হলে পয়সা নিই না। ওতেই বাবা মাকে কিছু সহায্য করতে পারি। ওঁরা বিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। পরশমণির স্পর্শ যে পেয়েছে, তার জীবনে কি আর কিছুর প্রয়োজন আছে? ছিলাম একটা বখাটে ছেলে। তিনি আমায় মানুষ করে বিদায় নিয়েছেন। জয়ন্ত অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে,

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট,
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।"

কারো মুখ দিয়ে আর 'রা' বেরোয় না। সমস্ত আড্ডাটা থম থম করতে থাকে। *

* মহিলা: কার্ত্তিক, ১৩৭০।

চোরা বালি

স্বপন আলগোছে তপতীর হাতখানা কণ্ঠদেশ থেকে নামিয়ে বুকের উপর তুলে নেয়। গর্বিতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তপতীকে। ধব্‌ধবে হাতখানায় দশগাছা চুড়ী, চুড়, বালা ঝক্‌ঝক্‌ করছে। নির্ভাজ গলায় চিক, নেকলেস, কানে মুক্তোর ফুল, কি অপরূপই না দেখাচ্ছে! গায়ে টিক্কল নাইলনের পাতলা ব্লাউজ ভেদ করে টাইট্‌ব্রেষ্টএর সূক্ষ্ম লেস্‌ দেখা যাচ্ছে। ওরই সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে ওয়াশ-এণ্ড-ওয়ার। ঠিক যেন নববধূটি। ইন্দ্রাণীই বটে! চিকটা পরতে ইন্দু আপত্তি করেছিল, বলেছিল—লক্ষ্মীটি পাগলামি করো না, আজও কি চিক পরায় বয়স আমার আছে? পনের বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো আমায় নববধূ সাজিয়ে রাখবে?

স্বপন জবাব দিয়েছিল, নিশ্চয়ই। তুমিই যে আমার অনন্তযৌবনা উর্বশী। তোমাকে কোন দিনই আমি বুড়িয়ে যেতে দেব না। পনের বছর সময়ই চলে গেছে, কিন্তু তোমার দেহে এতটুকু ছাপ তার পড়তে দিই নি, তাইতো তোমায় লাল ওয়াশ-এণ্ড-ওয়ারে চিকে এমন মানায়। কে বলবে তুমি নববধূ নও। নববধূর মতই এক-গা গয়না ঝক্‌ঝক্‌ করছে! ঠোঁটে লিপস্টিক্‌, কপালে কুম্‌কুম, সিঁথিতে দীর্ঘ বিস্তৃত সিঁদুর, পায়ে অলক্তক। তপতী চোখ মেলে তাকিয়ে বলে—ক'টা বাজলো? ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে আসার সময় হল যে!

স্বপনের মুখে কালো মেঘ ছায়া ফেলে, বলে—ছেলেমেয়েদের আসার সময় হয়েছে তো কী হয়েছে? ওদের দেখার জন্য কি আমি লোক রাখিনি?

কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলছি নাকি? তুমি চটছো কেন? যত লোকই থাক ওরা এতক্ষণ পরে আসছে আমার তো দেখতে ইচ্ছে হয়!

পরে দেখো। বলে স্বপন তপতীকে আরও কাছে টেনে নেয়। বলে—দেখ ইন্দ্রাণী, আজ তোমাকে এমন অপরূপ দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে তোমার বয়স দশ বছর কমে গেছে।

তপতী হাসে, বলে—ওগো আমার বয়স এ ভাবে বিয়োগ করো না, তুমি

প্রতিদিন যে হারে বয়স কমাচ্ছ তাতে যে শূন্যের কোঠায় পৌঁছুতে আমার আর বাকী নেই। আজ আমায় অপরূপ দেখাচ্ছে? আচ্ছা কবে আমায় অপূর্ব দেখায় নি বল তো?

স্বপন খুশী হয়। তপতীর একখানা হাত তুলে নিয়ে বলে—সত্যি ইন্দু, তুমি সুন্দরী ছিলে ঠিকই; তোমার সে রূপ কতগুণ বাড়িয়েছি বল তো প্রসাধনের জারক রসে আর গহনা পরাতে! তোমাকে শুধু ইন্দ্রাণী নামই দিই নি, সত্যি ইন্দ্রাণী করেছি কিনা বল?

প্রতিদিন ক'বার শুনলে তোমার তৃপ্তি হবে বল তো? বলে তপতী আবার ওঠার চেষ্টা করে।

স্বপন এবারে চটে ওঠে। তুমি কেবল পালাই পালাই কর কেন বল তো? তুমি কি একাই উঠবে?

এমনি করেই স্বপন ইন্দ্রাণীকে ঘিরে থাকে।

স্বপন বাসার দিকেই আসছিল—আরে তুমি এখানে? বলে কে যেন স্বপনের কাঁধে হাত রাখে।

স্বপন পিছন ফিরে বলে—মজা মন্দ নয়, আমি এখানে থাকবো না তো কোথায় থাকবো? আমি আছি দীর্ঘদিন। বরং তোমাকে আমি এ প্রশ্ন করতে পারি।

অনিল বলে আমি ভাই আজ ক'দিন হল বদলী হয়ে এখানে এসেছি। নূতন জায়গা, এখনো কারো সঙ্গে ভাব হয়নি, মন পালাই পালাই করে। তুমি এখানে কী কাজ করো?

আমি? আমি তো আর তোমার মতো বিদ্বান্ নই, তাই বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী করছি।

খুউব ভাল। আজকাল চাকরী করে সংসার চালানই এক মস্ত সমস্যা। আমরা ছাঁট্‌তে ছাঁট্‌তে বাবা মাকে সংসার থেকে ছেঁটে ফেলতে পারলে বাঁচি, তবু আমাদের খরচ সঙ্কুলান হয় না।

স্বপনের মুখে ফুটে ওঠে অহং। সে জবাব দেয়—কী জানি ভাই তোমরা স্কুল কলেজের ফার্ষ্ট বয় ছিলে, তোমাদের কথা কোনদিনই আমরা ভাল বুঝিনে। তবে আমার মনে হয় বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরের কাছে সবই সহজলভ্য।

অনিল বলে—দিনকাল অনুযায়ী মটো বদলে গেছে। বসুন্ধরা আজ আর বীরভোগ্যা নয়, চোরভোগ্যা।

স্বপন বলে—চল বাসায় বসে গল্প হবে।

অনিল বলে—তাতো যেতেই হবে। বিদেশে পুরনো বন্ধু যখন পেয়েছি। চল বৌদিকে দেখে আসি।

বাসায় এসে অনিল তপতীকে দেখে মুগ্ধ হয়! বলেই ফেলে, বাঃ তোমাদের চেহারা তো খুব ভাল আছে। তোমাকে দেখেই আমি অবাক হয়েছিলাম, এখন দেখছি বৌদিও তেমনি আছেন বা আরো সুন্দর হয়েছেন।

স্বপন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে। মুখে কিছু বলে না, ঘুরে ঘুরে বাড়ি ঘর ঐশ্বর্য দেখায়। অনিলের আনন্দ ধরে না, বলে কন্‌গ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। সত্যি তুমি খুব ভাল আছ।

প্রচুর জলযোগ সেরে যাবার সময় বলে—আমার বাড়ি কবে যাচ্ছ তোমরা?

স্বপন বলে—যাব একদিন। তোমার গৃহিণীকে নিয়ে এস না একদিন।

কিছুদিনের মধ্যেই দু পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে। স্বপনের এতটা ভাল লাগে না। প্রথম সে যেটুকু আদর অপ্যায়ন ক'রেছে ওদের, তা নেহাৎ তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে তাক্ লাগাবার জন্য, ইন্দ্রাণীর শাড়ী গহনার পরিমাণ দেখাবার জন্য। কিন্তু এখন অনিলকে সে ঘৃণাই করে। স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্রের আজ এ কী হাল! কোন এক কোম্পানীর সামান্য কেরাণী। আর বউটার কী শ্রী, কী ছাঁদ। একে তো শ্যামলা মেয়ে, তার না আছে আইব্রো পেন্সিল, না আছে লিপষ্টিক। গহনা বলতে তো ক'গাছা মান্ধাতার আমলের ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ী আর গলায় সেঞ্চুরীর পুরনো বিছে হার, এদের সঙ্গে যে ইন্দ্রাণীর মত মেয়ে কী করে কথা বলে তা বোঝা মুস্কিল। ইন্দ্রাণীর মত সুখী মেয়ে কেন যে এদের এত আস্কারা দেয়!

যত সব স্কাউণ্ড্রেল! বিয়ে করার সখ আছে, ওদিকে স্ত্রীর মন জয় করার ক্ষমতা নেই। স্ত্রীলোক বশীভূত করার মন্ত্রই হল অর্থ, শাড়ী আর গহনা। আমাদের দেখে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বলে, তোমরা কী সুখী! আরে সুখ কি আর এমনি আসে? ইন্দ্রাণীকে আমি একটি কুটো পর্যন্ত নাড়্‌তে দিই না। সে আমার স্ত্রী, ঘরের শোভা, তাকে কি আমি দাসী বাঁদী এনেছি? অনিলটা একেবারেই অপদার্থ, বিয়ে করার অনুপযুক্ত। বউটাকে খাটিয়ে খাটিয়েই মেরে ফেলবে একদিন।

এ সব ভাবতে ভাবতে স্বপন বাড়ী ঢোকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শোনে

ইন্দ্রাণী কাকে ব'লছে—সত্যি ভাই তোমাদের দেখলে আমি যেমন আনন্দ পাই, তেমনই তোমাদের ঈর্ষাও করি।

অনিলের বৌ নন্দার কৌতুকোজ্জ্বল হাসি শুনতে পায়।

আমাদের দেখে আপনার ঈর্ষা হয়, তা আমরা আপনার ঈর্ষার উপযুক্তই বটে।

হেসো না নন্দা, তোমরা সত্যি সুখী। অনিলবাবু একটি আদর্শ মানুষ। এত কাজ কর্ম ক'রেও তুমি কেমন স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াও। আর আমাকে দেখ, এক পাগলের পুতুল হ'য়ে আছি। সর্বদাই কৃত্রিমতা। এই কি জীবন?

এই তবে ইন্দ্রাণীর মনের কথা! আর তা নিজের কানে শুনতে হ'ল স্বপনকে! স্বপন দু-হাতে কান চেপে ধরে। তার পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যায়।*

শারদীয়া মহিলা: আশ্বিন, ১৩৭১।

কলির একলব্য

দ্রোণাচার্য শিষ্যসহ মৃগয়ায় মেতে ওঠেন। সঙ্গে এক কুকুর। হঠাৎ অর্জুন দেখে কুকুর আর ডাকছে না। তার মুখে সাতটি শর বেঁধা। কুমারেরা বিস্মিত হয়। অর্জুন অভিমান ভরে দ্রোণাচার্যকে বলে, গুরুদেব! আপনি আমায় কত রকম বিদ্যাই শিখিয়েছেন, কিন্তু এমন অপূর্ব বিদ্যার সন্ধান তো আমায় জানান নি! কুকুরের কোন ক্ষতি হয় নি, শুধু রা' বন্ধ হয়েছে। কী অপূর্ব অস্ত্র শিক্ষা!

দ্রোণাচার্য নিজেও কিছু কম বিস্মিত হন নি। শিষ্যদের বলেন—চল দেখে আসি ব্যাপারটা।

ঘুরতে ঘুরতে দেখেন, গভীর জঙ্গলে মাটির দ্রোণ মূর্তির সম্মুখে এক ব্রহ্মচারী কৃতাঞ্জলী পুটে বসে আছেন। দ্রোণাচার্যের প্রশ্নোত্তরে একলব্য বলে, আপনি আমার গুরু। একদিন আমি আপনার নিকট গিয়েছিলাম অস্ত্র শিক্ষা করতে। নীচ জাত বলে আপনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি মনে প্রাণে আপনাকেই গুরু বলে বরণ করি; আপনার এই মূর্তি তৈরি করে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছি। আজ আমার সৌভাগ্য গুরুদেবকে আমি প্রত্যক্ষ করছি।

তাহলে আমিই তোমার গুরু? বেশ! বেশ! তাহলে আমায় গুরু দক্ষিণা দাও।

এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! আমার গুরুদেব আজ দক্ষিণা গ্রহণ করবেন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। বলুন দেব, আপনাকে আমি কী দিতে পারি।

দ্রোণাচার্য বলেন—তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আমায় দক্ষিণা দাও।

একলব্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তার মুখ কঠিন হয়ে যায়। বলে, গুরুদেব, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ছাড়া আমি আর কী আপনাকে দিতে পারি তাই বলুন।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দ্রোণাচার্য। কী আমি গুরু, আমি যা চাইব তা দেবে না? গুরুবাক্য অমান্য!

একলব্য বিনীত ভাবে জবাব দেয়। আপনি আমার গুরু! আমার দেবতা! আমার উপাস্য! তাই আপনাকে আমি কোন মতেই ছোট ভাবতে পারবো না।

ফিরে আসি, তখনো আপনার তেজোদীপ্ত বীর মূর্তি আমি ভুলতে পারি নি। তাই বহু সাধনায় আপনার মৃণ্ময় মূর্তি তৈরি করে তাকেই গুরুপদে বরণ করে আমি অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেছি। আপনি বিরাট, আপনি মহান! আজ আপনার এই নীচ মনোবৃত্তি আমায় অত্যন্ত আঘাত করছে। আমার অঙ্গুষ্ঠটি আপনার কোন কাজে আসবে না, অথচ আমার সর্বনাশ হবে। আমার সমস্ত জীবনের সাধনা নষ্ট হবে। লোকে আপনার অপযশ করবে। তাই বলছি দেব, আপনি অন্য কিছু গ্রহণ করুন।

এত স্পর্ধা তোমার! আমি গুরু হয়ে যা দক্ষিণা চাই তা দেবে না? আমায় এসেছো সদুপদেশ দিতে? গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে? দ্রোণাচার্য ক্রোধে পায়চারী করতে থাকেন।

আপনি ভুলে যাচ্ছন এটা কলিযুগ। দ্বাপরে একবার আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে বড্ড ভুল করেছিলাম। তাতে আপনার শঠকারিতায় সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমার তো অস্তিত্বই নষ্ট করে দিয়েছিলেন। বিশাল মহাভারতের এক কোণে এমন অবহেলিত আমার উপাখ্যান দু' লাইনে শেষ করা হয়েছে, যেন এটা একটা ঘটনাই নয়। ঐ বিশাল মহাভারতে দশটা পৃষ্ঠাও আমার জন্য খরচ করতে ব্যাসদেব প্রয়োজন বোধ করেন নি।

দ্রোণাচার্য আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। চিৎকার করে ওঠেন—তবে রে নীচ জাতীয় ব্যাধ! এই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

থাম ঠাকুর থাম। তুমি বামুন হলেও কলির বামুন। আর আমি ব্যাধ হলেও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি। কাজেই তুচ্ছ নই। তুমি তোমার বামুনগিরি ফলাতে এলে আমিও চুপ করে থাকবো না। তবে তোমাকে আমি গুরুপদে বরণ করেছি তাই অশ্রদ্ধার কিছু করবো না, এই আমার মিনতি।

দ্রোণাচার্য চিৎকার করে ওঠেন—ওরে ভণ্ড! আর তোর বক্তৃতা দিতে হবে না। এই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—যে বিদ্যার অহংকারে

অর্জুন বলে—গুরুদেব! কী হল, কী হল! আর কথা বলছেন না কেন? ও গুরুদেব, কী হল আপনার?

একলব্য হেসে বলে—কিছুই হয়নি অর্জুন। তবে গুরুদেব আর জবাব দিতে পারবেন না। তাঁর কথা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হল। এ ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিল? এক্ষুনি যে আমি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হতুম।

সব শিষ্যরা সমস্বরে বললে—কী উপায় হবে? গুরুদেবের যে বাকরোধ করে দিলে! ছোট জাতের এ কী স্পর্ধা?

অর্জুন সভয়ে বলে ওঠে—গুরুদেবের তো বাকরোধ হল। এদিকে আজকাল রাজনৈতিক আকাশ যা মেঘাচ্ছন্ন, হঠাৎ যুদ্ধ-ফুদ্ধ বাধলে পরামর্শই বা দেবেন কে?

দ্রোণাচার্য লিখে জানালেন, বৎসগণ! পরমাণুর শক্তি দ্বারা আমরা একলব্যকে এর সমুচিত শাস্তি দেব।

তাই ভাল।—বলে অর্জুন গুরুর হাত ধরে রওনা হয়।

একলব্য বলে—গুরুদেব! যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তবে এ বেলা আতিথ্য গ্রহণ করুন। বলে এক বাণ ছাড়লে আর অমনি সামনে এক বিরাট সমুদ্র তৈরী হল। গগনস্পর্শী তার ঢেউ, বিরাট গর্জন।

সকলে মুখ চাওয়া-চায়ী করে, কী ভাবে এখন এই সমুদ্র পার হওয়া যায়?

অর্জুন বলে—উঃ কলিতে ছোট জাতের হাতেই সব ক্ষমতা। ধর্ম বলে কি কিছুই নেই?

একলব্য হেসে বলে—ভুল বললে ভাই, কলির ধর্ম শুধু বামুনের মুখ চেয়ে চলে না। কলির ধর্ম এক চোখো নয়।

* * *

ইস্, ঘামে নেয়ে উটেছি। সামনেই একলব্যের গুরুদক্ষিণা ছবিখানা পড়ে আছে। এখানা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েই না এই বিভ্রাট! *

* যষ্টিমধু: বিশেষ সঙ্কলন, ১৩৬৯।

সভা

মাটিতে থাকে মানুষ, আকাশে দেবতা, দুয়ে বিস্তর ফারাক। মানুষের যখন যা দরকার হয়, কামনা করে, ভক্তিভরে প্রণাম করে দেবতার উদ্দেশ্যে। বলে প্রভু! অর্থ দাও, বিদ্যা দাও, যশ দাও, মন্ত্রি করে দাও অর্থাৎ নির্বাচনে যেন জয়ী হই। দেবতা কাউকে দাক্ষিণ্য করেন, কাউকে করেন না। মানুষ ভাগ্য বলে মেনে নেয়। কখনো বা নিজেকেই অপরাধী মনে করে। চাওয়ার মত চাইতে পারিনি, ডাকার মত ডাকতে পারিনি। প্রভু দেবেন কেন?

এ হেন কেষ্টর জীব একদিন ভষ্টকে চড়ে হানা দিলে আকাশে। দেবতারা হতবাক। এক কথায় স্বর্গে চলে এল। স্বর্গে আসতে দরকার হল না তপস্যার, যাগ যজ্ঞের। কোন সাধনা নেই, কোন পুণ্য কর্ম করেনি, সচ্ছন্দে চলে এল স্বর্গে। একি অরাজকতা। এমন যে পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির তাকেও নরক দর্শন করে আসতে হয়েছিল। এরা পেল কী? ভারী জ্বালাতন তো! এভারেষ্টে উঠেছিল, মানে দীর্ঘদিন উঠছে আর গড়িয়ে পড়ছে উঠছে আর গড়িয়ে পড়ছে করতে করতে একবার কয়েক মিনিটের জন্য উঠে বিজয় করেছি বলে গর্ব করছে, তাও না হয় ক্ষমা করা গিয়েছিল। এখন আসছে সোজা আকাশে। দেবলোক আর নিরাপদ নয়। দেবতারা জরুরী সভা অহ্বান করলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল স্বর্গ বিপন্ন। আজ এসেছে রাশিয়া, কাল আসবে মার্কিন। পিপীলিকার মত দলে দলে এসে স্বর্গ ভরে ফেলবে। সিদ্ধান্ত করা হল দেবতারা মর্তে গিয়ে থাকবেন।

ইন্দ্রদেব একটু নাক সিঁটকেছিলেন, দেবলোক ছেড়ে আমরা যাব মর্তে?

ব্রহ্মা এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মর্ত অবহেলার হলো না? মর্ত আর সে মর্ত নেই এখন, সেখানে রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখন এমন আনন্দের স্থান দুর্লভ।

দেবাদিদেব বললেন, আমরা এতগুলি দেবতা গিয়ে থাকবই বা কোথায় আর করবই বা কী? আমরা তো আর সাধারণ মানুষের মত সেখানে গিয়ে সংসার করতে পারব না!

নারায়ণ স্মিত হেসে বললেন—প্রভু, আপনার কথা শুনে বড়ই বিস্মিত হলাম। সংসার ধর্ম পালন আজ মর্তে প্রায় উঠেই গেছে। সংসার বলতে যা বোঝায় আজ আর কেউ তা পালন করে না। কিছু লোক বেকার, হা অন্ন, হা অন্ন করে। আর একদল চাকুরী করে, পার্ট টাইম করে ওভার টাইম ও করে। এদের স্ত্রীরাও বেশীরভাগই চাকুরীকরে, টয়লেট কেনে, শাড়ী কেনে, ১৪ ক্যারেটের গহনা করে, পিকনিক করে। আর সংসারকরার জন্য চাকব রেখে দেয়। ওরাও সংসার করে না, মনিবকে কলা দেখিয়ে আখের গুছোয়। আপনার ওখানে খুবই ভাল লাগবে। সমস্ত দেশই আজ শ্মশান। ডাকিণী যোগিনীতে ছেয়ে আছে। একদল কারবারীদের চেষ্টায় সাজার কোন অভাব নেই। সেখানে এখন সকলেই প্রলয় নাচে মেতে উঠেছে, সেকি জাঁক, সেকি ঠাঁট!

ইন্দ্রদেবকে এখন কিছুটা উৎফুল্ল দেখায়। বলেন, আইডিয়াটা মন্দ নয়, তা গান বাজনার আনন্দের ব্যবস্থা থাকবে তো? শুনেছি মর্তের মানুষ যা বেরসিক। নীতির মানদণ্ড উঁচিয়েই আছে।

শ্রীবিষ্ণু বলেন, কোথায় বেরসিক? যুগ পাল্টে গিয়েছে। এখন বেরসিক তো নয়ই বরং অতি মাত্রায় রসস্থ হয়েই আছে। যে কোন ব্যাপার উপলক্ষ্য করেই রস উপচে ওঠে। এই যে পুজো আসছে তাতে ভোগে অর্থাৎ চাল কলায় আর ক'পয়সা খরচ? খরচ তো সব মাইক, আলোক সজ্জায় আর নাচ গানে। তবে হ্যাঁ, মা দুর্গাকে সাজাতে ওরা কার্পণ্য করে না। তিনি হয়ত হাতা-কাটা ব্লাউজ আর তারকাদের ঢঙে শাড়ী পরে খুশী হন না। ভক্তেরা খুশী হন। মর্তের মেয়েরা এমন সুন্দর করে সাজতে শিখেছে যেন প্রত্যেকেই এক একটি তারকা। স্বর্গে তো মুষ্টিমেয় মেনকা রম্ভা। মর্তে এখন প্রায় সবাই মেনকা রম্ভা। নাচিয়ে গাইয়ে।

তাছাড়া আপনারা সোজা কথাটা ভেবে দেখুন। ভক্তকে চড়ে চড়ে যদি এভাবে দলে দলে লোক এসে স্বর্গ ভরে ফেলে তবে কোথায় থাকবে আপনার স্বর্গসুখ? ওই মন্দাকিনীর ধারা যাবে শুকিয়ে। আর খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতার কথা না বলাই ভাল। স্বর্গে খাদ্যাভাব দেখা দিলেও কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না, মর্তে এক দেশে অভাব হলে আরেক দেশ বা বিদেশ থেকে সাহায্য আসবে, আর একটু বুদ্ধি করে মাথা খাটিয়ে যদি সেই খাদ্যটা গায়েব করে ফেলা যায় তবে দুদিনেই লাল হয়ে যাব।

সেখানে অনেক ক্লাস আছে। যার বুদ্ধি আছে সে দু এক বছরে লাখ টাকা কামিয়ে কেষ্ট বিষ্টু হয়ে বসে, তখন তার কথায় লোক ওঠে বসে। স্বল্পায়ু মানুষ

প্রাণভরে দিন কয়টি উপভোগ বা অতিভোগ করে নেয়। ক্ষণস্থায়ী যৌবনে এমন লীলা করে যে শ্রীকৃষ্ণ লাজ পায়।

মর্তে যার মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, সেই দেবতা হতে পারে। ধরার যা কিছু সুখ সুবিধে সবই তার হাতের মুঠোয় এসে যায়। আর এদের ক্ষমতা আমাদেরও হার মানায়।

মহাদেব বলেন, আমাদের দেবতা বলে আজকাল তো মানতেই চায়না। মানুষ নিজেরাই এমনি বলী হয়ে উঠেছে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে যা কিছু সমাধান করতে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসে। 'ভগবান দাও' বলে পূজা অর্চনার ধার ধারে না।

লক্ষ্মী দেবী সমর্থন করেন—হ্যাঁ পিতৃদেব,, অতি সত্যি কথা বলেছেন। পূর্বে প্রতি ঘরে অন্ততঃ দুখানা বাতাসা দিয়ে আমায় একগ্লাস জল দিত। তাতে বছরে আর আমার বাতাসা কেনার দরকার হত না। এখন প্রায় বাড়িই ঢু ঢু। আমার বাতাসা দু'খানাও বাজে খরচ মনে করে।

মহাদেব বলেন—আমরা বরাবর মানুষের পূজো পেয়ে এসেছি। আজ মর্তে থাকবো বলে তো আর গড্ডলিকায় মিশে যেতে পারিনে।

ব্রহ্মা বলেন—সে তো নিশ্চয়ই। আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের বিশেষত্ব থাকবেই। আমরা কেউ হব রোড কণ্ট্রোলার, কেউ ফুড কণ্ট্রোলার, সিমেণ্ট কণ্ট্রোলার, কেউ বা পত্রিকা-সম্পাদক, মিল ডাইরেক্টার। ওরা আমাদের পা ছাড়তেই চাইবে না, কত কী যে খাওয়া পড়বে! এবার দৃষ্টি-ভোগ নয়, সত্যিকারের খাওয়া। মানুষ ভারি মজা পেয়েছে। আমাদের নামে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিব্যি নিজেদের পেট ভরিয়েছে বরাবর। এবার তার শোধ তুলবো। আস্ত পাঁঠা, আস্ত মাছ আর দক্ষিণা নিয়ে।

সকলেই সম্মতিসূচক ঘাড নাড়ালেন। সভা ভঙ্গ হলো সেদিনের মত। *

প্রকৃত মহিমা

মানুষ আজ আর মানুষ নেই, প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠেছে। প্রকৃত মানুষ! তাই এদের কাজও প্রকৃত। এক একটি করে ধরুন—বিদ্যা প্রকৃতই বিদ্যা। স্নাতকোত্তর উপাধির পরেও এঁরা থামেন না, ব্যাঞ্জনবর্ণের প্রায় সবকটি অক্ষর নামের শেষে জুড়ে দিয়ে বিদ্যা শেষ করে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। কর্মজীবনও প্রকৃতই কর্মজীবন। কারণ বিদ্যার তো 'থই'নেই। সরকারী অফিসে যিনি কাজ করেন, তার ফাইলের স্তূপ জমে যায়।

পূর্বে একখানা নূতন বাড়ি তৈরী হলে পঞ্চাশ বছরেও তার কিছুই হতোনা। এখন প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার যে বাড়িটি তৈরী করেন তার দু'তিন বছর পরেই ছাদ ফেটে জল পড়ে; মেঝে দুমড়ে ওঠে, দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয়। রাস্তা মেরামত করলে দুই তিন বছরেই আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এডভাইসার, বিশেষজ্ঞরা যে সব কাজে পরামর্শ দেন, কিছুদিন পরে দেখা যায় তা ঠিক হয় নি, ভুল হয়েছে। এ ভুল অপ্রকৃত ভুল নয়। এর ফল বড় মারাত্মক। এতে একটি জাতিকে প্রকৃতই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের কথা, কোন জিনিস বেশী উৎপাদন হলে মূল্য কমে যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থনীতিতে দেখা যাচ্ছে জিনিস বেশী তৈরী হলে মূল্য বেড়ে যায়। যেমন চিনি, কাপড়, চাল, ইত্যাদির বেলায় আমরা হামেশাই দেখছি।

অধ্যাপক, শিক্ষক আজ প্রকৃতই শিক্ষা দেন। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের স্তূপে মাথা তুলতে দেন না। এতটুকু শিশু থ্রি-ফোরএর ছাত্র-ছাত্রীরা বইয়ের বোঝায় নুয়ে পড়ে। তাদের ছোট্ট মগজে গজাল মেরে বিদ্যা ঢোকানো হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং যে ছেলেটি পড়ে তাকে ইংরেজী বাংলা, অর্থনীতি পড়ানো তো হয়ই তা পঞ্চাশ নম্বর না পেলে পাশ করানো হয় না। বি. মিউজিক যে ছাত্রীটি পড়ে সে বি. এ পাশ থাকলেও আবার পরীক্ষা দিতে হয় এবং ইংরেজী বাংলা ইতিহাসে পারদর্শিনী হতে হয়। কারণ এতো ফাঁকির কাজ নয়, এ যে প্রকৃত শিক্ষা। স্কুল কলেজে কখনো অবশ্য কোর্স সম্পূর্ণ করা হয় না। হবে কেন? এ যে প্রকৃত শিক্ষা তাই অর্ধেকটা বাড়িতে সম্পূর্ণ করতে হয়। তারপর প্রকৃত

প্রশ্নপত্রের জবাব লিখতে গিয়ে অপ্রকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা অগণিত ফেল করে। তখন গ্রেস দিয়ে এক-তৃতীয় অংশ প্রকৃত মানুষ পাশ করানো হয়। বাকী অপ্রকৃত মানুষ কোথায় তলিয়ে যায় তাদের খবর আমরা রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। তবু তাদের কাছ থেকে রেহাইও পাই না। সময় সময় চুরি অপহরণ খুন এমনি অপকর্মে এদের দেখা পাই। অপ্রকৃত পেটের চাহিদা মিটাতেই এদের এই কাণ্ড। আর গ্রেস মার্কে পাশ করা প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রীরাই এক একটি রত্ন তৈরী হয়ে দেশমাতৃকাকে নানাভাবে সমৃদ্ধিশালী করছেন।

আজকাল ছেলেরা বিয়ে করে প্রকৃত গৌরবর্ণা পাত্রী। মেয়েরা বিয়ে করে প্রকৃত স্বামী। অর্থাৎ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট। তারপর দু' প্রকৃতিতে ঘর বাঁধে। সেখানে অপ্রকৃত লোকদের ঠাঁই হয় না, যেমন মা বাবা ভাই বোন ইত্যাদি। স্ত্রী প্রকৃতই স্ত্রী। সে গাইবে নাচবে চাকুরী করবে প্রকৃত কাজ তার অনেক। অপ্রকৃত কাজ করার জন্য চাকর একটি চাই। (আজকাল ঠাকুরের দরকার হয় না। এখন আমরা একনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।) চাকরের কাজ হল সংসার ধর্ম করা। প্রকৃত চাকর তা করেও।

বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে নদী-নালা-খাল-বিলের অন্ত নেই। যে কোন জায়গায় কিছুটা জল থাকলেই সেখানে মাছের ছড়াছড়ি। একখানা জাল হলে তো কথাই নেই, বঁড়শি, টেটা, পলো ওচা ইত্যাদি অতি নগণ্য উপকরণ দিয়ে অপ্রকৃত মানুষরা এমন মাছ ধরত যে লোকে খেয়ে ফুরাতে পারতো না। এখন প্রকৃত শিক্ষিত লোক আমাদের প্রকৃত মাছ খাওয়াবার জন্য বিদেশী প্রচুর যন্ত্রপাতি, জাহাজ ও বিশেষজ্ঞ এনে গভীর সমুদ্রে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করছেন (প্রকৃত করছেন কিনা কে জানে)! সামান্য একখানা জাল অভাবে প্রকৃত নেংটী পরা জেলেগুলি শুকিয়ে মরছে, এদের দিকে চেয়ে প্রকৃত কাজ তো আর পণ্ড করা যায় না!

পূর্বে অপ্রকৃতভাবে বৃক্ষ রোপণ করা হতো। সেটা যে একটা বিশেষ কাজ তা কেউ জানতোই না। কিন্তু বৃক্ষ নিজ হতেও জন্মাতো। ফলে ফুলে এসব বৃক্ষ ভরে থাকতো, ছায়া দিত কাঠ দিয়ে অপ্রকৃতভাবে কত কীই না হতো। আজ মহা সমারোহে প্রকৃত মানুষ প্রকৃত বৃক্ষ রোপণ করেন। রোপণ পর্যন্তই। তারপর তাদের আর হদিস মেলে না।

ঠাণ্ডা ঘর বসানো হয়েছে আমাদের প্রকৃতই ঠাণ্ডা বানাবার জন্য। মাছ, আলু ইত্যাদি ঠাণ্ডা ঘরের কল্যাণে মুখে দেবার উপায় তো নেই-ই, তার উপর

ফলও রেহাই পায় নি। আম, বেল, কলা, বাতাবীলেবু ইত্যাদি ফল কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে আমাদের প্রকৃতই খাবার ব্যবস্থা করেছেন।

মোটের উপর আমাদের প্রকৃত মানুষ করার কোন রকমেই ত্রুটি নাই। বাংলাদেশে বাংলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজ নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? আমরা যে প্রকৃত মানুষ! *

* ষষ্টিমধু: নিরামিষ পুজো সংখ্যা, ১৩৬৮।

মানুষ যা চায়, তা পায়

[প্রবন্ধ]

মানুষ যা চায়, সে তা পায়। আমার কথা শুনে হেসে উঠবেন না। শুনুন, আমি বলছি সত্যি পেতে পারে। আমার কথা শোনার আগে, আমার জন্যে রাঁচীর টিকিট কাটবেন না! বা লাঠি-সোটা নিয়েও এগুবেন না। হলপ করে বলছি যে আমি কোন কিছুতে দম দিয়ে এ কথা বলছি না।

আপনাদের বিদ্রূপের হাসি পরিহার করুন। ভগবানকে পেতে হলে ডাকার মত ডাকতে হয়, তেমনি চাওয়ার মত চাইলে প্রার্থিত বস্তু সত্যি পাওয়া যায়। আমার চার পাশে প্রশ্নের পাহাড় জমে উঠেছে। দাঁড়ান, আপনাদের লক্ষ-কণ্ঠ, আমার একটি, আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছি।

অনেকেই বলবেন, যা চাওয়া যায় তাই যদি পাওয়া যেত, তবে আমাদের ছেলেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিদ্যাসাগর হতো। আপনি চান, কিন্তু সে রকম কাজ করেন না। এখনি প্রতিবাদ শুনবো, সে কী! তিন জন তো মাষ্টারই রেখেছি।

মাষ্টার রেখেছেন ঠিকই, তবু ত্রুটী আছে। আপনি নিজে সে রকম ভাবে নিশ্চয় দেখেন নি। ভাল ভাবে ভেবে দেখুন কোথাও কোন ত্রুটী আছেই। চাওয়াটা অত্যন্ত একাগ্র হওয়া দরকার। তা ছাড়া কেবল আপনি চাইলে চলবে না, ছেলেরও চাওয়া দরকার।

কেউ হয় তো বলবেন, আমি তো চাই বাড়ি গাড়ী করতে—কিন্তু পারছিনে কেন?

আন্তরিক ভাবে চাইলে পাবেন বৈকি। শুধু ঠুনকো চাইলেই তো হবে না। তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। আন্তরিক বিশ্বাস চাই। চাওয়াকে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দিলে ফাঁকেই পড়বেন। কেউ হয়তো বলবেন—আমার কালো মেয়েটি আমি ফর্সা করতে চাইলেই ফর্সা হবে?

না, কালো মেয়ে ফর্সা হবে না, চেষ্টায় উনিশ-বিশ প্রভেদ হবে। তবে আর একটা ফর্সা মেয়ে হওয়া অসম্ভব নয়। কালো মেয়ে ফর্সা বা থ্যাদা মেয়ের নাক না

উঠলেও অনেক জিনিসই যে আন্তরিক ভাবে চাইলে পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাকে বোগাস বলে গাল দেবার আগে একবার ভালভাবে ভেবে দেখুন তো, সে রকম সাধনা থাকলে সত্যি তা পাওয়া যায় কিনা? এভাবেই বিজয়ের কথা প্রথম যিনি বলেছিলেন, তাকে বাতুল ভেবে সে দিন সবাই কি বাতিল করে দেয়নি? যিনি চেয়েছিলেন আকাশ পথে চলতে তখন এর চেয়ে হাসির কথা আর কী হতে পারে! দীর্ঘ দিন বহুলোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় না আজ এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। প্রতিবন্ধক তো বহু ব্যাপারে বহু প্রকারেই থাকে। আপনার ঐকান্তিক সাধনায় তা জয় করবেন—এটাই আমার কথা। মানে মনীষীদের কথা।

আপনার বাড়ির সঙ্গে একটু জমি আছে। আপনি চাইলেন ফলে ফুলে তা ভরিয়ে তোলেন। বীজ পুঁতলেন, দু'চার বালতী জল দিলেন, কিন্তু আশানুরূপ হল না। আরেক জন 'সার' দিলে, বীজ পুঁতলে, প্রচুর জলের ব্যবস্থা করলে, পোকা ইত্যাদি যাতে গাছ নষ্ট করতে না পারে সে ব্যবস্থা করলে। তার বাগানখানি যে আশানুরূপ হবে সেটা ধরে নেয়া যায়। তবু দু'এক জায়গায় বিফল যে হয় না তা নয়। লক্ষ্য করলে অনেক সময় তারও হদিস মেলে। কোন রোগী কোন প্রকারেই আরোগ্য হচ্ছে না। বহু ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও কোন সুরাহা নেই। তারপর হয়তো দেখা গেল যে সামান্য এক ডাক্তারের ওষুধে রোগী চাঙ্গা। পূর্বে যত চিকিৎসাই হোক ঠিক মত ওষুধ পড়েনি, কোথাও কিছু ভুল ছিল। তেমন চেষ্টা হয়তো অনেক করেছেন। কিন্তু হয়তো কোথাও সামান্য একটু ছিদ্র করেছে আপনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ।

অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। অপ্রিয় কথাই বলতে বসেছি। তাই সবাই যে আমার উপর কিরূপ প্রীত হচ্ছেন তা উপলব্ধি করছি। 'আমি চেষ্টা করেও পারি নি, বলার মধ্যে আত্মগোপনের একটা আবরণ থাকে। আর আমার ক্রটীর জন্যই আমি পাইনি—এ যেন নিজের হাতে নিজের উপরে ছুরি চালানো। এ কথা ভাবতে কার বা ভাল লাগে।

অপরের ক্রটীর কথা বলতে পারি। কিন্তু তার ত্রুটী শোধরানোর দায়িত্ব তো আমার নয়। আমি আমার ক্রটী সংশোধন করতে পারি যদি নিজে বুঝি। এই যাঃ! ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করেছি। নীতি কথা শোনাতে আরম্ভ করেছি যা কোনই কাজে লাগবে না। এতো কুইনিন গলাধঃকরণের মত সবই বিস্বাদ হয়ে যায়।

কী বলছিলাম ? হ্যাঁ,—মানুষ যা চায় তাই পায়। শাস্ত্রে আছে—

যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

অনেকেই সকৌতুকে প্রশ্ন করবেন—লেখিকা যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন তো ?

হ্যাঁ, এত কথা বলার পরে নিজের অভিজ্ঞতাটুকু বলতে না পারলে স্বস্তি পাবনা। জীবনে অনেক জিনিষ আশ্চর্য ভাবে পেয়েছি। হয়তো তখন পাবার আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আবার অনেক আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাইনি। সে জন্য অপরকে দায়ী মনে হয় না। মনে হয় আমারই চাওয়ার গলদ আছে। সে জন্য বেদনা বোধ আছে। আজও স্বপ্ন দেখি একদিন পাব। পেতে আমাকে হবেই। কিন্তু মজুরী দেবার ক্ষমতা নেই। কুঁড়েমী ত্যাগ বা ধৈর্যকে জয় করতে না পারলে স্বপ্নে তো কাজ হয় না।

আচ্ছা, এবার আপনারা লাঠিলাটা তুলে রেখে আপনাদের চার পাশ ভাল ভাবে দেখে নিয়ে বলুন তো এমন দু একটা ঘটনা আপনাদের জানা আছে কিনা—যা আন্তরিক চাওয়ার দ্বারাই পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে দু'এক জন হাত মিলালেও অনেকেই সমস্বরে বলবেন—কোনটা পেয়েছি ? কত জিনিসই তো চাই, কতটুকু পাই ?"

আবার বলি, শুধু চাইলে হবে না। মজুরী দিয়ে চাইতে হবে। বিশ্বাস রাখুন। পাবেন বৈ কি ! *

মহিলা : শ্রাবণ. ১৩৬৭।

একটি জিজ্ঞাসা

[প্রবন্ধ]

একদিন ছিল, মেয়ে হয়েছে শুনলে মানুষ আতকে উঠতো। তার আগমনীতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজতো না, তার ভাতে ঘটা হতো না। অনেক পরিবারে মেয়ে হয়েছে শুনলে কাঁদতে বসে যেতো। কারণ, মেয়ে মানেই বোঝা, অক্ষম পরনির্ভরশীল, চোখের সামনে ছেলে না খেতে পেয়ে মরে গেলেও তার চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছু করণীয় ছিল না। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত মেয়ে একমুঠো ভাতের বদলে সমস্ত দিন খেটেও কাকেও তৃপ্ত করতে পারেনি। এই গলগ্রহকে কেউ সইতেই পারতো না। এসব কারণে মেয়ে হলে মানুষ খুবই দুঃখিত হতো।

আজ এ অবস্থা অনেকটাই বদলেছে। আজও অনাথা দুঃখী যে নেই তা নয়; বা এখন মেয়ে হলে যে মানুষ খুশী হয় তাও নয়, তবে কাঁদতে বসে না। অনাথা দুঃখী যেমন আছে, তেমনি মন্ত্রী উপমন্ত্রী রাজ্যপাল রাষ্ট্রদূতও আছে। কত মেয়েই আজ রোজগার করে কত সংসার পালন করছে। এক একটা মেয়ে একা একটা পরিবারকে টেনে তুলছে। ছেলের চেয়ে একটুও কম করছে না। অনেকে মেয়ের উপর রীতিমত ভরসা করছে। কিন্তু মেয়েদের চাকুরীর ক্ষেত্র তবু আজও বড় সঙ্কুচিত। আজও অনেক পরিবারেই মেয়েকে অফিসে চাকুরী করতে দিতে চান না, ফলে একমাত্র স্থান স্কুল কলেজ। সেখানে যেতে যথেষ্ট পড়াশুনার দরকার। অনেক সময়ই এতটা পড়া হয়ে ওঠে না। তারপর দেশে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, সেখানে মেয়েদের কাজ পাওয়া আরো কঠিন। অনেকে আবার মেয়ে-কর্মী পছন্দ করেন না। অনেকেরই ধারণা যে মেয়েরা চাকুরী করে শুধু শাড়ী গহনা করার জন্য।

পূর্বে লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর ঘোর বিবাদ ছিল। যে পরিবারে লক্ষ্মী বাস করতেন, সে বাড়ির ছায়াও সরস্বতী বড় একটা মাড়াতে চাইতেন না। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, লক্ষ্মী সরস্বতী এখন হাত ধরাধরি করে চলেন। এখন গরীবের ঘরের চেয়ে বড়লোকের ছেলেমেয়েই পরীক্ষার ফল ভাল করে। তার কারণ এ নয় যে, গরীবের মেধা কমেছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মেধা থাকা সত্ত্বেও আজকের ব্যয়বহুল শিক্ষা গরীবদের গ্রহণ করা প্রায় সাধ্যাতীত।

ওদিকে পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা এখন বড় লোকেরাও খুবই বোঝেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন, একাধিক প্রাইভেট টিউটার রাখেন। সমাজের তথাকথিত বড় লোকদের সঙ্গেই এদের পরিচয়, যা চাকুরীর ক্ষেত্রে মস্ত বড় প্রয়োজন। তাদের গৃহিণীদের সময় প্রচুর। ঘরের কাজ করবার লোকজন থাকেই। তাই এরা দলে দলে বেরোন কাজ করতে। বসে থাকার চেয়ে বেগার খাটাও ভাল। সে হিসাবে কাজ করা ভাল নিশ্চয়ই, কিন্তু একটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যে কাজ নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতো, এরা সংসারের কোন অভাব নেই বলে সেটা সম্পূর্ণ বিলাসিতাতেই খরচ করেন। শাড়ীর উপর শাড়ী গহনা রুজ লিপষ্টিক —ঘর বোঝাই হয়ে ওঠে। চোখের সামনে বিশী উদাহরণ দেখে রিক্ত মেয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। রিক্ততা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অর্থ দিয়ে শাড়ী, গহনা, রুজ, লিপষ্টিক কেনা ছাড়া আর কি করণীয় কিছুই নেই? ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ, অপরকে রক্ষা করার, প্রতিপালন করার, দয়া ও দানের জন্যই প্রসিদ্ধ।

যে দেশে অতিথি এলে অভুক্ত গৃহস্থ আনন্দে তার আহার অতিথিকে দিনের পর দিন দান করতো, যে দেশে আশ্রিত প্রতিপালিতের সংখ্যা পরিবারের চেয়েও বেশি ছিল, যেখানে একখানা ঘরে পা উচিয়েও পাঁচ জনকে নিয়ে থাকাই ছিল ধর্ম, নিজে গামছা পরেও অপরকে বস্ত্র দান করতো, শুধু নিজের জন্য রন্ধন করাকে গীতায় নিন্দাতুল্য বলে, তাই যার কেউ নেই সে অন্তত একটি কাককেও একমুঠো ভাত দিয়ে তবে নিজে খেতো, মৃতের পিণ্ডদান করতে গিয়ে যার কেউ নেই—অজাচিত সেই লোকের প্রেতকে পিণ্ড দিয়ে তারপর নিজের মৃত আত্মীয়কে দেয়। এই কি সেই ভারতবর্ষ?

আজ আমরা অপরের দিকে চাইতে ভুলে গিয়েছি। কেবল নিজের কোলেই ঝোল টানতে চাইছি, ভুলে গেছি মনুষ্যত্ব। শুধু নিজেকে দেখা ছাড়া আর কারো দিকে চাইতে, কোন কিছু করতে আমরা ভুলে গিয়েছি। বিলাসিতাই আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে।

পূর্বে বড় লোকের গৃহিণীরা পুকুর প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন, পূজা পার্বণে দান ধ্যান করতেন। এ সব উপলক্ষ্যে বহু লোককে খাওয়াতেন, কাপড় দিতেন, বহু লোক বহু ভাবে উপকৃত হতো। আজ মানুষের অবস্থা যতই ভাল হোক, কাউকে এক মুঠো দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ নিজেদেরই কুলোয় না। অবস্থা যত ফেঁপে ওঠে খরচও ততই দেখা দেয়, তখন একখানা গাড়ীতে কুলোয়

না। গাড়ী চাই কয়েকখানা। গহনা সোনা থেকে হীরে মুক্তোয় ওঠে। ছেলেকে শিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠানো হয়। ভিখারীর ভিক্ষার থলেতে দেবার মত উদ্বৃত্ত কিছুই আর থাকে না।

তুমি না থাকলে আমিও থাকতে পারিনে। অন্যে তো ছার, মানুষ ছাড়া দেবতাও থাকতে পারেন না, পূর্ববঙ্গেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

তাই বলছিলাম যে বহু দুর্দশা কাটিয়ে আজ আমাদের যে ক্ষমতা হাতে এসেছে, আমরা কি তার অপব্যবহার করবো? আমাদের বলা হয় মহাশক্তি। আমরা কি এ শক্তি শুধু বিলাসিতায় নষ্ট করে সমাজ সংসারকে ভাসিয়ে দেব? কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার দায়িত্ব কি আমাদের নয়?

ভোগ তো আমাদের ধর্ম নয়। যাদের অর্থের তেমন দরকার নেই তারা অবৈতনিক শিক্ষা দান করে দেশের ও দশের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে নিজেরা বিমল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এদের রোজগারের অর্থে গরীবদের শাড়ী ধুতি দিলে, দরিদ্র ছেলেমেয়েকে পড়ালে, রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে যে স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা কোথায়? শুধু কি আনন্দ? সম্মান শ্রদ্ধা অমর হওয়ার মন্ত্রও এরই মধ্যে নিহিত। সৌরভে দশদিক ভরে উঠবে। মানব জীবনে এর চেয়ে বড় কামা আর কী হতে পারে?

অবশ্য এ কথাও সত্যি যে, আজ আর সেই পূর্বের অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে যুগের দাবী মানতেই হয়, তবু সবটারই একটা সীমা আছে। বিলাসিতা যে কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে তা তলিয়ে দেখতে আমরা একেবারেই নারাজ।

বিশ্ব-শান্তিতে মেয়েরা যোগ দিয়েছেন অনেকদিন। আজ ব্রিটেনে প্রস্তাব চলছে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মহিলাদের "প্রণয় ধর্মঘটে"র আবেদন করা হবে। কত আস্থা আমাদের উপর বলুন তো। আজ যে আমাদের বৃহত্তের ডাক এসেছে এর পরও কী আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বসে থাকবো? *

* মহিলা: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯।

জীবৎকালে অপ্রকাশিত রচনা

নীতীশের ভুল সংশোধন

দিদিমা! একটা গল্প বল না!

আজ বুঝি কলেজ বন্ধ?

না হলে আর তোমার কাছে আসি?

তাতো ঠিকই। এখনো তোর যাবার লোক জোটেনি। এম. এ-টা পাশ কর, তারপর আর এই বুড়ীর কাছে আসতে মন হবে না।

বুঝেছি তুমি শুধু বকবকই করবে।

আচ্ছা বলছি। হ্যাঁরে মিতালী! আজকাল কী বলে তোদের গল্প আরম্ভ করিস?

এ-তো মজা মন্দ নয়! গল্প বলবে তুমি। আর আরম্ভ করবো আমি!

তা বলছিনে। যেমন ধর, আগে আমরা বলতুম এক রাজা,এখন রাজা বলা চলবে না। রাজা নেই। তার পর এক ব্রাহ্মণ, তাও তোরা তেড়ে আসবি। ব্রাহ্মণ আবার কী? যত সব কুসংস্কার। এক গৃহস্থ, তাও লুপ্ত—এখন কী বলে আরম্ভ করি বল তো?

হয়েছে! তোমার গল্প বলে কাজ নেই, দাদামশাইকে কী করে মজালে তাই বলো।

ফোকলা মেড়েতে সলজ্জ হাসির ঝিলিক খেলে যায়, বলে, ধেৎ আমরা কি তোদের মত বেহায়া ছিলাম? দশ বছর তো তোর দাদামশাইর মুখই দেখিনি।

মিতালী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

থাক, তোকে আর হিঃ হিঃ করতে হবে না। আমি পাড়াপ্রতিবেশীর গল্প জানি তাই, তাই বলছি—

সেই শুনতেই তো তোমার কাছে আসা।

কিন্তু তা কি তোর ভাল লাগবে?

বাপকে তার মনে নেই। মাকে মনে আছে খুবই, তবে বয়স তখন নেহাত কম, কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। সেই বয়সেই কানাঘুসা শুনছিল। মায় মৃত্যুর

জন্য কাকিই দায়ী। উপার্জনক্ষম কাকা রোজগার করেই খালাস। ' সংসার চালাতেন কাকি। কাকি নাকি তার ওষুধ পথ্য কোন কিছুই ব্যবস্থা করেনি।

সংসারে এক পিসী ছিল। সে দিনের কুলীন, গুচ্ছের ছেলে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি মহাবিক্রমে থাকতো। আর বাপের বাড়ি থেকে এটা সেটা হাতিয়ে স্বামীর বাড়ি চালান দিত। স্বামী মহাশয়ও প্রায়ই এখানে থাকতেন। এখন মা মারা যাওয়ায় নীতীশ সম্পূর্ণ কাকা-কাকির হাতেই পড়লো। সেখানে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের ভিতর তার দিন কাটে। ওইটুকু শিশু বই নিয়েই বেশির ভাগ সময় বসে থাকতো। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা বা খেলাধুলা করতে তার মোটেই ভাল লাগতো না। কাকির ও পিসীর নীচতা স্বার্থপরতা দেখে সে হয়ে ওঠে নারীদ্বেষী।

এ ভাবে স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজে ঢোকে, কাকার মনটা দরদী ছিল। কিন্তু কাকির ভয়ে কিছু বলতে ভরসা পেত না।

এ সময় তার এক বন্ধু কুসংসর্গে পরে কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বন্ধুর অবস্থা দেখে নীতীশ স্ত্রীলোকের উপর আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। নারীই যে নরকের দ্বার সে বিষয়ে শাস্ত্রকারদের সঙ্গে একবাক্য একমত হয়।

তাই আই. এ পরীক্ষা দেবার পরেই কাকির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। সামান্য মাইনের একটা কাজও জুটে যায়। এ সময় সে হয়ে ওঠে পরম নীতিবাগীশ। অবসর সময়ে পড়াশুনা করে। নিজে ছেলেবেলা একদিন খেতে পায়নি তাই প্রাণভরে মানুষকে খাওয়ায়। মেসের ঘরখানাকে ভঙ্গুর জিনিস দিয়ে সাজায়। মাঝে মাঝে কাকার সঙ্গে দেখা করে। কাকাকে এটা সেটা কিনে দেয়। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে পারে না বলে অস্বস্তি লাগে।

বন্ধু মহলে নীতীশের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এমন প্রাণ ঢেলে খাওয়ানো পরের উপকার করা সচ্চরিত্র যুবক কমই দেখা যায়। মনটাও ছিল তার অসীম দরদী। কোন বন্ধুর সংসার চলে না তাকে সাহায্য করা, কোন বন্ধুর বোনের বিয়ে হয় না তাকে পাত্রস্থ করা, এসব ছিল তার নিত্যকর্ম। বন্ধুরা কখনো বিয়ের কথা তুললেই জিভ্ কাটতো। রক্ষে করো ও সবে আমি নেই।

এ হেন নীতীশের বিয়ের ফুল ফুটলো। বাংলা দেশে ঘাটের মড়া পেলেও মেয়ের বাপেরা একবার চেষ্টা করে। আর এ তো আকাশের চাঁদ। নীতীশ র নীতি অনুযায়ী ভদ্র লোককে হটিয়ে দিলেও, ওর এক বন্ধু নাছোড়বান্দা হয় লেগে গেল।

হয় তো পঞ্চশরের আঘাতেই নীতীশের মনে জেগে ওঠে পরোপকার বৃত্তি। বৃদ্ধের কথায় হঠাতই বিয়েতে রাজী হয়ে যায়।

আড়ম্বরহীন ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মেয়ের বাপ আনন্দ আর চেপে রাখতে পারেন না। মেনকার মুখখানা তুলে ধরে বলেন মা তোর শিব পূজা সার্থক। তোর পূজায় তুষ্ট হয়ে শিবই তোকে হাত পেতে নিলেন। তোর জন্য আমিও আজ সুখী।

মেনকার লজ্জারুণ মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চালচুলোহীন নীতীশ বৌকে কাকির কাছে নিয়ে তুলতে ভরসা পেল না। ওই কাকির কাছে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছাও হল না। তাই মেনকা বাপের বাড়িই রয়ে গেল; নীতীশও পূর্ববৎ মেসে থেকেই তার কাজ করতে থাকে।

স্ত্রী যে স্বামীর সম্পত্তি এটা নীতীশের জানা ছিল, তাই দু-এক দিন পরেই স্ত্রী কে নস্তিমোছা রুমাল, ময়লা গেঞ্জি কাচতে দিয়ে স্ত্রীর বাধ্যতা পরীক্ষা করে। মেনকা বাপের বাড়ি থাকলেও কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে বলবে না ঠিক করে দেয়, এবং তার অনুমতি ব্যতীত কোথাও যেতে নিষেধ করে।

মেনকা পড়ে বিষম ফাঁপড়ে। দিদি বৌদিরা কোথাও যেতে বললে না করে বা কেমন করে? ভাবে, আচ্ছা যাই ওঁকে বুঝিয়ে বলবো তখন।

নীতীশ সপ্তাহে দু-এক দিন আসে। এলেই খবর নেয় মেনকা তার আদেশ ঠিক মত পালন করেছে কিনা। এক চুল এদিক সেদিক হলে আর রক্ষা নেই। কী সর্বনাশ! স্বামীর আদেশ যে অমান্য করতে পারে, তার খুন করাই বা অসম্ভব কি? মুনি ঋষিরও ভুল এক আধবার হয়। না হয় সে বিয়েই করে ফেলেছে, তা বলে স্ত্রীকে আস্কারা দেওয়া তার মত পুরুষ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কয়েক দিনের ভেতরেই মেনকা বুঝল তার অদৃষ্টে শিবের আশুতোষ মূর্তি জোটেনি। জুটেছে রুদ্ররূপ। বড় ভয়াবহ, বড় ভীষণ। এ টাল সামলানো সহজ নয়।

নীতীশের জীবন আগের মতই নির্ঝঞ্ঝাট। বন্ধুদের নিয়ে হৈ হুল্লোর চলছে। কখনো যদি নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া শ্বশুর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করতো তা আমল দিতো না। জীবনে দুর্বলতাকে তার মত পুরুষ প্রশ্রয় দিতে পারে না। সংযমই জীবন। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ি কখনো খালি হাতে যেত না বলে পয়সার অভাবেও অনেক সময় যাওয়া হত না। সপ্তাহান্তে দু-এক দিন মেনকার ত্রুটি বিচ্যুতির খবর নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। মেনকার কিছু প্রয়োজন আছে কি-না, বা

মেনকাকে কিছু দেওয়া দরকার এ কথা কথনো মনে হতো না। মাঝে মাঝে মেনকাকে নিয়ে বেরুত বটে, কিন্তু তার মত কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ তো আর একা স্ত্রী নিয়ে বেরুতে পারে না, তাই শ্যালী শালাজদের সব সময়ই সঙ্গে নিত। সকলের অনুরোধেও শনিবার ছাড়া অন্য দিন থাকতো না। মেনকার একটু দুঃখ হলেও গর্বে বুক ফুলে উঠত স্বামী তার কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বার্থশূন্য ভোলানাথই বটে।

এমনি করে তার প্রথম সন্তানের অবির্ভাব হয়। মেনকা পীড়াপীড়ি করে বাসা করার জন্য। করব-করবো বলেই নীতীশ কাটিয়ে দেয় দীর্ঘ দিন। দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেয়। এবার মেনকা অতিষ্ঠ করে তোলে বাসা করার জন্য। নীতীশও বোঝে আর শ্বশুরের হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়েই তার রেহাই নেই। বোঝা ঘাড়ে নিতেই হবে।

মেনকা মরিয়া হয়ে বাসা করায়। অনভিজ্ঞ নীতীশ প্রয়োজনীয় কিছু আনতে বললেই বিরক্ত হয়। আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্না মেনকা চোখে অন্ধকার দেখে। ছেলেদের জন্য বহু মূল্য জামা কাপড় আনে। পঙ্গপালের মত সব বন্ধু বান্ধব আসতে থাকে। তাদের আদর আপ্যায়নের বহরে এবং অপটু হস্তে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে নীতীশ হাবুডুবু খায়। শীঘ্রই স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মেনকা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। ছেলের অসুস্থতায় আবার আসে নীতীশের কাছে। উঠতে বসতে নীতীশের সঙ্গে লাগে খিটিমিটি। সন্তুর সর্দি হলো কেন? নিশ্চয়ই তুমি ঠাণ্ডা লাগিয়েছ? নন্তুর পেট খারাপ হলো কেন? নিশ্চয়ই কিছু মুখে দিয়েছে—তুমি দেখনি।

মেনকা সঙ্কুচিত হয়ে যাই বলতে যাক তা আর নীতীশের কানে ঢোকে না।

নীতীশের অজস্র প্রশংসা চার দিকে। সংসার করছে তবু মনটা কত উদার। পাঁচজনকে সাহায্য করা ঠিকই আছে। এতটুকু পয়সার মমতা নেই। স্বামীর এই সুনামের রসদ জোগাতে মেনকাকে যে কতটা মজুরী দিতে হয় তা জানেন এক মাত্র অন্তর্যামী।

নীতীশ ক্বচিৎ কখনো আসে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমাতে। এসে হয় তো বললো, কৈ গো গৃহলক্ষ্মী!

মেনকা আহ্লাদে আটখানা হয়ে কাছে আসতেই ধমকে ওঠে—একি! নন্তুকে এখনো স্নান করাও নি?

হয়ে গেল প্রেমালাপ। কী এক অভিশাপে পঞ্চশর শুধু ধনু যোজনাই করেন, বাণ আর ছোড়েন না।

তবু দিন বসে থাকে না। একাদিক্রমে বার-তের বছর কেটে যায়। ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। নীতীশ ছেলেদেয় স্বভাব সংস্কারে লেগে গেছে। অযথা কথা বলা হৈ-হৈ করা নিষেধ। ছেলেরা হবে শান্ত, ভদ্র! কিন্তু ওদের মার জন্য কি তেমন তৈরী করা সম্ভব হবে! এই নীতীশের আতঙ্ক। বাড়িতে যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে থাকে। আস্কারা পেয়ে মেনকা বা ছেলেরা যেন বিগড়ে না যায়। যা করতে আদেশ করে তার একচুল এদিক সেদিক হলে বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়।

ছেলেরা সতৃষ্ণ নয়নে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। হাবলু, কানু ওদের বাবার মত তাদের বাবাও যদি তাদের নিয়ে হাসি গল্প করতো।

সংসারের খরচ ক্রমশঃই বেড়ে যায়। টাল সামলানো দায়। সবটুকু অপরাধ মেনকার ঘাড়ে তুলে দিয়ে নিজেকে নিরপরাধ করতে নীতীশ উঠেপড়ে লাগে। গৃহিণী গুছানো না হলে সংসারে অভাব থাকবেই। মেনকাকে বলে-বলে তো কিছু হল না।

মেনকা চুপ করেই থাকে। এর আর কী জবাব দেবে? আজকাল মেনকার ভেতরও এক অব্যক্ত যন্ত্রণা হতে থাকে যা তাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

নন্তুর পেট খারাপ হয়েছিল, বাপের নির্দেশ আরো তিন দিন বার্লি খেতে হবে। নন্তুও গোঁ-ধরে বলেছে আজ তাকে অন্ততঃ মাছের ঝোল দিয়ে বার্লি দিতে হবে। নীতীশের কথার উপর মেনকার কিছু করার সাহস নেই। এদিকে ছেলে রাগ করে পাশের ঘরে শুয়ে আছে। মেনকারও খাওয়া হয় নি, অসুস্থ ছেলেটাকে ফেলে খায় কী করে? নীতীশের একটা ছেড়া সার্ট রিপু করতে মেনকা ভাবছে কী করে এ মাসে একটা জামা করা যায়।

হঠাৎ রান্না ঘরে বিষম হৈ চৈ শুনে মেনকা দৌড়ুতে দৌড়ুতে গিয়ে দেখে নন্ত একটা থালায় ভাত নিয়ে মাছ দিয়ে খাচ্ছে; আর কী করে এ সময়ে নীতীশ অফিস থেকে এসে প্রবল চিৎকার চেচামেচি করছে। মেনকাকে দেখে বাজ পড়ার মত হুঙ্কার ছেড়ে বলে—তোমার ছেলে নিয়ে এই মুহূর্তে তুমি বেরোও। এমন শত্রু এত দিন আমি আমার বাড়িতে পুষেছি। বুড়োটা হাড় শয়তান ছিল। তাই আমাকে ভুলিয়ে এই শয়তানীকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মজা দেখেছে। বলে হিড় হিড় করে মেনকাকে আর নন্তুকে টেনে বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

মিতালী বলে—বুড়োটা কে?

তাও বুঝলিনে? বুড়োটা হল মৃত শ্বশুর। দীর্ঘ বার বছর পর তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার ভুল সংশোধন করলে।

রূপান্তর

বিমল চিঠি লিখেছে,—

সুব্রত, বাংলায় এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে যাসনে। তোর পথ চেয়ে নীহার বসে আছে। না এলে খুব দুঃখিত হবো। সাক্ষাতে সব বলবো। তোর রাগ পড়েছে তো? কবে আসছিস? ভালবাসা নিস।

তোর বিমল।

চিঠিখানা পেয়ে সুব্রত খুশী হয়। বিমলের সঙ্গে দেখা তো করবে নিশ্চয়ই। বিমলের উপর কি রাগ করে থাকা যায়। হ্যাঁ, বিমলের শেষের দিকের ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছে খুবই, কিন্তু বিমলকে সে প্রাণের চেয়েও বুঝি বেশি ভালবাসে। শুধু খুড়তুতো ভাই হিসাবে তো নয়, বিমল তার পরম বন্ধু, স্কুল কলেজ জীবনের সঙ্গী। এক সঙ্গে দু'জনে পড়েছে, খেলেছে, ব্যায়াম করেছে, কুস্তী লড়েছে। সেই বিমল কি কাণ্ডটাই না করলো।

নীহারদের বাড়িতে ওরা ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতো। ও মা, কিছু দিন পরে বিমলের পাত্তা নেই। খোঁজ, খোঁজ, দেখা যেতো বিমল হয় তো পেয়ারা পাড়ছে —নীহার খাচ্ছে। নয়তো বা ছাদের কোণে বসে গল্প করছে। সুব্রত যত বকাঝকা করুক বিমলের ভ্রুক্ষেপ নেই, খেলার চেয়ে গল্প করার ঝোঁকই বেশি। তার পর দিন দিনই হত ভাগা কুনো হয়ে পড়ে। নীহারটাকে সমস্ত পাওয়া যেত না। নীহার এমন কিছু ওস্তাদ খেলিয়ে নয়, যে ওকে পাওয়া না গেলে কারো মাথা ব্যথা হবে। শুধু লোক কম পড়লে ওকে ডাকা হতো। তা মেয়ের কি দেমাক! আসতোই না। সুব্রতরাও রাগ করে বিমলকে বাদই দিয়েছিল। ওরা ব্যায়াম করতো না, তেমন প্রাণ খুলে গল্প করতো না—সব সময়ই একটা অস্থির ভাব। কথনো কথনো আপন মনেই একটু হাসে যেন কারো সঙ্গে কথা বলছে। সুব্রতের চিন্তা হয়েছিল কী হল বিমলের?

তারপর একদিন বিমল বলে আমি নীহারকে বিয়ে করবো।

সুব্রতের এখনো মনে হলে অবাক লাগে। নীহারকে বিয়ে করার কথা যে কী করে বিমলের মাথায় ঢুকলো তা সুব্রত আজও ভেবে পায় না। যাই হোক,

জাতের বাধা ছিল না। তবে সুব্রতদের পরিবার অনেক বড়,তা ছাড়া বিমল এখন এম. এ পড়ছে। নীহার দেখতেও তেমন কিছু ভাল নয়। ম্যাট্রিক সেবার দেবার কথা। শেষ পর্যন্ত কোন বাঁধাই টেঁকেনি। সুব্রতের খুব রাগ হয়েছিল। এখন একটা বিয়ের কী ঘটা পড়লো? রাগ করে বিমলের সঙ্গে কথাও বলেনি। তাতেও বিমল ফেরেনি।

বিয়ে হলো। সুব্রত ভাবে যাক ল্যাঠা চুকলো। বিমল আর সুব্রত এক ঘরে পড়তো ও শুতো। বিমলের শোবার ঘর আলাদা হল। তারপর বিমল পড়তে বসে কেবলি ছট্ ফট্ করতো, বলতো ঘুম পেয়ে গিয়েছে রে।

সুব্রত অবাক হতো, এখনি ঘুম কি? আচ্ছা আধ ঘণ্টা ঘুমো পরে আমি ডেকে দেব। বিমল চট্ করে চলে যেত নিজের ঘরে, আর আসতো না। ফল ও পেয়েছে তেমনি হাতে হাতে। এম.এ তে সুব্রত হয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। আর বিমল থার্ড ক্লাস। সুব্রত পেয়েছে লাক্ষ্ণৌ অফিসে বিরাট পদ। আর বিমল কিছু দিন ঘোরা ফেরা করে কৃষ্ণনগরে কি একটা সামান্য মাইনেয় চাকুরী পায়। সেখানেই আছে নীহারকে নিয়ে।

মা-জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে বিমলের সঙ্গে দেখা করবি তো?

হ্যাঁ মা! নিশ্চয় করবো। বিমল চিঠি দিয়েছে যাবার জন্য।

সুব্রত তুই আর কবে বিয়ে করবি বল তো? বিমলের তো ছেলে হয়েছে। তুই এবার বিয়ে করে যা লক্ষ্মীটি।

এখন নয় মা পরে করবো।

কেন কেবল পরে পরে করিস বাপু! তোদের যে আজকাল কী এক ফ্যাসান হয়েছে! বুড়ো না হয়ে তোরা বিয়ে করতে চাস না। সবাই বলে তোকে এখন জোর করে বিয়ে দিতে। আমি তা চাইনে। তোরা বড় হয়েছিস। এখন তোদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে আমার ভাল লাগে না বাপু!

অচ্ছা করবো তুমি বেশ পড়াশুনা করা পাত্রী দেখ।

বেশ কয়েক দিনের ছুটি হাতে নিয়েই সুব্রত কৃষ্ণনগর যায়। বিমল ষ্টেসনে খোকাকে নিয়ে উপস্থিত ছিল। বাসায় পৌছে দিয়েই অফিস চলে যায়।

নীহার এসে দাঁড়ায়। কুশলাদি প্রশ্নের পর হাত মুখ ধুতে তাড়া দিয়ে নীহার খাবার নিয়ে আসে।

তুমি ষ্টেসনে যাও নি যে?

বাঃ আমি ষ্টেসনে যাব রান্না বান্না করবে কে?

তুমি রাঁধ ?

আমি রাঁধবো না তো কি তোমার দাদা রাঁধবেন ? খোকা এসে খাবারের থালায় হাত দেয়। সুব্রতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ইস্ নোংরা হাতে খাবার গুলো ধরলে !

নীহার লজ্জিত হয় না। হেসে ওঠে—খেয়ে নাও দেখি।

ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে, মোটাসোটা ফর্সা। সুব্রতের দিকে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। সুব্রত তো ছোট ছেলে নিতে পারে না তবু বিমলের ছেলেকে হাত দিয়ে একটু আদর না করে পারে না। মনে মনে একটু লজ্জিত হয় খোকনের জন্য কিছু নিয়ে আসা উচিৎ ছিল, আরও উচিৎ ছিল নীহারের জন্য কিছু আনা।

দুপুরে খেতে দিয়ে নীহার পাখা নিয়ে বসে। এটা সেটা খাবার জন্য অনুরোধ করে। সুব্রত হো হো করে হেসে ওঠে।

নীহার অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কী হলো ?

তোমার কাণ্ড দেখে হাসছি। তুমি কি রকম গিন্নীবান্নী হয়ে গেছ নীহার ! এখন আর ব্যাডমিণ্টন খেল না ?

সুব্রত নীহারকে এখনো বৌদি বলতে পারে না। কেউ কিছু বল্লে বলে ও তো আমাদের খেলার সঙ্গী নীহার, ও কে বৌদি কে বলবে ?

নীহার জবাব দেয়—এখানে কোথায় ব্যাডমিণ্টন খেলবো ? আর সময়ই বা কোথায় ?

সুব্রতকে বিছানা করে দিয়ে নীহার বলে—তুমি ঘুমোও আমি খেয়ে আসি।

বিমলের বই-এর আলমারীটা কোথায় ?

বই-এর আলমারী তো নেই। দু-এক খানা বই আছে।

সুব্রত বিস্মিত হয়। বিমলের সেই বই-এর ষ্টক আনেনি ? তা ছাড়া ও তো প্রতি মাসেই দু-চার খানা বই না কিনে ছাড়তো না। এখন কেনে না ?

মলিন মুখে নীহার জবাব দেয়—না।

আশ্চর্য ! তোমাদের সময় কাটে কী করে ?

নীহারের চোখে মুখে চাপা হাসি ঝিলিক মারে।

সুব্রতের মনে পড়ে এমনি আরেক দিন বিয়ের পরে নীহারকে সুব্রত বলেছিল—তুমি যখন তখন আমাদের ঘরে ঢোক কেন ? এতে আমাদের পড়ার

ক্ষাত হয়। তখনো এমনি একটু হেসে ছিল নীহার। অর্থাৎ তুমি বুঝবেনা—এই যেন বলতে চায় এ হাসি।

সুব্রতের মাথা গরম হয়ে ওঠে। বলে, আচ্ছা তুমি যাও।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সুব্রত।

নীহারের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কত ঘুমুবে?

তাইতো, খুব ঘুমিয়েছি।

হাত মুখ ধোও চা আনছি।

চা খেতে খেতে সুব্রত বলে—চল জায়গাটা দেখে আসি।

এখন তো আমার সময় হবে না। উনি আসুন তার পর যেও।

বিমল আসে। জামা কাপড়ও ছাড়তে পারে না। অমল ঝাপিয়ে কোলে পড়ে।

সুব্রত হা হা করে ওঠে। ইস্! জামা কাপড় গেল, খোকাকে নাও নীহার।

বিমল বলে—হ্যাঁ এখন যাবে নীহারের কাছে। বলে পরম তৃপ্তিতে খোকাকে আদর করতে থাকে, অমল বাবু তোমার দুষ্টু কাকাটার কথা শুনেছ? তোমাকে বুঝি একবারও কোলে নেয়নি।

চা খেয়ে খোকাকে কোলে নিয়েই সুব্রতের সঙ্গে গল্প করে। তারপর বলে—চ' সুব্রত একটু ঘুরে আসি।

সুব্রত দেখে ঘোরা ঠিক নয়। দোকানের সওদা করাই আসল উদ্দেশ্য।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই বিমল দুধ আনতে যায়। নিজে নিয়ে এলে দুধটা ভাল হয়। তারপর চা খেয়েই বাজার সেখান থেকে এসে টুকি টাকি এটুক সেটুকু করেই স্নানের বেলা হয়ে যায়। তারপর স্নান করে নাকে মুখে গুঁজে অফিসে দৌড়য়। এরই ভেতর দু চারবার নীহারকে তাড়া দেয়—সুব্রতকে খাবার দাও। সুব্রতকে এটা রেধে দাও, বার বার চা দাও।

তারপর চলে গত দিনের পুনরাবৃত্তি।

বিকেলে সুব্রতকে নিয়ে বেড়াতে বেরয়।

বিমল, একটা কাজ করার লোক রাখিস না কেন?

কুলোতে পারি না।

একটা লোক রাখবি। আমি কিছু পাঠাবো।

কী দরকার, চলে তো যাচ্ছে!

না, চলে যাচ্ছে না। একটা লোক রাখবি। আর কিছু কিছু বই কিনবি।

বিমল হেসে ওঠে—এই কথা? বই পড়বো কখন?

তাইতো লোক রাখতে বলছি। লোক থাকলে সময় পাবি। কী করে যে তোদের সময় কাটে?

বিমল হাসে। আচ্ছা তোর এ কথার জবাব তোলা রইল, পরে দেব। তুই বিয়ে করবি কবে?

বিয়ে করতে ভয় হয়। ও আমার কাজ নয়। আর আমাকে মেয়েই বা দেবে কে?

বিমল হো হো করে হেসে ওঠে, যাক্ পাত্রী জুটলে বিয়ে করবি তো?

করতে হবে, মা বড্ড ধরে পড়েছেন। আমার ভাল লাগে না।

তবে পাত্রী দেখতে থাক।

আমি দেখবো কিরে? ও সব আমার দ্বারা হবে না। এ কী মাছ মূলো কেনা? আমি একটু পড়াশুনাকরা মেয়ে চাই যার সঙ্গে দু-দণ্ড অন্ততঃ কথা বলা চলে।

সে আর বেশি কথা কী?

ক'দিনেই সুব্রত যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বিমল যেন কেমন হয়ে গিয়েছে! বিমলকে কেমন দূরের মনে হয়। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরতে হয় সুব্রতকে। বিশ্রী লাগে। কত আশা কত কল্পনাই না দু'জনের ছিল, বিয়ে করে হত-ভাগা সংসার নিয়েই মেতে আছে। কী করে ওর ভাল লাগে? শিউরে ওঠে সুব্রত। তাকে যে অনেক বড় হতে হবে। তার তো ঐ ছোট ঘরে আটকা থাকলে চলবে না। তার ঘর যে বিশ্বজোড়া। বিমলকে টাকা পাঠাতে ভোলে না।

*　　*　　*　　*

নীহার, সুখবর আছে, দেবব্রতর বিয়ে জ্যাঠামশাই চিঠি দিয়েছেন।

নীহার উৎফুল্ল হয়ে চিঠি খানা টেনে নেয়। দেবব্রতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তা হলে সুব্রত ও তো আসছে। আর এবার রেবার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবো। সুব্রতকে বলবো রেবাকে কিছু দিনের জন্য রেখে যাও আমাদের সঙ্গে ভাল করে ভাব হোক।

বিমল হো হো করে হেসে ওঠে। বেশ বলেছ, সুব্রত বুঝি এখন বৌ তোমার কাছে রেখে যাবে!

গেলে ক্ষতি কী? বিয়ের পরেই জ্যাঠাইমা বৌকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন—এমনি ছেলে আমার পাগল। তারপর দেখ বৌ এর সঙ্গে কী করে। তাও তো আজ দু বছর হয়ে গেল। রেবার বাচ্চা হলো, জ্যাঠাইমা তখন অসুস্থ থাকায় যেতেও পারেন নি।

সে যা হয় হবে। তুমি তো বাক্স গুছোও।

সুব্রতের আগেই বিমল কলকাতা পৌঁছে যায়। সুব্রতের আসার জন্য সবাই উৎসুক। বিয়ে করেই চলে গিয়েছে—বৌ ছেলে সবই তো নূতন।

সুব্রত আসলে সবাই ঘিরে ধরে। মা তাড়াতাড়ি খোকাকে নিতে যান, নূতন লোকের কোলে খোকা যেতে রাজী নয়।

সুব্রত বলে—দাঁড়াও মা ওর এখন ক্ষুধা পেয়েছে। বোতলটা ধোয়া হয়নি। একটু গরম জল দাও তো ধুয়ে দি। ব্রাস নিয়ে বোতল পরিষ্কার করে, আর সুব্রত এর ওর কথার জবাব দেয়। মাকে বলে, মা, ল্যাক্টোজেন করার একটু গরম জল দাও। রেবা ওর জামা জুতো খুলে দাও। আজ স্নান করিয়ে দাও।

মা খোকাকে স্নান করাতে যায়।

সুব্রত বলে ওঠে—ও কিন্তু গরম জলে স্নান করে মা। আবার সুব্রত চেঁচিয়ে ওঠে, কানে যেন জল না দেয় দেখো।

মা হেসে ওঠেন। ওরে দিই না তোর ছেলের কানে একটু জল দিয়ে।

সুব্রত লজ্জিত ভাবে বলে—তা বলছিনে। জল দেখলে এমন থাবরা মারে যে কানে জল যায়।

মা তাড়া দেন—ও রেবা মা, তুমি তোমার ছেলেকে খাওয়াও, আমি আমার ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা করি। যা সুব্রত চট করে বাথরুমে ঢুকে পড়, পরে গল্প করিস।

পরদিন ভোরে মা উঠে দেখেন সুব্রত খোকাকে কোলে নিয়ে উঠোনে পাইচারি করছে। একি রে তুই এত ভোরে উঠেছিস?

আমি তো খুব ভোরেই উঠি মা, তোমার নাতিটির জ্বালায় রাত্রি চারটার পর ঘুমোবার উপায় আছে? রেবার ঘুম কম হলে শরীর খারাপ হয়, তাই আমি ওকে নিয়ে বাইরে চলে আসি। তা ছাড়া কাল মোটেই ঘুমুতে দেয়নি। ওখানে মশারী খাটাতে হয় না, এখানে মশার জন্য না খাটিয়েও উপায় নেই। মশারীর ভেতর ফ্যানের হাওয়া লাগে না, খোকার কি ছটফটানী! হাত পাখাও খুঁজে পেলাম না। কাগজ ভাজ করে সমস্ত রাত্রি হাওয়া করতে হয়েছে।

ঘুম-কাতুরে বলে সুব্রতকে সবাই ক্ষ্যাপাতো। সুব্রতের বরাবরের স্বভাব অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করা, গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকতো বলে উঠতো সবারই পরে। ঐ এক ফোঁটা ছেলে সব অভ্যাসই পাল্টে দিচ্ছে।

দেবব্রতের পাত্রী তুমি দেখেছো ?

হ্যাঁ বাবা আমি দেখেছি, তুই এখানে নেই, দেবুও নিজে কিছুতেই পাত্রী দেখবে না। বলে, দাদা কি নিজে দেখেছিলেন ! তাই আমিই দেখলাম। আজ পাকা দেখা, তুই বিমল তোরা যাস্।

হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। বলে বটে ; কিন্তু যাবার সময় গোল বাধায় খোকা, সে বাবাকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। বিশেষ এখানে তার কেউ পরিচিত নয়।

সুব্রত রেবাকে অনেক করে বলে যায়—একটু দেখো লক্ষ্মীটি, কাঁদলে মেরো না যেন।

দিনগুলি যেন উড়ে চলে। বিয়ে বাড়ির হৈ হুল্লোর। এ আসছে-সে আসছে।

নীহার বলে, জ্যাঠাইমার তো চিন্তা হয়েছিল সুব্রত বিয়ে করবে না—এখন তো দেবুরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, মা, এটা মা-বাবার কর্তব্য। মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে পারলেই মা নিশ্চিন্ত। মেয়ে যতই পড়ুক বা চাকুরী করুক তবু তাকে সংসার দিতে না পারলে বাবা-মার অশান্তির সীমা থাকে না ! ছেলেও বড় হলে তাকে সংসার পেতে দিতে হয়।

নীহারের ভারী ফুর্তি, রেবাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নূতন বৌ-এর শাড়ী গহনা নিয়ে আসে। কিছু আদান প্রদান ও হয়। এ দেয় ওকে, সে দেয় তাকে।

সুব্রত বলে মা ছোট পিসীমা কবে আসবেন ?

তোর ছোট পিসীমার কথা আর বলিস নারে। বেচারী কী বিপদে যে পড়েছে ! তোর পিসে মশাইর রাজ-রোগ হয়েছে।

- যক্ষ্মা হয়েছে ? এর খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে—এ অসুখে এখন আর ভয় নেই।

ভয় নেই তো বলছিস। এ দিকে তোর পিসীমা যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। কী অসম্ভব খরচ এ রোগের। এখন মাদ্রাজের কাছে কি একটা হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠিয়েছেন। তোর পিসীমার সব কখানা গহনা গিয়েছে। এদিকে ছেলে মেয়েরা পড়ছে, কোথেকে চলবে এত খরচ ? হ্যাঁরে [illegible]। তুই হাসপাতালের খরচা দে-না ?

সে যে অনেক টাকা মা ! এত টাকা কী করে দেব ?

সব না পারিস আদ্ধেক দে।

সেও তো কম নয়।

তা হোক তুই রোজগার তো খারাপ করিসনে। তার এই নিদারুণ বিপদে আমরা না দেখলে কে দেখবে বল তো ?

সুব্রত চুপ করে যায়। ছোট পিসীমা কী ভালই না বাসতেন ! ছোট বেলায় যা কিছু আদর আবদার রক্ষা করতেন এই ছোট পিসীমা। তখন ও ছেলেরা কেউ হয় নি। কিন্তু আজ এ টাকা দেওয়া কি সম্ভব হবে?

কী রে চুপ করে গেলি যে ?

কি বলবো মা। চার দিকেই যে খরচ। এইতো রেবার বাবার এপেণ্ডিসাই টিস অপারেশনে অনেক গুলি টাকা দিতে হলো। এ মাসে যাতায়াত বিয়ের খরচা কিছু দিন হল রেডিও কিনেছি তার ইনষ্টলমেণ্ট শোধ না হতেই পিয়ানো এসেছে। একটা সোফা সেট করা দরকার। তাও না হয় ছেড়ে দিলাম। খোকার অন্ন-প্রাশন আসছে অথচ পিসীমাকে কিছু দিতে না পারলে খুবই খারাপ লাগে।

মা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করেন।

সুব্রত বলে দেখি চেষ্টা করে ; তবে ভরসা হয় না।

তোমার নূতন কী কী বই আছে দাদা ?

বই ? আর বলিসনে। অবধূতের নূতন একখানা বই সঙ্গে এনেছিলাম। তা শ্রীমানের জন্য খুলে দেখারও সময় হয়নি। তুই একবার কনে দেখলিনে কেন ?

দেবু বইখানা নিয়ে সরে পড়ে।

বিয়ের দিন বিমল তাড়া দেয়, সুব্রত, বরযাত্রী যাবার জন্য তৈরী হয়ে নে। এর পর দেরী হয়ে যাবে।

দেরী সত্যি হয়ে যায়। খোকা কিছুতেই বাবাকে ছাড়তে রাজী নয়। অনেক সাধ্য সাধনা করে রেবার কাছে দিয়ে যায় সেভ্ করতে,আর চৌকির উপর থেকে পড়ে অনেকটা ঠোঁট কেটে যায়। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়ে খোকাকে শান্ত করতে অনেকটা সময় চলে যায়।

বিমল বলে—ওকে জ্যাঠাইমার কাছে দিয়ে নে সুব্রত, আর তো দেরী করার উপায় নেই !

শেষ পর্যন্ত সুব্রতের যাওয়া হয় না। গভীর রাত্রিতে ছোট ছেলেকে নিয়ে বাইরে আসতে দেখে নীহার সুব্রত খোকাকে নিয়ে পাইচারী করছে।

তুমি এখনো শোওনি? নীহার বলে।

না। খোকা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে।

তোমার ঘরেও তো কান্না শুনছি। সুব্রত বলে।

নিতুটা ছট্‌ফট্ করছে। ওর বাবার জন্য মন কেমন করছে ঘুম আসছে না। কী যে সব ছেলে হয়েছে।

তা যাই বল, এ কিন্তু বিমলের অন্যায়। কী দরকার ছিল ওকে কাঁদিয়ে যাবার? বাড়িতে লোক তো আরো রয়েছেই। সকলের আগে দেখবে ওদের সুবিধে অসুবিধে। তা তো নয়। যত সব!

নীহারের মুখে আবার সেই চাপা হাসি ঝিলিক দেয়। এই বারান্দার আলোতেও সুব্রত তা স্পষ্ট দেখতে পায়। রাগে ওর পিত্ত জ্বলে যায়। ছেলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

নিবেদন

চেষ্টা করেও বইখানিকে নির্ভুল এবং ত্রুটিশূন্য করা গেল না। পাঠক কষ্ট করে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করবেন—এই আমাদের ভরসা। কয়েকটি ভুল ত্রুটী তুলে না ধরলে অর্থবহ হবে না বলে নিচে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে :

১। পৃঃ ১৩—১ম লাইন—'সদা'র স্থলে 'সদার' হবে।

২। পৃঃ ৫৭—৩য় লাইন—'অভিনয় করতে যাচ্ছ'-এর পরে 'না বিয়ে করতে যাচ্ছ' কথা গুলির সংযোজন হবে।

৩। পৃঃ ৭৬—১০ম লাইন—'না,' আর 'বা অক্ষম'-এর মধ্যে 'স্বামীহীন' শব্দের সংযোজন হবে।

৪। পৃঃ ৯৬—১ম লাইন—'নামটিকে'-র পরিবর্তে 'নার্সটিকে' পাঠ্য।

৫। পৃঃ ১১২—১৪শ লাইন—'ধরেছ' আর 'কায়েম'-এর মধ্যে 'সেকেণ্ড ইয়ারে' সংযোগ।

৬। পৃঃ ১১৭—শেষ লাইন-এর আগে অর্থাৎ শেষের আগের লাইনের পরে একটা লাইন পড়তে হবে—'কমিকে তাড়া দি। রাত্রি হল, চল কমি।'

৭। পৃঃ ১৮৭—নিচে থেকে ৭ম লাইনে—'নির্ধন'-এর পরিবর্তে 'নির্বাণ' পাঠ্য।

৮। পৃঃ ১৮৯—১৩শ লাইন—'ভয়'-এর পরিবর্তে 'ভুল' পঠনীয়।

প্রকাশক

লেখিকার ডায়েরি থেকে

তারিখহীন

মানুষ চায় সাথী। আমার আনন্দ আমি তেমন করে উপভোগ করতে পারি না যতক্ষণ না একজন সাথী পাই। আমার দুঃখ একা ঠিকমত অনুভবই করতে পারি না যতক্ষণ না অন্যের আহা-উঁহু শুনি। অন্যের সহানুভূতিতে নিজের দুঃখ বুঝে, সাথীর কাছে আহা উঁহু করে অথবা কেঁদে আমার দুঃখ পাতলা করি।

আমার স্বামী সব রকমে আমার মস্ত সাথী বলেই আমি তাঁকে ভালবাসি। আমার সন্তানদের সকল রকম সুখ সুবিধার ব্যাপারে আমি আমার স্বামীকে সাথী পাই। আমি অসুখের যন্ত্রণায় একা জেগে আছি জেনে যখন ছট্‌ফট করতে থাকি তখন চেয়ে দেখি বেদনা পাণ্ডুর মুখে তিনি আমার পাশে বসে আছেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে সবই যে ওঁর মিথ্যে। সংসারই বা করবে কে? ছেলে-মেয়ে দেখবে কে? ইনিই বা সার্থক হবেন কি করে? তাই আমার অসুস্থতা তাঁর এত বেদনাদায়ক। আমি দু'খানা ভাল তরকারী রান্না করে তাঁর পাতে দিলে তাঁর মুখে যে তৃপ্তির ভাব দেখতে পাই তা বোঝাবার ভাষা কোথায়?

আমাকে কেউ একটু প্রশংসা করলে তিনি যেমন আনন্দ পান, তাঁকে প্রশংসা করলেও তো তাঁকে ততটা আনন্দ পেতে দেখি না। একবার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে যেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। সেখানে আমার প্রচুর পরিচর্য্যা হতে থাকে, পাশকরা নার্সও আসে, কিন্তু আমার কাছে ত্রুটি থেকেই যায়। আত্মীয় স্বজনও স্বস্তি পায় না। ওঁকে খবর দেওয়া হয়েছে জেনে সে কী নিশ্চিন্ত! তিনি এসে পড়লে আর ভয় কি? যেন উনি এলে আর ভয়ের কিছু নেই—কী নির্ভয়! উনি যাওয়ার সাথে সাথে যেন আমার অসুখ অনেকখানি কমে যায়। কয়েক দিন পরে সুস্থ হয়ে ফিরে আসি।

তাঁর দৃঢ়তাই আমাকে বেশী মুগ্ধ করে। অনেক দিন অনেক অন্যায় আব্দার করে দেখেছি উনি কখনো তা রক্ষা করেন না। তখন দুঃখ পেলেও এই কর্তব্য

নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা না করে পারি না। যেটা ন্যায্য বলে মনে করেন, সেটা রক্ষা করতে এক কথায় তিনি আমাকেও দূরে ঠেলে দিতে পারেন বলেই তিনি আমার প্রিয়তম।

১০-১-৬৪

মনটা অসম্ভব উদাস হয়ে আছে। কলকাতার বুকে প্রেতের নৃত্য চলছে: আমরা পুরাণে যে অসুরের বর্ণনা পাই, তা বোধ হয় এই (?)। কি দুর্দ্ধর্ষ জাত, দয়ামায়া-প্রীতি-শূন্য, অবশ্য ক্বচিৎ ২/৪ জন ব্যতিক্রমও আছে। ভাবাই যায় না। সভ্য যুগের মানুষ আমরা। একটি লোককে বাঁচানোর জন্য কত রাজসিক আয়োজন। ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই-এর যুগ যুগান্তের সাধনা। আর অকারণে লোকগুলিকে খুন করা হচ্ছে। হানাহানির গেণ্ডয়া যেন! মানুষ আজ অসুরই হয়ে উঠেছে। অসহ্য মনে হয়। একটি জীবন, সে যে অমূল্য জিনিস। আজও বিজ্ঞানে একটি জীবন দিতে পারেনি। অথচ কত সহজে তার বিনাশ হচ্ছে!

১০-২-৬৬

আজ মঞ্জু রোল গোণ্ডের চশমার ফ্রেম অর্ডার দিল। সন্তান হিসাবে ওরা আদর্শ। ওদের তুলনা নেই। কিন্তু আমার অস্বস্তির অন্ত নেই। কেন এ দামের ফ্রেম নিলাম, কি হবে এতে! এই ফ্রেমে কি আমার মূল্য বাড়বে? এ বিলাসিতা কেন? মূল্য তো আমার কমে যাচ্ছে। লিখতে পারছি না কিছু। দিনগুলিকে কেবল ক্ষয় করে দিচ্ছি। কি করে যে আমি এমন নিশ্চিন্তে থাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি বুঝিনা। এই কি আমার রূপ হল? না—না—এতো আমি চাইনি। এক দিন দারুণ অর্থাভাব আমার ছিল, শুধু অর্থাভাবই নয়, কিছুই সম্বল ছিল না। আজ যা আছে অন্যের কাছে তা কিছুই না হলেও আমার কাছে পর্বত প্রমাণ। তবু মন নিরন্তর হাহাকার করছে, চোখ রাঙ্গাচ্ছে—অনেক করার ছিল—কিছুই করলে না।

১৯-২-৬৬

পাড়ায় গিয়েছিলাম। এক জন রাস্তা থেকে আদর করে নিয়ে গেল, আর এক জন কত আদরের কথা বলল, একজন একটি লাউ দিলে! আর এক জন কুল দিলে। আনন্দে মনটা ভরে যাচ্ছে, এরা আমায় এত ভালবাসে? যার যেটুকু আছে উজার করে দেয়। আমি কি এদের মনরাজ্যে সত্যি স্থান পেয়েছি? তা হলে আমি ধন্য, আমি মহা সুখী। কিন্তু এরা আমায় বড় বাড়ী দেখে খাতির করছে না তো? ঠিক বুঝি না, সবটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা কি না।

১-৯-৬৬

কলকাতা গিয়েছিলাম—বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তবু কিছু বাজার করলাম। মঞ্জু আমার জন্যই দুটো দামী শাড়ী কিনে দিল। না—এতে আমি আনন্দ পাচ্ছি না। ভোগে আনন্দ নেই—বিশেষ অপরিমিত ভোগে। ত্যাগেই আনন্দ। আজ আমার পুত্রকন্যা উপযুক্ত হয়েছে, তারা আমাকে প্রচুর টাকা দিয়েছে বাজার করতে—এ আমার কত বড় আনন্দ! রাস্তায় এদের থাবার ইচ্ছা ছিল—আমি দিইনি। এখন ভাবছি কেন দিলাম না? আর একটু আনন্দ পেতাম।

৩-৯-৬৬

আজ বিধানগড় নারীকল্যাণ সমিতিতে যাবার জন্য লোক এসেছিল। আমার যাবার উপায় নেই। হায়! সমস্ত জীবন যার সাধনা করলাম আজ তা হাতে পেয়েও ছাড়তে হচ্ছে! কি অপরিসীম বেদনা! কত কল্পনা ছিল সন্তোষপুর গ্রামটাকে উন্নত করব। লিখব, সুন্দর করে সাজিয়ে সংসার করব। কিছুই তো হল না, আমি অসুখে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়লাম। হয়ত যে কটা দিন বাচব এমনি ভাবেই দিনগুলি কেটে যাবে।

২০-১-৬৮

সমীর আজ এই ডায়েরিটি আমায় দিয়েছে। ও ভাল অফিসে কাজ করে। কত সুন্দর ডায়েরি পেয়েছে! এক সময় কত কিই আমার লিখতে ইচ্ছা হত। তখন হাতের কাছে এক টুকরো কাগজ পাইনি। আজ সুযোগ এসেছে, কিন্তু আমি ফুরিয়ে গিয়েছি। কি যে নিঃশেষ হয়েছি তা খুবই উপলব্ধি করি, কিন্তু কেউ টের পায় না। ওরা আমার আগের কর্মক্ষমতায় আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করে। আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে। লগ্ন চলে গেছে আর হবার নয়। "সময় হইলে গত কিন্তু একবার, পারে কি কিনিতে কেহ ক্ষণমাত্র তার? রাশি রাশি ধন দাও অমূল্য সময়, একবার গেলে আর আসিবার নয়। নিতান্ত নির্বোধ যেই—শুধু সেই জন, অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন।"

৩-২-৬৮

মুরগীর বাচ্চাগুলি নীচে ছাড়লাম। উনি বসে একাগ্র মনে ঘাস বাছছেন। আমি মুরগীর বাচ্চাগুলি দেখে আনন্দে আপ্লুত হচ্ছি। রাহা চৌধুরী রামায়ণ পাঠ করে আনন্দ পাচ্ছেন। নিজেকে ধিক্কার দিলাম মুরগী নিয়ে মেতে আছি, ছিঃ! কি সুন্দর কাজ করছেন রাহা চৌধুরী। প্রশ্ন জাগে সত্যি কি সুন্দর জীবন? কোনটা সুন্দর? কোনটা সার্থক। রামায়ণ পড়া ভাল জানি, কিন্তু কি ভাল? জ্ঞান বাড়ে? সব সময় কি আমরা জ্ঞান নিয়েই থাকি?

১৪-২-৬৮

আজ পুষ্প দীক্ষা নিল॥ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এখানে দীক্ষা নেয়। আমি এখনো দীক্ষা নেইনি শুনে ওদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। সবাই বলছে দীক্ষা নিন্। নিন্ বললেই কি নেয়া যায়? আমার পিপাসা কোথায়? জীবন সম্বন্ধে আমার অজস্র প্রশ্ন জাগে, কোনটা সত্য কিসে জীবন সফল হয়? কোথায় জীবনের সার্থকতা? গুরু কি এ প্রশ্নের জবাব দেবেন? তিনি বলবেন নাম জপ কর গুরু পদে সব সমর্পণ কর। হ্যাঁ, একজনের উপর সব দায় দায়িত্ব চাপাতে পারলে হাল্কা হওয়া যায় সত্যি, কিন্তু গুরু নিয়ে এত হৈ চৈ আমার একেবারেই ভাল লাগে না, বরং মন্ত্র নেওয়ার মন আরো বেঁকে বসে। গুরু কি একজন হয়? গুরু তো অজস্র। যাঁরা এ নিয়ে আনন্দ পান তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু নিজে এ থেকে রস পাই না।

১৭-২-৬৮

সমস্ত দিন মাথা তুলতে পরিনি। আমার জীবন থেকে বহু দিন চুরি গেল। যে দিনগুলিতে আমার কোন সাক্ষর নেই। জীবনকে আমি ভালবাসি, তাকে সব রকমে সুন্দর করে ভরিয়ে তুলতে চাই—কে যেন নিষ্ঠুর হস্তে বারে বারে আমার সব কিছু মুছে দিতে চায়। কে যেন সব কিছু দূর করে আবার পূর্ণ করে দেয়ও। লোকে বলে আমি ভাগ্যবতী। এই কি ভাগ্য? তবে সতত আমাকে একজন আগলে আছেন এটা বুঝি। শেষটুকুও যেন তিনি সুন্দর করেই দেন—এই মিনতি।

১৯-২-৬৮

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক সমীক্ষায় ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ঐ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দেশের জন সংখ্যার ৭০ শতাংশ শোচনীয় ভাবে অপুষ্ট। হায় ভগবান! স্বাস্থ্য দপ্তর খুব নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নি। আমরা সাদা চোখেই দেখছি, অনুভব করছি খাদ্য ঘাটতি। যেখানে পেট ভরার মত ভাত রুটিই জোটে না সেখানে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রশ্ন ওঠে কি? নিম্ন আয় বাদ দিন (তাহারা আজও কি ভাবে টিকে আছে ভগবান জানেন),মধ্য আয় যাদের তাদেরও দেখি পয়সা হাতে নিয়েও বেবী ফুড পান না। চিনি—শিশুর হাড় শক্তি জোগানোর অতি প্রয়োজনীয় জিনিস উধাও। ফলের খোসা ছুঁতে গেলেও হাতে সেকা লাগে। সেখানে পুষ্টি আসবে কোথা থেকে? তাই ঘরে ঘরে পাছাহীন, পাঁজর বের করা, ঘোলাটে চোখ শিশু দেখা যায়। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায় কুড়ুল মারছি—বাঁচাবে কে?

১-৩-৬৮

ক'দিন থেকেই মনটা খারাপ যাচ্ছে। আজ প্রেসারটাও বেড়েছে। আমি বিশ্রাম নিলে মঞ্জুর উপর চাপ পড়বে, ওঁর শরীরটাও ভাল না, কি হয়েছে তাও বুঝিনা। শেষ রাতে সমীরের কাসি শুনলেও মন অবর্ণনীয় খারাপ হয়ে যায়। ওদের কারো শরীরই ভাল নয়, যা করা দরকার তা অর্থেও পারি না, সামর্থেও পারি না।

প্রাণ দিয়েও চেয়েছিলাম একটি সুন্দর সংসার গড়তে। পারলাম না। চেয়েছিলাম প্রতিটি মানুষের সঙ্গে গাঢ় আত্মার যোগ থাকবে, সবাই মিলে অবসর সময় বসে হাসি গল্প করব—ওরা তা চায় না—যন্ত্রের মত কাজগুলি করে গেলেই ওরা খুশি। অসুখ হলে ফল ঔষধ এনে দিয়েই ওরা দায় সারে। ঔষধ পথ্যের চেয়েও ওরা একটু কাছে বসলে দুটি কথা বললে আমি তৃপ্তি পাই বেশী। "মিছেরে তোর ভবে আসা, মিলবে না তোর ভালবাসা।" ভেবেছিলাম সমীর আমার এ অভাব মিটাবে। সমীরকে আমি কিছু বললে জবাব দেয় মাত্র। নিজ থেকে একটি কথাও বলে না। উনিকে অনেকে বলেন দেবতা, আমিও অন্যর জানিনে। পুত্র অতি সজ্জন, স্বভাবে দেবে মানুষে তুষ্ট। মেয়ের তুলনা নেই, তবু অন্তরাত্মা আমার হাহাকার করে কেঁদে মরে।

৫-৩-৬৮

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ উত্তর দিকে অপূর্ব সুন্দর একটি দৃশ্য দেখলাম। মেঘের উপর সূর্য কিরণ পড়ে যেন মনে হচ্ছিল কতগুলি সিংহ কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসছে—কি বর্ণ বৈচিত্র্য! কোনটা ধবধবে সাদা—কোনটা লাল—কোনটা ধুসর—সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য লিখে বোঝাবার নয়। কেবল অনুভব করার। পাহাড়ী জায়গায় সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হয়ে আকাশে নানা চিত্র সৃষ্টি হয়, কিন্তু এখানে কি করে হ'ল! কিছু পরে মিলিয়ে গেল কিন্তু আনন্দের স্মৃতিটা রইল।

৭-৩-৬৮

আজ সমীর বলল—এর পর ছুটির দিনে আর বাড়ী থেকে গাছ খোঁচাব না, বেড়াবো খেলবো। এই কি জীবন?

রাগ করার বদলে কৌতুক বোধ করছি—ওদের ব্যবহারে মনে হয় গাছ লাগানো, মুরগীর ঘর করা, এটা সেটা কেনা-কাটা, এগুলি সবই আমার কাজ। তাই এসব করতে গিয়ে ওদের যেমন হয় মেজাজ খারাপ তেমনি অনিচ্ছা।

জীবন উপভোগ করতে ওরা জানে কৈ? জীবন সুন্দর করতে কি কিছু বাদ দিতে হয়? বাড়ীখানা সুন্দর করে সাজালে, ফলে ফুলে ভরে উঠলে সে তো

আনন্দের। তার পর সময় করে বেড়ালে খেললে আরও সুন্দর। প্রতিটি কাজ থেকে যদি আনন্দ আহরণ করা না যায় তবে কি শুধু বেড়িয়ে খেলিয়ে আনন্দ? পেলেও জঞ্জাল যে অনেক জমে যাবে না!

২৫-৩-৬৮

কিছু পুরানো কাগজ পত্র ঘাটছিলাম, নিজের দু'একটা পুরানো লেখা হাতে পড়ল। ভালই লাগল। কেবলই মনে হচ্ছে—ভুল বড় ভুল হয়ে গেছে। লেখাই আমার জীবনের একমাত্র সার্থকতা ছিল। তাকে ছেড়ে দেয়া মানে জীবনটাকে বাজে খরচ করে ফেললাম। যে ক্ষমতা পেয়েছিলাম তার সাধনা করলাম কোথায়? সাধনা ছাড়া সিদ্ধি হবে কেন? আঃ! কি অপচয়! লাখ লাখ ধন দাও অমূল্য সময় একবার গেলে আর আসিবার নয়।

১৪ ৪-৬৮

১লা বৈশাখ যা করব ভেবেছিলাম সবই করেছি তবু ঠিক শান্তি পাইনি। প্রথমে কাটা হ'ল মুরগী। বছরের প্রথম দিন আনন্দ করে খাওয়া হবে বলে। বাড়ীর মুরগী, মমতা করব না— কেটে খাব আগেই ভেবে রেখেছি, তবু খুব কষ্ট হ'ল। কেবলি মনে হচ্ছিল কাজটি ঠিক হয়নি। এর চেয়ে মাংস না খেলেই ভাল হ'ত। খাবার করা হ'ল সবাইকে দেব বলে—কেউ এল না। বেড়াতে গেলাম তা বিশেষ ভালও লাগল না, সব কিছুই যেন অর্থহীন মনে হ'ল। ছেলে মেয়েরা আমাকে শাড়ী ব্লাউজ, নূতন জুতা দিয়েছে। আজ যেন এ সবেও আর বিশেষ আনন্দ পাইনে।

২-১০-৭০

একটি পুরানো কাগজ ক্রেতা দীর্ঘ দিন আমার থেকে কাগজ নিচ্ছিল। আমি একজন লোককেই দিতে পছন্দ করি। দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে একটা বিশ্বাস এসে যায়। শরীরটা খারাপ ছিল—একটু দূরে একখানা টুলে বসে ওর কাগজ নেয়া দেখছিলাম। হঠাৎ ওর মাপের কার-সাজিটা চোখে পড়ল। চোখের উপর থেকে একখানা পরদা সরে গেল। এ জন্যই যত কাগজই দিই ওজন কিছুই হয় না। প্রতিবারেই ভাবি এত কম কি করে হল। চোখের উপর মাপছে অভিযোগ করারও কিছু পাইনে। আজ হাতে নাতে ধরলাম—ঠিক ডবল কাগজ নিচ্ছিল। এত ঘৃণা হ'ল। শুধু বললাম—ছিঃ এমন তুমি সামান্য জিনিসের জন্য লোক ঠকিয়ে বেড়াও! কাউকে কিছু বলিনি, ওকে কোন শাস্তিও দিইনি। কেবল মনে হচ্ছিল আমার একটি জিনিস হারিয়ে গেল।

১০-১০-৭০

মিসেস............কে আমরা জানতাম ভক্তি মার্গে অনেকখানি উপরে উঠেছেন। কেবল গুরুর কথা আলোচনা করেন, সৎকাজ করার আকাঙ্খা আছে, গুরুর কাজে ছুটাছুটি করেন। এক অনাচারীর জন্য গুরুর কাছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বল্লাম—সে কি? তিনি বললেন—ওর মুখ দেখলে পাপ হয়। ওর ছায়াও আমি মাড়াব না। ওর পাপের শাস্তি দেবার মালিক কি আপনি? ওর গুরু বুঝবেন ওর কথা—আপনি প্রাচীর তোলার কে? গুরু তো আর বলবেন না! অনেকটা উপর থেকে যেন মানুষটা নীচে নেবে গেলেন। গুরুর কাজে আরও নিজেকে সমর্পণ করলেন। সংসারের সামান্য সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন না। অনেকেই ধন্য ধন্য করছেন। বেশ কিছুদিন বাদে দেখা হতে শুনলাম তিনি কি কি কাজ করছেন এবং কোথায় কোথায় গিয়েছেন আর কত বড় বড় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। তার পর একটু গলা খাটো করে বললেন—অনেকেই আমার বাড়ী আসতে চায়---আমি তাদের বলেছি, এখনও আমি বাড়ীঘর বিশেষ করতে পারিনি। শুনে তাঁরা বললেন, একদিন গুরুর অধিবেশন করুন তা হলেই সব হবে। বলে সফলতার বিশ্বাসে তাঁর মুখখানা জ্বল জ্বল করতে থাকে। এ টুকুই বুঝি ভক্তির মূল কথা।

—:*:-